বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ

GIFT

প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সৈয়দ আতিকুল ইসলাম
বি.এ. (অনার্স),
এম.এ/এল এল.বি (ঢাকা)
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং-১৬৪
শিক্ষাবর্ষ-২০০০-২০০১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

401595

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
401595

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

M. PHIL

401595

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোণামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

401595

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সৈয়দ আতিকুল ইসলাম
এম. ফিল গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রেজি নং-১৬৪ শিক্ষাবর্ষ-২০০০-২০০১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, সৈয়দ আতিকুল ইসলাম কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য রচিত **"বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে তার একক ভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে সে এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেনি।

401595

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

31.10.04

প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

অনেক আনন্দ বেদনা মিশ্রীত আমার পঞ্চাশ বছর জীবনের দুর্গম পথ পরিক্রমায় যাদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা, তুলনাহীন অবদান, উৎসাহ আর উদ্দীপনা লাভ করে জীবনের এ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি তার মধ্যে আমার শ্রদ্ধাভাজন মরহুম বাবা সৈয়দ আলতাফ হোসেন এবং আমার মাতৃতুল্যা বড় বোন মরহুমা সৈয়দা ফাউজিয়া ওদুদ মিরার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আমার সহজ, সরল, স্নেহময়ী গর্ভধারিনী মা মোসাম্মৎ আমেনা খাতুন, যার পদতলে আমার বেহেস্ত তাঁরই করকমলে উৎসর্গ করলাম আমার এ সামান্য প্রয়াস।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের শুরু থেকেই ভেবেছিলাম যদি কখনও সময় ও সুযোগ আসে তবে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করব। মহান সৃষ্টিকর্তা আমার সে আশা পূরণ করেছেন, সুযোগ করে দিয়েছেন এ নিয়ে গবেষণার। তাই আমি **'বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ'** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করে শেষ করেছি। গবেষণা কর্মে দেখানোর চেষ্টা করেছি কেন বাংলাদেশে এই নতুন ধরণের সরকার ব্যবস্থা, এটি গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, তত্ত্বাধায়ক সরকারের পূর্বের নির্বাচনের সাথে এ সরকারের অধীনে নির্বাচনের পার্থক্য বা ব্যবধান কি, সংবিধানের মৌলনীতির সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ইত্যাদি বিষয়। এ জন্য দেশী বিদেশী প্রবীণ, নবীন ও বিজ্ঞ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা ও তথ্যসূত্রের সাহায্য নিয়েছি। তাই সে সব সম্মানিত লেখক ও প্রকাশকদের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণা কর্মটি যার তত্ত্বাবধানে করেছি যিনি আমার আদর্শ, ছাত্র জীবনে যাঁর পাঠদান মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় শুনেছি, সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. এম নজরুল ইসলাম স্যারকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি আমাকে সাহস ও অনুপ্রেরণা না দিলে আমার পক্ষে এ কাজ শেষ করা অসম্ভব হত। নানা ভাবে সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি মিসেস ফিরোজা ইসলামকে।

আমার এ গবেষণা কর্মের শুরু থেকে যারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে তথ্য, সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ না করলে নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব। তাই সর্বাগ্রে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষকে যিনি আমাকে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে থিসিস জমা দেয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন। সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই অধ্যক্ষ সৈয়দ আমিনুল ইসলাম জাকির এবং কলেজের উপাধ্যক্ষ বেগম নুরুন নাহার। আমার সহ-কর্মীদের মধ্যে যারা নানা ভাবে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের মধ্যে বড় ভাই তুল্য সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক, বেগম ফাহমিদা চৌধুরী, এ, এফ, এম, সেলিমুল্লাহ, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপল তালুকদার, বেগম জেসমিন আরা।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ এর নিকট যিনি আমাকে সার্বক্ষনিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। উৎসাহ যুগিয়েছেন সরকারী ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ ফিরোজা বেগম।

এ কাজের জন্য আমি বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি অনুজ প্রতিম জনাব সত্যজিৎ দত্ত, আমার বন্ধু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ড. আবদুর রশীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী ও সহকারী অধ্যাপক গোবিন্দ চক্রবর্তীকে। গোবিন্দ চক্রবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীনও টেলিফোনে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমি তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করছি।

গবেষণার সমাপ্তিতে আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যের আন্তরিক অনুপ্রেরণার কথাও সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমার সহধর্মীনি সৈয়দা সাবিনা ইসলাম আমাকে সময় ও সুযোগ করে না দিলে এত তাড়াতাড়ি এ কাজ করা মোটেই সম্ভব হত না। আমার বড় মেয়ে সৈয়দা আফরিনা ইসলাম লীমা আমার সাথে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকে আমার একাকীত্ব দূর করেছে। এমনকি কখনও কোন আনুষঙ্গিক জিনিসের প্রয়োজন হলে তা সরবরাহের জন্য আমার ছোট মেয়ে সৈয়দা সাজরীনা ইসলাম পড়শি ও ছেলে সৈয়দ আশিকুল ইসলাম আবীর তা পৌছে দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। তাই ওদের নাম উল্লেখ না করেও পারছিনা।

যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও গবেষণা কর্মটিতে বানান বিভ্রাট থাকতে পারে। আমার এ অনিচ্ছাকৃত ভুল যেন পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। গবেষণা কর্মটি যদি ভবিষ্যত প্রজন্মের কাজে এবং বাংলাদেশের 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের' ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা প্রমানে সক্ষম হয় হবে আমার পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সৈয়দ আতিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে যুগান্তকারী সংযোজন হচ্ছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। "নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে"- বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি একটি নতুন ধারণা, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ বিশ্বের আর কোন গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরণের বিধি প্রচলিত নেই। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে কোন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় মেয়াদ পূর্ণ হলে কিংবা সংসদে আস্থা হারানোর ফলে নির্বাচনের প্রয়োজন হলে সেই রাজনৈতিক দলই তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি হলো সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে কিংবা নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হবার পর তিন মাসের জন্য যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, এ সরকারের মূল কাজ হলো সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা। সরকারের কোন সদস্য কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন না এবং জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না, যা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণার মূল শিরোণাম হলো 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ' এ বিষয়টিকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে উক্ত গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হয়েছে। এ গবেষণা কর্মটি সর্বমোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে গবেষণার ভূমিকার মাধ্যমে গবেষণার মূল সমস্যা ও উদ্দেশ্যকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মডেল যে, বিশ্বস্বীকৃত তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করেও গবেষণার যৌক্তিক বিষয়গুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের নিমিত্তে গবেষণার কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করে গবেষণার পরিসর ও সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে গবেষণার মূল শিরোনামকে চিহ্নিত করে একটি রূপরেখা ও সমস্যাকে সমাধানের নিমিত্তে একটি পদ্ধতি ও পদ্ধতিগত কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে- জনসাধারণ নির্বাচন ও গণতন্ত্র যেহেতু একে অপরের পরিপূরক ও সেতুবন্ধন তাই লক্ষ্যদল হিসেবে ১৮০ জনের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও দায়িত্ব পালনকারী উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১৪ জনের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রশ্নমালার মাধ্যমে বর্তমান ও সাবেক রাজনীতিবিদ সংসদ সদস্য ও মন্ত্রি পরিষদের সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় গবেষণার সার্বিক দিক যাচাই বাছাইয়ের জন্য ৭ জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু বিষয়টি সাংবিধানিক তাই পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতার কথা উক্ত গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে গবেষণার তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'নির্বাচন, গণতন্ত্র ও গবেষণার মূল শিরোনাম বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ বিষয়ের উপর তত্ত্বগত ও কার্যকর উপযোগী আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আলোচ্য অধ্যায়ে গবেষণার সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ও দলিলাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে সাহিত্যের নান্দনিকতার মাধ্যমে গবেষণার মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ বিষয়ের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদি দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া, এ অধ্যায়ের গবেষণার কিছু সূক্ষ্ম বিষয় অর্থাৎ সাংবিধানিক কিছু সমস্যাকে চিহ্নিত করে যুক্তির মাধ্যমে সমাধানের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়টি হলো গবেষণার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণের মাধ্যমে ঘটনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের মতামতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে গণমাধ্যমের আলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এ অধ্যায়ে দলীয় সরকারের আমলে কিছু নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়কে অত্যন্ত প্রাধান্যের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে গবেষণার প্রধান ফলাফল ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনাসহ সুপারিশমালা প্রণয়নের মাধ্যমে কিছু বিতর্কিত বিষয়কে চিহ্নিত করে সুপারিশ তৈরী করা হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায় ঃ এ অধ্যায় গবেষণার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। অর্থাৎ জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং নির্বাচন যেন আর বিতর্কিত না হয়, জনগণ যেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নির্বাচনই একমাত্র ক্ষমতার উৎস ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে গবেষণার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সূচী	পৃষ্ঠা নং
গবেষকের কথা	I-II
গবেষণার সারাংশ	III-IV
টেবিল তালিকা	XII
রেখচিত্র তালিকা	XIII
ছবি তালিকা	XIV
প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা	**১-১৭**
১.১ ভূমিকা	১-৪
১.২ তত্ত্বধায়ক সরকার একটি মডেল	৪-৫
১.৩ গবেষণার শিরোণাম ও সমস্যার বিবরণ	৫-৭
১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা	৭-৮
১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য	৮-৯
১.৬ গবেষণা প্রশ্ন	৯
১.৭ গবেষণার ভিত্তি	১০
১.৮ গবেষণার পরিসর ও প্রকৃতি	১০-১১
১.৯ গবেষণার অধ্যায় ভিত্তিক রূপরেখা	১১
১.১০ গবেষণার রূপরেখা	১২
১.১১ গবেষণার উপকরণ পদ্ধতি	১৩-১৪
১.১২ গবেষণার কৌশল	১৫
১.১৩ গবেষণার কৌশল ও উপকরণ- উন্নয়ন	১৫
১.১৪ পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা	১৫-১৬
পাদটীকা	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট	**১৮-৫১**
২.১ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি	১৮-১৯
২.২ শাসন ব্যবস্থা	১৯

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

২.৩ সরকার..... ২০

২.৪ বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা ২০-২১

২.৫ নির্বাচন..... ২২

২.৬ নির্বাচন ও গণতন্ত্র..... ২৩-২৪

২.৭ নিরপেক্ষ নির্বাচন..... ২৫-২৮

২.৮ নির্বাচনের ঐতিহাসিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট..... ২৮-২৯

২.৯ বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি ৩০-৩২

২.১০ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণা..... ৩২

২.১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দার্শনিক ভিত্তি..... ৩২-৩৩

২.১২ গণতন্ত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার..... ৩৩-৩৪

২.১৩ তিন জোটের রূপরেখা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা..... ৩৫-৩৬

২.১৪ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৩৭-৪৩

২.১৫ বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারঃ সদস্যদের যোগ্যতা ও কার্যাবলী..... ৪৩-৪৪

২.১৬ বাংলাদেশের নির্বাচন..... ৪৪-৪৮

পাদটীকা..... ৪৮-৫১

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ও দলিলাদি বিশ্লেষণ..... ৫২-১০৮

৩.১ সাহিত্য পর্যালোচনা ৫২

৩.১.১ ভূমিকা..... ৫২-৫৩

৩.১.২ উন্নয়ন সাহিত্যের আলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার..... ৫৩-৫৮

৩.২ দলিলাদি বিশ্লেষণ..... ৫৮

৩.২.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক রূপ..... ৫৮-৬১

৩.২.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্বল দিক ঃ একটি পর্যালোচনা..... ৬১-৬৪

৩.২.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাষ্ট্রপতি..... ৬৫

৩.২.৪ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়..... ৬৫-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

৩.২.৫ নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব না হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ কাল..... ৬৮-৭০

৩.২.৬ নির্বাচন কমিশন ও বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সমূহ..... ৭০-৭৮

৩.২.৭ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রণীত নির্বাচনী আচরণ বিধি..... ৭৮-৮৩

৩.৩ নির্বাচনের ইতিহাসের ধারায় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার..... ৮৩-৮৭

৩.৩.১ ইতিহাসের আলোকে তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার..... ৮৭-৯১

৩.৪ সংবিধান, নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার..... ৯১-৯৭

৩.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ৯৭-১০১

৩.৬ ভারতের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও হাইকোর্টের রায়..... ১০২-১০৫

৩.৭ ত্রয়োদশ সংশোধনী রীটের রায় ১০৫-১০৬

পাদটীকা..... **১০৭-১০৮**

চতুর্থ অধ্যায় ঃ তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ, ঘটনা বিশ্লেষণ **১০৯-১৬৩**

৪.১ ভূমিকা ১০৯

৪.২ ঘটনা বিশ্লেষণ..... ১০৯

৪.২.১ সাধারণ তথ্যাবলী..... ১০৯

৪.২.২ উত্তরদাতাদের মতামত..... ১১০

৪.২.৩ উত্তরদাতাদের বয়সসীমা ১১০-১১১

৪.২.৪ উত্তরদাতাদের পেশা..... ১১২-১১৩

৪.২.৫ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা..... ১১৪

৪.৩ সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ..... ১১৫

৪.৩.১ মতামত প্রদানকারীদের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা ১১৫

৪.৩.২ বাংলাদেশের পেক্ষাপটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাঁধা সমূহ..... ১১৫-১১৮

৪.৩.৩ নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত মতামত ১১৮-১১৯

৪.৩.৪ অন্যান্য নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ১১৯

৪.৩.৫ ভোটার উপস্থিতি ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

৪.৩.৬ নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে সাফল্য ১২০
৪.৩.৭ যে নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক এর অধীনে হওয়া উচিত ১২১-১২২
৪.৩.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প ১২২
৪.৩.৯ আইন শৃঙ্খলার তুলনামূলক পরিস্থিতি সম্পর্কিত মতামত..... ১২২
৪.৩.১০ জনগণের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা উদ্ভবের কারণ..... ১২২-১২৩
৪.৩.১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে ভোট প্রদানে পার্থক্য অনুভবঃ
নিরপেক্ষ নির্বাচন ১২৩
৪.৩.১২ দেশে বিরাজমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা ১২৩-১২৪
৪.৩.১৩ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের উপায় ১২৪-১২৫
৪.৩.১৪ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে নিরপেক্ষতা ১২৫-১২৬
৪.৩.১৫ নির্বাচনী ফলাফল গ্রহণের হার..... ১২৬
৪.৪ সংবিধান / আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত ১২৭
৪.৪.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রকৃতি নিয়ে আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত ১২৭
৪.৪.২ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ ১২৭
৪.৪.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত ভিত্তি ১২৮
৪.৪.৪ সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী সংযোজন ১২৮
৪.৪.৫ নির্বাচনী অনিয়ম দুরীকরণ ১২৮
৪.৪.৬ এ ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করার পদক্ষেপ ১২৮-১২৯
৪.৪.৭ সংবিধানের ১২০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ১২৯-১৩০
৪.৪.৮ নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব ১৩০
৪.৪.৯ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ১৩০
৪.৪.১০ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অপসারণ ১৩০-১৩১
৪.৪.১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর জনগণের ম্যান্ডেট..... ১৩১
৪.৪.১২ ত্রয়োদশ সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ ১৩১-১৩২
৪.৫ দায়িত্ব পালনকারী সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার সদস্যদের মতামত ১৩৩-১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

৪.৬ জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী বর্তমান বা সাবেক সাংসদ, বর্তমান বা সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সদস্য ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মতামত..... ১৩৫

৪.৬.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা বিষয়ক মতামত..... ১৩৫-১৩৬

৪.৬.২ নির্বাচন আয়োজনের সময়সীমা..... ১৩৬-১৩৮

৪.৬.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্রের নিরপেক্ষতা নিয়ে মতামত..... ১৩৮-১৩৯

৪.৭ স্থানীয় সরকারের জন প্রতনিধিদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ ১৪০

৪.৭.১ স্থানীয় সরকার নির্বাচন..... ১৪০

৪.৭.২ জাতীয় নির্বাচন..... ১৪০

৪.৭.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা..... ১৪০

৪.৭.৪ সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন..... ১৪০-১৪১

৪.৭.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবল ও দুর্বল দিক ১৪১

৪.৭.৬ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা..... ১৪১

৪.৭.৭ স্থানীয় সরকার নির্বাচন..... ১৪১

৪.৭.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল্যায়ন ১৪২

৪.৭.৯ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা..... ১৪২

৪.৭.১০ দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দোষ ত্রুটি..... ১৪২

৪.৭.১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার কারণ..... ১৪২

৪.৮ আলোচ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ..... ১৪৩

৪.৮.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভবের কারণ..... ১৪৩

৪.৮.২ উন্নত বিশ্বের সাথে তুলনা..... ১৪৩

৪.৮.৩ অনির্বাচিত সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক নির্বাচন..... ১৪৪-১৪৫

৪.৯ সংসদীয় নির্বাচন..... ১৪৬-১৪৭

৪.৯.১ দলীয় সরকার ও নির্বাচন..... ১৪৮

৪.৯.২ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সাংসদ..... ১৪৯

৪.৯.৩ আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা..... ১৪৯-১৫০

৪.৯.৪ নির্বাচন বর্জন..... ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

৪.৯.৫ ভোট কেন্দ্র সংখ্যা..... ১৫০-১৫১

৪.৯.৬ আসন প্রতি ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা..... ১৫১-১৫৩

৪.৯.৭ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দল ও জোট..... ১৫৩-১৫৫

৪.১০ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব..... ১৫৬

৪.১০.১ সাধারণ মানুষের জীবন ধারা..... ১৫৬

৪.১০.২ সরকারি কর্মকর্তাদের চাপবিহীন দায়িত্ব পালন..... ১৫৬

৪.১০.৩ গণ-মাধ্যমের প্রচারণার ধরণ পরিবর্তন..... ১৫৭-১৫৮

৪.১০.৪ বিটিভি ও সরকারি প্রচার মাধ্যম..... ১৫৮-১৬৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ গণ মাধ্যম ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৬৪-২০৩

৫.১ ভূমিকা..... ১৬৪-১৭৪

৫.২ গণ-মাধ্যমের দৃষ্টিতে দলীয় সরকার ও নির্বাচন ১৭৪-১৮৭

৫.৩ দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় নির্বাচন ষ্টাইল..... ১৮৭-১৮৯

৫.৪ এ দেশের রাজনীতিতে সমস্যা ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতামোহ ঃ ক্ষমতাকে স্থায়ী করণের চেষ্টা..... ১৮৯-১৯০

৫.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের অভিজ্ঞতা ১৯০-১৯১

৫.৬ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বল দিক সমূহ ১৯২

৫.৭ নির্বাচনী ব্যবস্থা শক্তিশালী করণে কিছু সুপারিশ..... ১৯৩-১৯৫

৫.৮ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ঃ তত্ত্বাবধায়ক ও দলীয় সরকারের সময়কাল ১৯৬-১৯৯

৫.৯ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ১৯৯-২০০

৫.১০ নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনী মামলা..... ২০০-২০৩

৫.১১ উপসংহার..... ২০৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ফলাফল ও সিদ্ধান্ত..... ২০৪-২১৬

ফলাফল ও সিদ্ধান্ত ২০৪-২১৬

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার ২১৭-২২০

উপসংহার..... ২১৭-২২০

সুপারিশমালা..... ২২১-২২৩

Bibliography (গ্রন্থপঞ্জি)..... ২২৪-২৩০

Documents (দলিলাদি) ২২৪

Books/ Articles ২২৫-২২৯

দৈনিক পত্রিকা/ মাসিক/ সাপ্তাহিক..... ২২৯-২৩০

অপ্রকাশিত থিসিস..... ২৩০

পরিশিষ্ট ঃ ২৩১-২৫০

পরিশিষ্ট -১ ঃ জনসাধারণের মতামত জরীপ প্রশ্নপত্র ২৩১-২৩৩

পরিশিষ্ট -২ ঃ সংবিধান/ আইন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার ২৩৪-২৩৫

পরিশিষ্ট -৩ ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দায়িত্ব পালনকারী প্রধানউপদেষ্টা/ উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকার ২৩৬

পরিশিষ্ট -৪ ঃ সাসংদ/ বর্তমান সাবেক মন্ত্রীপরিষদের সদস্য/ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার ২৩৭

পরিশিষ্ট -৫ ঃ স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার..... ২৩৮

পরিশিষ্ট -৬ ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার..... ২৩৯

পরিশিষ্ট -৭ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের একাদশ সংশোধনী ২৪০-২৪৩

পরিশিষ্ট -৮ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী..... ২৪৪-২৫০

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল তালিকা

পৃষ্ঠা নং

২.১ টেবিল- বাংলাদেশে একনজরে সম্পন্ন হওয়া জাতীয় নির্বাচন সমূহ ৪৫

২.২ টেবিল- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহ..... ৪৬

২.৩ টেবিল- বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহ ৪৭

৪.১ টেবিল- উত্তরদাতাদের বয়স সীমা ১১১

৪.২ টেবিল- পেশা অনুযায়ী উত্তরদাতা..... ১১৩

৪.৩ টেবিল-শিক্ষাগত যোগ্যতা ১১৪

৪.৪ টেবিল- জাতীয় সংসদে ভোট দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্তরে সমস্যার হার ১১৬

৪.৫ টেবিল- ভোটদানে সমস্যা ১১৭

৪.৬ টেবিল- নিরপেক্ষ নির্বাচনে করণীয় ১১৮

৪.৭ টেবিল- নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন আয়োজনের তুলনা ১২০

৪.৮ টেবিল- তত্ত্বাবধায়কের অধীনে যে যে নির্বাচন হওয়া উচিত..... ১২১

৪.৯ টেবিল- দেশে বিরাজমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা ১২৩

৪.১০টেবিল- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণের উপায়..... ১২৪

৪.১১ টেবিল- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে নিরপেক্ষতা..... ১২৫

৪.১২ টেবিল- দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ১৩৭

৪.১৩ টেবিল- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসন, পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী..... ১৩৮

৪.১৪ টেবিল- এক নজরে সংসদীয় নির্বাচন (১৯৭৩-২০০১)..... ১৪৭

৪.১৫ টেবিল- আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা..... ১৪৯

৪.১৬ টেবিল- আসন প্রতি ভোট কেন্দ্র..... ১৫১

৪.১৭ টেবিল- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও জোট সংখ্যা ১৫৩

৪.১৮ টেবিল- নির্বাচনে মোট ভোটার ও প্রদত্ত ভোটের হার ১৫৫

৪.১৯ টেবিল- নিরপেক্ষতা প্রশ্নে গণমাধ্যম..... ১৫৯

৪.২০ টেবিল- ভোট প্রদানে উৎসাহ..... ১৬২

৫.১ টেবিল- ১ম তিন মাস - আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঃ তত্ত্বাবধায়ক ও দলীয় সরকারের সময়কাল.... ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

রেখ চিত্র তালিকাঃ

১.১ রেখচিত্র - গবেষণায় ব্যবহৃত ধাপ সমূহ ১২

৪.১ রেখচিত্র- মোট টার্গেট গ্রুপের স্তর ১১০

৪.২ রেখচিত্র- উত্তরদাতাদের বয়সসীমা..... ১১১

৪.৩ রেখচিত্র- শিক্ষাগত যোগ্যতা ১১৪

৪.৪ রেখচিত্র- জাতীয় সংসদে ভোট দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্তরে সমস্যার হার..... ১১৬

৪.৫ রেখচিত্র -ভোটদানে সমস্যা..... ১১৭

৪.৬ রেখচিত্র -নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন আয়োজনের তুলনা..... ১২০

৪.৭ রেখচিত্র -তত্ত্বাবধায়কের অধীনে যে যে নির্বাচন হওয়া উচিত..... ১২১

৪.৮ রেখচিত্র - দেশে বিরাজমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা..... ১২৪

৪.৯ রেখচিত্র -গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণের উপায় ১২৫

৪.১০ রেখচিত্র - নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা..... ১৩৪

৪.১১ (ক) রেখচিত্র - আসন প্রতি ভোট কেন্দ্র দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন. ১৫২

৪.১১ (খ) রেখচিত্র -আসন প্রতি ভোট কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কাল..... ১৫২

৪.১২ (ক) রেখচিত্র -নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী দল ও জোট সংখ্যা দলীয় সরকারের অধীনে ১৫৩

৪.১২ (খ) রেখচিত্র -নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও জোট সংখ্যা তত্ত্বধায়ক সরকারের সময়কালে..... ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ছবি তালিকা

পৃষ্ঠা নং

২.১ ছবি-১ম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঐতিহাসিক মূহুর্ত ৩৬

২.২ ছবি -১ম সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৪২

৫.১ ছবি -জাল ভোট - প্রকাশ্যে সীল মারার দৃশ্য ১৭৭

৫.২ ছবি- ভোটারদের জড়ো করে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রে..... ১৭৯

৫.৩ ছবি- প্রতিপক্ষের হুমকীর মুখে একজন প্রার্থী..... ১৮০

৫.৪ ছবি- বাংলাদেশের দু'নেত্রী জিমি কার্টারের পরামর্শ মেনে নেয়ার পর করমর্দনরত ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা (INTRODUCTION)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা (INTRODUCTION)

বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে নবতর সংযোজন হচ্ছে- তত্ত্বাবধায়ক সরকার[১]। গ্রীসের নগর রাষ্ট্র থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করা গণতন্ত্র নামক ধারনাটিতে নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ[২]। "গণতন্ত্র" প্রপঞ্চটির সর্বজন স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা যেমন নেই তেমনি নেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সর্বজনীন কোন ব্যবস্থা। তবে নির্বাচন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা। আর শিক্ষা হচ্ছে এ অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র পূর্বশর্ত। কিন্তু শিক্ষা না থাকাতে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক ব্যবসায়ী নির্বাচনের বৈতরনী পার হচ্ছে। প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার, ভি, আই,পি প্রটোকল ব্যবহার, তথ্য ক্যু, সিভিল ক্যু ইত্যাদি কারণে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে আস্থা হারিয়ে ফেলে এদেশের জনতা। আসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

বাংলাদেশের বিগত চৌত্রিশ বছরের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করে রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা অন্তত একটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছেন যে, এদেশের জন-সমাজ স্বৈরতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এদুয়ের যাতাকলে নিষ্পেশিত হতে চলেছে। এ জাতীয় একটি মিশ্র শাসন ব্যবস্থা কখনও কোন সরকারকে আর যা-ই হোক অন্তত জনগণের কাছে প্রকৃত জবাবদিহিতামূলক সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। আর প্রকৃত জবাবদিহিতামূলক সরকার ছাড়া কখনই ঐক্যমত, গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। কেননা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু নির্বাচনের মতো একটি কঠিন সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে একটি সরকার জবাবদিহিতার বিকাশ ঘটাতে পারে যেটি আসলেই সম্ভব হচ্ছে না। যদিও সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন সমূহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারপরেও একটা বিষয় লক্ষনীয় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেমন কোন সমঝোতা বা ঐক্যমত নেই; তেমনি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছু কিছু আসনে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিদ্যমান সরকারের পক্ষপাতিত্বের কারণে এ গণতন্ত্র যে আবারও চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়েছে তা আমরা দেখতে পাই না। এখন প্রশ্ন হলো কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন? যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পর যে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায়

Dhaka University Institutional Repository

অধিষ্ঠিত হয় সে গণতান্ত্রিক সরকার যদি বিরোধী দলের অগণতান্ত্রিক বিরোধিতার কারণে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও জনকল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন না করতে পারে এবং জনগণের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটাতে না পারে তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করে কোন লাভ নেই[৩]।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি একটি নতুন ধারণা, এতে সন্দেহ নেই। কারণ বিশ্বের আর কোন গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরণের বিধি প্রচলিত নেই। কোন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ হলে কিংবা সংসদে আস্থা হারানোর ফলে নির্বাচনের প্রয়োজন হলে সেই রাজনৈতিক দলই তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং নির্বাচনী তফসীল মোতাবেক নির্বাচন পরিচালনা করে। সাধারণ ভাবে ভোগ করা ক্ষমতা এবং তফসিল ঘোষণা থেকে নির্বাচনের ফল ঘোষণা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকে, অবশ্য এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্যতিক্রমও আছে। বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতেও সাম্প্রতিক কালে বিজেপি সরকার বলেছিল "তত্ত্বাবধায়ক সরকার অর্থহীন"। যতক্ষন ক্ষমতা আছে ততক্ষন সবকিছু আমাদের নিয়মেই চলবে। তারপরেও বিজেপির অধীনে নির্বাচনের পর আমরা দেখি যে বিজেপি ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ ক্ষমতায় আসে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল 'কংগ্রেস'। অর্থাৎ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যেহেতু সুষ্ঠু নির্বাচন তাই নেতৃত্বের মার্জিত পরিশীলিত আচরণ ও দায়িত্বশীলতাই গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে পারে। তাছাড়া ব্রিটেনে এখন নির্বাচনকালীন কর্মকান্ড ঐতিহ্যমাফিক নিয়মেই চলছে। ইউরোপের দেশগুলো সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে রাজনীতিকে মিলিয়েছে এবং বলতে গেলে শালীনতা এবং নির্মোহতার প্রতিযোগিতাই তাদের মধ্যে বেশী। জাপানেও একটা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। নির্বাচনকে এই ব্যবস্থায় অবিচ্ছেদ্য কিছু স্বাভাবিক নিয়ম বলে মানা হচ্ছে। অবশ্য এসব বিষয়ে কোন দেশেই লিখিত আচরণবিধি নেই।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক ধারণাকে অভিনব মনে হতে পারে। তবে তত্ত্বাবধায়ক ধারণাটা প্রচলিত, শুধু নির্দলীয় বিষয়টা নতুন সংযোজন। কেন নির্দলীয় ব্যবস্থাটার প্রয়োজন পড়ল সে বিষয়ে এ দেশের সকলেই সচেতন। শুধু এটুকুই এ ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, নেতাদের অসহিষ্ণুতা, নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। কারণ একটা শূন্যতা সৃষ্টির আশঙ্কা যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনই আবার সেই শূন্যতা পূরণে ননসিভিল প্রশাসনকে টেনে আনার প্রবনতাও ছিল। এথেকে রক্ষা পেতে ১৯৯৪ সালের শেষদিকে বিষয়টিকে সাংবিধানিক বিধিবদ্ধতা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গৌরবজনক অধ্যায় হলেও যে কারনে এবং যেভাবে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা মোটেও গৌরবের ব্যাপার ছিল না। গত বি.এন.পি. সরকারের আমলে ব্যাপক কারচুপির মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত মাগুরা উপ নির্বাচন তত্ত্বাবধায় সরকারের জন্য আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। তুমুল আন্দোলন এবং বহু রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে এদাবি অর্জিত হয়। মাগুরা উপনির্বাচনের চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় কায়চুপি ও সহিসংতার মধ্যে অনুষ্ঠিত ৯৬ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয় ষষ্ঠ সংসদ[৪]। এ সংসদে তৎকালীন বি.এন.পি. সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ ব্যবস্থা শুধু জাতীয় ভাবেই নয় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃত ও বহুল প্রশংসিত।[৫]

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অর্থাৎ গত নির্বাচনটি ছিল সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন[৬]। কিন্তু তার আগে ৯০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি এ ধরনের এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হয়েছিল। যদিও দেশের ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতি ও অস্থিতিশীল পরিবেশ অর্থাৎ ৯০ এর স্বৈরশাসকের পতনের পর কোন্ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এ প্রশ্নের ফলশ্রুতিতে বিরোধী জোটের দাবীর প্রেক্ষিতে তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যদিও ৯০ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ছিল সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। তারপরেও বলতে হয় এটা ছিল জনগণের আশা আকাঙ্খা ও বিরোধী জোটের স্বপ্নের প্রতিফলন। তাই সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বৈধতা নেয়া হয়।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

দেখার বিষয় হচ্ছে এই ব্যবস্থা পূর্ববর্তী ব্যবস্থা হতে- কতটা ফলপ্রসূ। যে কোন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে এর দোষ ত্রুটি গুলো ধরা পড়ে এবং ধীরে ধীরে ত্রুটিগুলো শুধরিয়ে সে ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। ব্যবস্থাটি কাগজে কলমে যতই ভাল হোক না কেন বাস্তব ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা। কেননা এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি একেবারে নবতর পর্যায়ের মধ্যেই রয়েছে। তত্ত্বগত ভাবে ধারণাটি উত্তম হলেও প্রায়োগিক দিকে তিনটি নির্বাচন যেতে না যেতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। তাই এখন সময়ের দাবী, এ ব্যবস্থার দুর্বল দিক, দোষত্রুটি, ভাল দিক, সর্বোপরী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করণ কল্পে এ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশদ গবেষণা করা প্রয়োজন। তাছাড়া জনগণের সচেতনতা, গণদারিদ্র এবং নিরক্ষরতার কারণে এধারণাটি বর্তমানে প্রায় প্রশ্নসাপেক্ষ। তাই গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করে নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদদের একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার দ্বারা এ মডেলটি শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে গবেষক মনে করেন। শুধু তাই নয়, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মডেলটিকে পরিপূর্ণতা দান করা এখন সময়ের দাবী যার ভিত্তিতে উক্ত গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

১.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি মডেল (Care taker Government: A Model)

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও গণদারিদ্র মোকাবেলায় অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এ দেশে অনেক মডেলের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নবতর সংযোজন ও মডেল হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

বাংলাদেশ থেকে সারা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে একাধিক মডেলের সৃষ্টি হয়েছে। যা আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ ব্যবহার করছে। যেমন অর্থনৈতিক ও গ্রামীন উন্নয়নের ক্ষেত্রে বার্ড এর কুমিল্লা মডেল[৮], গ্রামীন ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋন সম্পর্কিত মডেল, ব্রাক এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মডেল, সিডিভির প্রতিবন্ধীদের সমাজভিত্তিক পূর্ণবাসনের সিএএইচভি মডেল[৯] ইত্যাদি, আজ পৃথিবীর অনেক দেশ তাদের স্বীয় প্রেক্ষাপটের আলোকে গ্রহণ করেছে। ঠিক এ রকম

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উদ্ভূত একটি মডেল হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই মডেলটির পূর্ণতা আনয়নের লক্ষে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশ আজ এ ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে, গভীর পর্যবেক্ষন করছে এবং স্বীয় দেশে প্রয়োগের চিন্তা ভাবনা করছে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ এ মডেল থেকে শিক্ষা নিয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত কয়েকটি দেশে জাতিসংঘ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ভূমিকায় কাজ করে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করে সফলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে, যা ঐ দেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর কাছে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

যদিও বর্তমানে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি স্বীকৃত মডেল, কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কিছু ঘটনা এবং নির্বাচনে পরাজয়বরণকারী দলের মন্তব্য এ ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সফল ও দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে এ ব্যবস্থাকে আরো ফলপ্রসু করতেই আলোচ্য গবেষণা সমস্যা নির্বাচিত হয়েছে।

১.৩ গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ (Title of the Research and Cruse of the Problem)

আলোচ্য গবেষণাটির শিরোনাম হচ্ছে "বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ"

"Robert Ross এর মতে Research is essentially an investigation, a recording and an analysis of evidence for the purpose of gaining knowledge"[১০] অর্থাৎ গবেষণা হলো মূলত জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান, একটি সমস্যা কেন্দ্রীক অনুসন্ধান।

যে কোন বিষয়ের সত্যানুসন্ধানের স্বার্থে তার গভীরে প্রবেশ করে যৌক্তিকতা ও মূল্যবোধের নিরীখে সুচিন্তিত ও অন্তর্নিহিত স্বরূপ উদঘাটন করাই হচ্ছে গবেষণা। অর্থাৎ কোন একটি সমস্যা আছে তার সমাধানের স্বার্থে বিশেষ পদ্ধতিতে চিন্তার নামই হচ্ছে গবেষণা বা রিসার্চ। প্রকৃত পক্ষে কোন একটি সমস্যা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবনা এবং সুতীব্র সচেতনতাই হচ্ছে গবেষণার প্রধান বিষয়। এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, বাস্তবের সংঘাত থেকেই সৃষ্টি হয় সমস্যা, আর সমস্যার কারণ, উৎপত্তির কারণ ইত্যাদির যৌক্তিক উত্তর খুজে বের করে সমস্যাটির সমাধানের পথ খুজে বের করাই হচ্ছে গবেষণার উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণাটিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ এর উপর ভিত্তি করে উক্ত গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে এবং এ কনসেপ্টের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা বিরাজমান তার বিভিন্ন দিক উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা দীর্ঘ সংগ্রামের পর সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা পেলেও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আজ অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি। রাজনৈতিক সহিংসতা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরম অসহিষ্ণু মনোভাব এবং সর্বোপরি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কিছু কিছু পদক্ষেপ ও ভূমিকা বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে[১১]।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবির্ভাব তা হলো ১৯৯০ সালের পূর্ববর্তী কালের কয়েকটি নির্বাচন ও উপ নির্বাচন এমন সব ঘটনার অবতারণা করেছিল যার ফলে জনগণের মনে নির্বাচন সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এমনকি নির্বাচনের উপর থেকে আস্থা পর্যন্ত উঠে যায়। কারণ এ সময় ক্ষমতাশীন দল ভোটারদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ ভোটকেন্দ্রে যেতে বাঁধার সৃষ্টি করত। বলতে গেলে ভোটার বিহীন অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত। অথচ ৭০/৮০ ভাগ ভোট কাস্ট দেখান হত। তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে গত ১ জুলাই ২০০৪ অনুষ্ঠিত ভি,আই,পি, আসন হিসেবে খ্যাত ঢাকার ১০ আসনের উপনির্বাচনে স্মরণকালের ভয়াবহ কারচুপি আবারও গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জের দিকে ঠেলে দেয়[১২]।

অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের পরোক্ষ ইঙ্গিতে চালিত নির্বাচন কমিশন আর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কর্মরত প্রশাসনের সহযোগিতায় সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে দেয়া হয়েছে তাদের কাঙ্খিত প্রার্থীর। ফলে নির্বাচন আর গণতন্ত্রের নামে অভিনীত হয়েছে প্রহসনের নাটকের। যে কারণে এরশাদ শাসনের অবসানের পর তিনটি রাজনৈতিক জোট ও জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয় সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি। যদিও ১৯৯০ সালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারটি সংবিধান বহির্ভূত ছিল তারপরেও সুষ্ঠু নির্বাচন, একাদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের স্বপদে পুনরায় ফিরে যাওয়ার কারণে শুধু জাতীয় ক্ষেত্রেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ ধারণা ব্যাপক প্রশংসিত হয়[১৩]। যদিও আমরা সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের সন্ধান পাই ১৯৯৬ সালে বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। অতপর সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পর দুটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের আশা ছিল যেহেতু দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেহেতু পূর্বেকার ন্যায় নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে তার কোন প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু সর্বশেষ ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু কিছু পদক্ষেপ এবং নির্বাচনের পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অসহিষ্ণু মনোভাব এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করে তুলেছে। তাই বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থা তথা একটা দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের শ্রমকে ফলপ্রসু করার তাগিদে অর্থাৎ গণতন্ত্রকে সমুন্নত করার স্বার্থে এ বিষয়টিকে "সমস্যা" নির্বাচন করে গবেষণা কর্মটি রচিত হয়েছে।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা (Justification of the Study)

১৯৯০ সালে ১ম বারের মত অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায় সরকারের অধীনে নির্বাচনের পর দীর্ঘ ১৪ বছর কেটে গেছে, কিন্তু এখনও কিছু মৌলিক প্রশ্ন রয়ে গেছে। যদিও ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক যার সাংবিধানিক বৈধতা দেয়া হয় একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি আমরা দেখতে পাই দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে মহান জাতীয় সংসদে পাশকৃত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। এ সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভিত্তি রচিত হওয়ার পরেও কিন্তু দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর যে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে এ দেশের গণতন্ত্রকামী জনতা যে স্বপ্ন দেখেছিল তা আজ অনেকটাই ধূলিস্যাৎ হতে চলেছে। কারণ এ ব্যবস্থা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে নানা ধরণের এবং সৃষ্টি হয়েছে নানা জল্পনা কল্পনার।

একটি বড় প্রশ্ন হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে কেন প্রয়োজন? সংবিধানের একাধিক ধারা নিয়ে এ পর্যন্ত হয়ে গেছে অনেক বির্তক ও মামলা মোকদ্দমা। অনেকে সমালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

করে বলেছেন একটি অনির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচিত হবে একটি গণতান্ত্রিক সরকার। এ ব্যাপারটি গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় কতটা গ্রহণযোগ্য? আরেকটি বড় প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যবস্থা কতটা সফল ? এ ব্যবস্থা কতটা সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সফল হয়েছে এবং কিভাবে এ বাধা সমূহ দূরীভূত করা যায় ? তাছাড়া নির্বাচনের পর একটি বিষয় লক্ষনীয়, যে দল পরাজয় বরণ করে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ট আসন লাভে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ বিরোধী দলগুলোর অগণতান্ত্রিক মনোভাব ও কিছু উক্তি এ ব্যবস্থাকে জনমনে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। যদিও একটি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এর দোষত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই এই দোষত্রুটিগুলোকে গবেষণা সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ ব্যবস্থাকে কিভাবে সফল করা যায় তার যৌক্তিকতা নির্ধারনের মানদন্ডে উক্ত গবেষণা কর্মটি রচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়টির উপর আমার জানামতে এখনো পর্যন্ত কোন গবেষণাকর্ম রচিত হয়নি। তাই গণতন্ত্রকামী জনতার দীর্ঘ দিনের স্বপ্নকে সফল করার জন্য এ বিষয়টির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের দ্বারা জনগণের স্বপ্নের দাবীগুলোর প্রতি আবার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হলো।

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

সাধারণ উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণাটির মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে "বাংলাদেশের বিগত বছর গুলোর গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বরূপ, গতি প্রকৃতি উদঘাটন, যার ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ ও জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতি দল, প্রতিষ্ঠান ও সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আরো ফলপ্রসু করতে বাস্তব সম্মত, কার্যকরী ও চাহিদা ভিত্তিক যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ উদ্দেশ্যাবলী

উপরোক্ত সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারিত হয়েছে-

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব নিরূপন।

২. দেশে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

৩. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন।

৪. সাংবিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা।

৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে দেশের বিভিন্ন মহল ও জনসাধারণ এর মধ্যে উদ্ভূত বিতর্ক পর্যালোচনা পূর্বক গ্রহণ যোগ্যতা নিরূপন।

৬. তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আরো ফলপ্রসূ করার সম্ভাব্য পদ্ধতি সমূহ নির্ধারণ এবং উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক সরকারের দায়িত্ব হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে দায়িত্ব পালনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ।

৭. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকারীতা নির্ধারণ।

৮. বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্বাচন আয়োজনে ও দায়িত্ব পালনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি সমাজের মনোভাব নির্ণয়।

১.৬ গবেষণা প্রশ্ন (Questionnaire)

আলোচ্য গবেষণায় উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু সমস্যার সমাধান কল্পে এবং বাস্তব পরিস্থিতি অনুসন্ধানে কয়েকটি গবেষণা প্রশ্ন প্রনীত হয়েছে। গবেষণা প্রশ্নগুলি গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী হতে উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণার উদ্দেশ্যাবলীকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রশ্নে রূপান্তর করা হয়েছে। কেননা গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ প্রশ্নে রূপান্তর করলে গবেষণা কার্য সুষ্ঠু ভাবে সুনির্দিষ্ট উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত করা সহজতর হয়। যার মাধ্যমে সহজেই গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ গবেষণার মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়। আলোচ্য গবেষণার সকল প্রকার তথ্য অনুসন্ধান ফলাফলের ব্যাখ্যা (Interpretation), গবেষণা বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নিম্নোক্ত গবেষণা প্রশ্নাবলীর সাপেক্ষে পরিচালিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ গবেষণার ভিত্তি (Basis of the Study)

গবেষণা প্রশ্নাবলী- আলোচ্য গবেষণাটি নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়েছে-

ক. দেশে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অনুষ্ঠানে সত্যিই কি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা আছে?

খ. দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন না তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত কোন নির্বাচন অধিক ফলপ্রসূ (নির্বাচন অংশগ্রহণের হার, ভোট প্রদানের হার, নির্বাচনী সহিংসতা ও সন্ত্রাসের প্রেক্ষিত)?

গ. বর্তমান বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে দেখা দিল কেন?

ঘ. এ সরকার ব্যবস্থা কতটা নিরপেক্ষ এবং এর মাধ্যমে নির্বাচনে কতটা স্বচ্ছতা ফিরে এসেছে?

ঙ. এ সরকার ব্যবস্থা কি দেশের সংবিধান ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

চ. এ সরকার পদ্ধতি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কতটা সমীচীন?

ছ. এ সরকার ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হয়েছে বা হওয়া সম্ভব?

জ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে যতগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

ঝ. এ ব্যবস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ভোটারদের কতটা সহযোগিতা করতে পারে?

ঞ. পূর্বে এ পদ্ধতি কোথাও ছিল কি?

ট. এ পদ্ধতির উন্নয়নে এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি?

১.৮ গবেষণার পরিসর ও প্রকৃতি (Scope and Nature of the Study)

গবেষণাটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন দিকের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাটিতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন দিক, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, রূপরেখা, দুর্বল ও সবলদিক ইত্যাদির উপর গভীর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মন্ডলী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, জনসাধারণ, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ (যেমন সাংসদ, চেয়ারম্যান, গ্রাম সরকার), প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও জনসাধারণের মতামতকে আলোচ্য গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিগত কয়েকটি দশকের ঘটনা প্রবাহ সংবাদপত্র তথা মিডিয়ার আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে নির্ধারিত পরিসরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আলোচ্য গবেষণাটির নতুন গবেষক, এ বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী জনগণ, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষার্থী, গবেষকদের জন্য তথ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে ভবিষ্যতে আরো গভীর কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

১.৯ গবেষণার অধ্যায় ভিত্তিক রূপরেখা (Statement of the Chapters)

আলোচ্য গবেষণা প্রতিবেদনটি মোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সুষ্ঠু নির্বাচন ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পদ্ধতিগত দিক, উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতার বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়-ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়-তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

তৃতীয় অধ্যায়- দলিলাদি বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়- তথ্য সম্বন্বিতকরণ ও বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়- গণমাধ্যমের আলোকে (পূর্বাপর) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব

ষষ্ঠ অধ্যায়-ফলাফল ও সুপারিশমালা

সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়- উপসংহারের মাধ্যমে গবেষণার পরিসমাপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

১.১০ গবেষণার রূপ রেখা

আলোচ্য গবেষণাটি নিম্নোক্ত প্রবাহ চিত্র অনুযায়ী ধাপে ধাপে সম্পাদিত হয়েছে।

রেখচিত্র ১.১ ঃ গবেষণার ব্যবহৃত ধাপ সমূহ

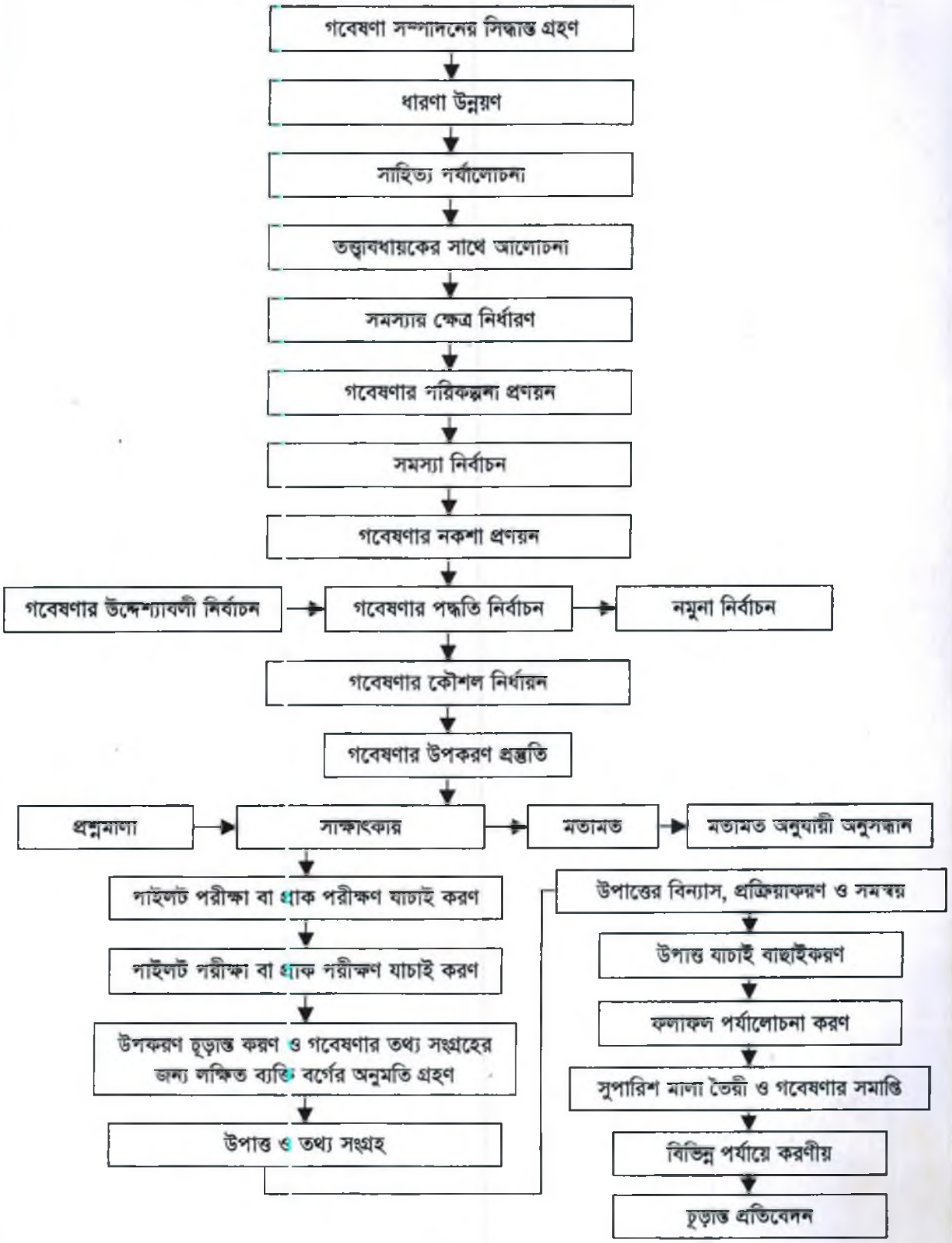

Dhaka University Institutional Repository

১.১১ গবেষণার উপকরণ পদ্ধতি

গবেষণাটির উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি বিশ্লেষণ অর্থাৎ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর সুদৃঢ় করতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনই যে জনগণের সার্বভৌমত্বের একমাত্র মাধ্যম তার স্বরূপ উদঘাটনের নিমিত্তে নিম্নোক্ত উপকরণ সমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।

ক. দলিলাদি বিশ্লেষণ (Document Analysis)

আলোচ্য গবেষণায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পর্কিত অর্থাৎ অনির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, জার্নাল, সংবিধান, নির্বাচনী আইন পত্রিকা, বিভিন্ন দেশের নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং এই ডকুমেন্টের আলোকে বিশ্লেষণ তৈরী করা হয়- যা বাংলাদেশের তৃণমুল পর্যায় থেকে আরম্ভ করে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক স্বরূপ।

খ. প্রশ্নমালা (Questionnaire)

বর্ণনামূলক গবেষণায় সর্বাধিক ব্যবহৃত উপকরণ হলো এই গবেষণা উপকরণ। আলোচ্য গবেষণায় মোট ৬(ছয়) টি প্রশ্নমালা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে,

- **জনসাধারণের মতামত ঃ** "জনসাধারণ নির্বাচন ও গনতন্ত্র" যেহেতু একে অপরের পরিপূরক ও সেতুবন্ধন সেহেতু প্রশ্নমালার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মতামতের উপর ভিত্তি করে তথ্য বিশ্লেষণ ও সম্বন্বিত করণের প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গুণগত (Qualitative) ও পরিমানগত (Quantitative) উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সম্বন্বিত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষণার ভিন্ন ভিন্ন কৌশল বা Tolls এর লক্ষ্যদল হওয়াতে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের লোকজন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যদল হিসেবে ১৮০ জনের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ **সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও দায়িত্ব পালনকারী উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকার ঃ** গবেষণা সমস্যাটি যেহেতু সাংবিধানিক তাই গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতাকে সাংবিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে খতিয়ে দেখার তাগিদে সংবিধান/আইন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ৪ জন সংবিধান বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণকরা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অর্থাৎ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে এবং দায়িত্ব পালন করে, সেই দায়িত্ব পালনকারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১০ জনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

❖ **বর্তমান ও সাবেক রাজনীতিবিদ সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিপরিষদের সাক্ষাৎকার ঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে তাই গবেষণাকে পুংখানুপুঙ্খ রূপে যাচাই বাছাইয়ের তাগিদে অর্থাৎ যারা ৫ বছরের জন্য সরকার পরিচালনা করবে কিংবা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে তাদের দৃষ্টিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা কেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তারা নির্বাচনকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন তার গভীর অনুসন্ধানের জন্য জাতীয় সংসদের সদস্য বর্তমান/সাবেক মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্রকরেই যেহেতু এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাই গবেষণাকে তাৎপর্যমন্ডিত করে তুলতে অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০ জনের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

❖ **রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতামত ঃ** গবেষণা সমস্যাটি সাংবিধানিক হলেও এ বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই গবেষণার সার্বিক দিক যাচাই বাছাইয়ের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে Field Specialist হিসেবে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১০ জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বেছে নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.১২ গবেষণা কৌশল (Technic of the Study)

গবেষণাটিতে মূলত গভীর বর্ণনামূলক অনুসন্ধান কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে গবেষণার শিরোনাম তথা সমস্যা নির্বাচন করা হয়েছে। সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা করার জন্য উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে উদ্দেশ্যসমূহকে কতগুলো গবেষণা প্রশ্নে রূপান্তর করা হয়েছে এবং এ প্রশ্নসমূহের উত্তর খুজে বের করার নিমিত্তে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে।

১.১৩ গবেষণা কৌশল ও উপকরণ উন্নয়ন

উপকরণ	উদ্দেশ্য
প্রশ্নমালা	গবেষণার সার্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ
সাক্ষাৎকার	বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ
দলিলাদি	বিভিন্ন পত্রপত্রিকা/ জার্নাল ও ডকুমেন্টের মাধ্যমে মাধ্যমিক বা গৌণ উৎসের ভিত্তিতে গবেষণাকে তাৎপর্যমন্ডিত করা।
জনমত জরিপ	নির্বাচন সম্বন্ধে আপামর জনসাধারণের অভিপ্রায়

১.১৪ পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা

গবেষণাটির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল গবেষণার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা। সময়সীমা কম হওয়াতে অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত আকারে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ভাছাড়া বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ ২০০৪ সালে সংগঠিত কয়েকটি নৃশংস হত্যাকান্ড- এর মধ্যে জাতীয় সংসদ সদস্যকে গুলি করে হত্যা, ডেড লাইন ৩০ এপ্রিল, হরতাল, বিএনপির ফ্লোর ক্রসিং পরাজয়, নতুন রাজনৈতিক দলের আর্বিভাব, পুলিশ হত্যা, উপনির্বাচন নিয়ে মামলা ও পরবর্তী ফলাফল ইত্যাদি কারণে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। এ সমস্ত কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ভি,আই,পি, এবং গবেষণার টার্গেট গ্রুপের অনেক সদস্যের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। তাছাড়া একাধিক সমস্যা এড়ানো ও সময় বাচানোর মাধ্যমে গবেষণা প্রশ্নাবলীর উত্তর বের করার জন্য তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ১৯৯০-২০০৪ পর্যন্ত পত্রিকা সমূহের তথ্যাবলী বাছাই করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন পরিস্থিতি অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালীন এবং তার পূর্বে ও পরে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি (রাজনৈতিক, সামাজিক, আইন শৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ইত্যাদি) যাচাইয়ে পত্রিকার উপর নির্ভর করা হয়েছে এবং পত্রিকার তথ্যাবলী সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। কেননা ঐ সময়কার পরিস্থিতি গবেষকের পক্ষে অংশ গ্রহণ মূলক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়নি কিংবা পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়।

যদিও গবেষণাটিতে সকল ক্ষেত্রে সব সময় আদর্শায়িত ও যথোপযুক্ত উপকরণ (Research Tools) ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও অনেকক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সাক্ষাৎকারকে পূর্ব কাঠামোতে সীমাবদ্ধ রাখা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। আবার জনসাধারণের মতামত জরীপের বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় লক্ষ্যদলের (Subjects) মানসিক, আবেগিক, বা ব্যক্তিত্বের লেভেল ইত্যাদির কারণে আদর্শায়িত টুলস ব্যবহার করা যায়নি, ব্যক্তির এই অবস্থার কারণে মতামতের কোন তারতম্য ঘটতে পারে কিনা, তা যাচাই করার সুযোগ এই গবেষণায় ছিল না বিধায় ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা, মানসিক অবস্থা, আবেগ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়নি। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন অবস্থানের (Status) ব্যক্তিদের মতামত বা উত্তরকে সাধারণীকরণে তথা যথোপযুক্ত পরিমাণগত বিশ্লেষণে আদর্শায়িত বিশ্লেষণ পদ্ধতি বা বিভিন্ন টেষ্ট বা অভিক্ষা প্রয়োগ কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। যথাসম্ভব উপযুক্ত টুলস ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে।

কয়েকশ্রেণীর উত্তর দাতার নিকট হতে প্রত্যক্ষ ভাবে উত্তর গ্রহণ সম্ভব হয়নি। কারণ তারা অত্যন্ত ব্যস্ত, VIP, যোগাযোগ সমস্যা ইত্যাদি। তাই প্রশ্নপত্র বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের গাইডলাইন প্রেরণের মাধ্যমে বা পত্রিকার প্রদত্তসাক্ষাৎকার থেকে পরোক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের উত্তর যে পক্ষপাত দুষ্ট হতে পারে তা যাচাই করা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা (Foot Notes)

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, সংশোধিত-২০০১।

২. George H. Sabine, *A History of Political Theory,* New York: Henry Holt and Company, 1958.

৩. আহমেদ কামাল, জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, ঢাকাঃ মানবাধিকার জার্নাল, প্রান্তজন, সংখ্যা-১, নভেম্বর-২০০১।

৪. বি.বি বিশ্বাস, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ঢাকা ঃ নীলা পাবলিশার্স, জুলাই ২০০১ পৃষ্ঠা- ৫

৫. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১২ জুন ১৯৯৬

৭. জনকণ্ঠ পাক্ষিক, ঢাকা, ২২ এপ্রিল-৬মে ২০০১ সংখ্যা- ২১, পৃষ্ঠা-৯-১৩

৮. Akter Hamid Khan, *Rural Co-operatives and Roads Comilla,* Dacca East Pakistan Bangladesh Academy for Rural Development, 1964, p- 17.

৯. প্রতিবন্ধী নারী ও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো, সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজএ্যাবিলিটি, ঢাকা- ২০০২, পৃষ্ঠা- ৭।

১০. Robert Ross, *Research : An Introduction,* India Chapter-1, p-4.

১১. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, সাময়িকী ১৭ আগষ্ট- ২০০১।

১২. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১ জুলাই, ২০০৪।

১৩. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, সাময়িকী, বিকাশমান গণতন্ত্র এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ১৪ সেপ্টেম্বর- ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

২.১ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। বর্তমানে দেশটির মাথাপিছু ও জিডিপি এবং জাতীয় আয় যথাক্রমে ৪২১ ও ৪৪৪ মার্কিন ডলার।[১] স্বাক্ষরতার হার ৬২.৬৬%[২] ইউ এন ডি পি র মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৮তম। এদেশের শতকরা ৮০ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং ৪০% লোক, চরম দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এই যখন দেশের অবস্থা সেখানে আপামর জনগণের কাছে দু'বেলা অন্ন সংগ্রহই প্রধান কর্ম। দিন দিন সার্বিক বেকারত্বের সাথে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলছে। অপরদিকে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ঢুকে পড়েছে দূর্নীতি। পরপর তিনবার বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতি গ্রস্ত দেশের স্বীকৃতিই তার প্রমান। এ রকম একটি অবস্থায় এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে চলছে। তবে প্রতিবারই হোঁচট খাচ্ছে। সুদীর্ঘ কালের ইংরেজ ঔপনিবেশিক শোষণ, তার পরবর্তী পাকিস্তান আমলে বিক্ষিপ্তভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং বার বার সামরিক সরকারের হস্তক্ষেপ, একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরী এর নির্বাচনের ফলাফলকে সামরিক সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এবং স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রমনা এদেশবাসীকে শোষনের চেষ্টার ফলে অবশ্যম্ভাবী মুক্তিযুদ্ধ এবং যার মাধ্যমে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে জনগণ মনে করেছিল তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে, সরকারের এবং দেশের কাংখিত উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু তা না হয়ে আবারো জনগণকে পাশ কাটিয়ে একদলীয় শাসন কিংবা সামরিক শাসনে নিমজ্জিত করে রাখে জনগণের গণতান্ত্রিক আকাংখাকে যার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ৯০' সালে। স্বৈরশাসনের পতনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু এখনো এ ব্যবস্থা একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। তারপরেও জনগণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মধ্যে আশার আলো দেখতে পায়। এভাবেই এগিয়ে চলছে এদেশের রাজনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণাটি গভীরভাবে অনুধাবনে কয়েকটি তাত্ত্বিক দিক বিবেচনা অপরিহার্য। নিম্নে এই তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো-

২.২ শাসন ব্যবস্থা

আধুনিক বিশ্বের সব রাষ্ট্রই তা গণতান্ত্রিক হোক বা না হোক কোন না কোন সরকার ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন, কোন রাষ্ট্র জন প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয় আবার কোন রাষ্ট্র বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব, বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে। সুতরাং কোন রাষ্ট্র যে পদ্ধতিতে তার সরকার পরিচালনা করে তাকে শাসন ব্যবস্থা বলে। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই হয় মন্ত্রিপরিষদ না হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। তবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা সামরিকতন্ত্র যে এখনও নেই তা নয়। তবে এ সকল শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ, অভিজ্ঞ, সৎ ও স্থায়ী কর্মকর্তা কর্মচারীর। সেজন্য প্রতিটি রাষ্ট্রেই গড়ে উঠেছে শক্তিশালী প্রশাসনিক সংগঠন। এ সকল প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের নিয়মসিদ্ধ পরিচালনাকে বলা হয় প্রশাসন। অর্থ্যাৎ সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে একদল ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির কার্যাবলীকে প্রশাসন বলা হয়। অন্যকথায় প্রশাসন হল সহযোগীতা ভিত্তিক আচরণ বা রীতিনীতি।

সাইমন, স্মীথবার্গ ও থম্পসন বলেছেন, ব্যাপকতর অর্থে প্রশাসনের সংজ্ঞা হল অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য সহযোগিতাকারী জনসমষ্টির কর্মতৎপরতা।[৩]

জেমস ডি মূনের মতে, "The form of every human association for the attainment of a common purpose" (অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে গঠিত একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান।)

অতএব, যে কোন রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ সরকার

একটি ভূখন্ডকে রাষ্ট্র বলে অভিহিত করতে হলে যে চারটি অপরিহার্য উপাদানের প্রয়োজন হয় সরকার তার মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান। এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক স্বরূপ। সরকার রাষ্ট্রের শাসনকার্য-সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক সংগঠন। অর্থ্যাৎ জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখন্ড যে রাজনৈতিক সংগঠনের সংস্পর্শে রাষ্ট্রে পরিনত হয় সে রাজনৈতিক সংগঠনই হলো সরকার। সরকার জনগণ ও রাষ্ট্রের মুখপাত্র। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারকারী ব্যক্তি সম্প্রদায়ই সরকার। সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলতে শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সরকার হলো রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত সকল নাগরিক।

সরকার সম্পর্কে এরিস্টটল বলেন, "সরকার হচ্ছে সে সকল নাগরিক যারা অন্যান্য জনগণের পক্ষ হতে রাষ্ট্র শাসন করার জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তিনি আরও বলেন, The Govt. is every where the sovereign in the state and the constitution is infact the government.[৪]

অধ্যাপক গার্ণারের মতে, সরকার ছাড়া জনগণ অসংলগ্ন, অসংগঠিত এবং অরাজক, যার কোন সম্মিলিত শক্তি নেই। গিডিংস বলেন, রাষ্ট্র হলো উদ্দেশ্যমূলক, সামাজিক সংঘ এবং সরকার হলো বহিঃদিগন্ত অভিব্যক্তি।[৫]

→

সরকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন গণতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক, রাষ্ট্রপতি শাসিত বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত।

২.৪ বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশেও একটি সরকার ব্যবস্থা এবং প্রশাসন রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বিদ্যমান রয়েছে। অর্থ্যাৎ যেখানে মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বা জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল তখন বাংলাদেশের জন্য সংসদীয় বা

Dhaka University Institutional Repository

পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে এক দলীয় রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা হয় ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চলে। ১৯৭৫ সনে ১৫ আগস্টে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ১৯৭৯ সন পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল থাকে। ১৯৭৯ সালে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বহু দলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক শাসন জারী করা হয়। পরবর্তিতে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ সালে সাধারণ নির্বাচন দিয়ে তাঁর শাসন কালকে বৈধতা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯৯০ সনের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের ফলে জেনারেল এরশাদ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুণরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এভাবে দীর্ঘ ১৬ বৎসরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় বারের মত সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হবার প্রাক্কালে জনগণের এই প্রত্যাশা ছিল যে, এতদিনে বাংলাদেশে সকল অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতার অবসান ঘটে গণতন্ত্রায়নের পথ, নিষ্কন্টক হল। ফিরে এলো স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা। সমূহ উন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর হল বাংলাদেশের জনগণ। কিন্তু ও স্বস্তিময় পরিস্থিতির প্রত্যাশা অচিরেই বিলীন হয়ে গেল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে হিংসা, অসহিষ্ণুতা, পরশ্রিকাতরতা, ক্ষমতার দ্বন্দ মজ্জাগত হওয়ার কারণে এখানে গণতন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। ১৯৯১ থেকে আজ পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে যে অবস্থা ও সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা বিচার করলে বাংলাদেশকে কোন প্রাগৈতিহাসিক বর্বর যুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না।[৬] কেননা সমসাময়িক সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর পারস্পরিক আচার আচরণ ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এখানে গণতন্ত্র, নিয়মতান্ত্রিকতা, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীলতা বলতে কিছুই নেই। অথচ গনতন্ত্রের শেষ কথা হল সহনশীলতা, সমঝোতা, নিয়মতান্ত্রিকতা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে ভলটেয়ারের একটি বিখ্যাত উক্তির উদ্ধৃতির দেয়া যায়, আমি তোমার মতের সাথে একমত নাও হতে পারি, তবুও তোমার মত প্রকাশের জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত দিতে পারি।[৭] কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা বংলাদেশে বিরাজমান।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ নির্বাচন

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রসারের সাথে সাথে জনগণের মধ্যে এ বদ্ধমূল ধারনার জন্ম হয় যে, সরকারের কার্যাবলী অবশ্যই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষন করবে। এ ধারণা ও বিশ্বাস থেকেই জন্ম নেয় নির্বাচন, নির্বাচকমন্ডলী ও প্রতিনিধি বাছাইয়ের। বর্তমানে নির্বাচকমন্ডলীর যে প্রকৃতি ও কার্যবলীর সাথে আমরা পরিচিত প্রাচীনকালে তা ছিলনা। সে সময় রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা দু'ই ছিল কম। তাছাড়া এ স্বল্প জনসংখ্যার মধ্যে সকলের নাগরিকত্ব ছিল না। তাই সেখানে প্রত্যক্ষ গনতন্ত্র ছিল। অর্থ্যাৎ সকলে মিলে আইন প্রনয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা করত।

কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে যেমনি বিশাল জনসংখ্যাও তেমনি বিপুল। তাই এ ধরনের বিশাল আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত জাতীয় রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গনতন্ত্রের মাধ্যমে দেশ শাসন সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে জনপ্রতিনিধির। আর তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এ জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের অর্থ্যাৎ নির্বাচনের।

সুতরাং নির্বাচন হল জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি বাছাইয়ের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি। অর্থ্যাৎ কোন রাষ্ট্রের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য কার্যকর পদ্ধতিকে নির্বাচন বলে।) অ্যালেন বলের মতে নির্বাচন হল, Election are the means by which the people choose and exercise some degree of control over their representatives.[৮] (নির্বাচন হল প্রতিনিধি বাছাই এবং সে প্রতিনিধির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রন আরোপের এক উপায় বিশেষ) নির্বাচনী রাজনীতিতে জন অংশগ্রহণের একটি পথ বা পন্থা। অনেক দেশেই ভোটপ্রদানের হার ও মাত্রা দেখে বিবেচনা করা হয় রাজনীতিতে জনসাধারণের উৎসাহ কতটুকু বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিষয়ে, সরকারের বিষয়ে জনপ্রতিনিধির বিষয়ে সে কতটা সচেতন বা সজাগ। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নির্বাচন ও গণ অংশগ্রহণের প্রশ্নে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তার নেতৃত্ব যতটা সচেতন কোন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ততটা সচেতন নয়। আর তাই এটা লক্ষ্য রেখেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং এ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ নির্বাচন ও গনতন্ত্র

নির্বাচন ও গনতন্ত্র পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত । এ যেন মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তাই আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব অসীম । সুদীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে জনগন এ গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছে। লাভ করেছে নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার । গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় বৈজয়ন্তী জনগনের প্রতিনিধিদের দাবি এবং স্বীকৃতিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[১] বর্তমানে গণতন্ত্র বলতে প্রতিনিধিত্বমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্রকেই বুঝায়। গণতন্ত্রের এ অগ্রগতি প্রতিনিধিত্বের ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি করেছে তেমনি জনগণকে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল আধারে পরিণত করেছে।

একটি সময় ছিল যখন নাগরিকগণ একত্রিত হয়ে দেশ শাসনের বিধি-বিধান নির্ধারন করত এবং সেভাবে দেশ পরিচালিত হতো। তখন অবশ্য রাষ্ট্রগুলো আয়তনে ছোট ছিল। নাগরিকের সংখ্যাও ছিল কম। কিন্তু আস্তে আস্তে রাষ্ট্রের আয়তন বেড়ে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় সে হারে। এ সময় জন্ম নেয় রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রের। অল্প পরেই পূর্বেকার রাজতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র শীতের হিমেল হাওয়ায় জীর্ণ পল্লবের ন্যায় ঝড়ে পড়ে, হয় নিলয়প্রাপ্ত। আর সে সুযোগে পিছনের দরজা দিয়ে আধুনিক একনায়কতন্ত্র বীর পুরুষের ন্যায় প্রবেশ করে মঞ্চ দখল করে নেয়। ফলে হারাতে হয় নাগরিক অধিকার। মানুষ তাদের এ জন্মগত অধিকার হারিয়ে পরিনত হয় কৃতদাসে। মানুষের এ কৃতদাসের শৃঙ্খল ভাঙতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। করতে হয় বহু ত্যাগ স্বীকার। এমনি এক পর্যায়ে ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লব রাজতন্ত্রের সমাধির উপর পার্লামেন্টের সৌধ নির্মান করে। জন লক (Gohn Locke) তার বিখ্যাত গ্রন্থ Two Treatises of Government.

বর্তমানের বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলো প্রায় অধিকাংশ লোকেরই নাগরিকত্ব অর্থ্যাৎ ভোটাধিকার রয়েছে। তাই এখন প্রতিনিধিত্বমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র বিদ্যমান। এ ধরনের গণতন্ত্রের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা। আর সে কারনেই প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে আইনসভার প্রতিনিধি ও শাসন কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের পক্ষে আইন প্রনয়ন করে ও শাসনকার্য পরিচালনা করে। ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন পরিনত হয়েছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে। অ্যালান বল বলেন, নির্বাচন হল প্রতিনিধি পছন্দ ও প্রতিনিধির উপর কিছুমাত্রায় জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার এক উপায়।[১০] তবে নির্বাচন সামান্য মাত্রায় হলেও রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের পক্ষ প্রস্তুত করে। সেজন্য অ্যালান বল স্বীকার করেছেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একধরনের রাজনৈতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে, সিদ্ধান্তকারীকে নির্বাচকমন্ডলীর দাবি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। আর এ ভাবেই রাজনৈতিক বিষয়ে নির্বাচকমন্ডলী শিক্ষিত হয়ে ওঠে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক যোগাযোগের এক ব্যাপক সুযোগের সৃষ্টি হয়। তাই অধ্যাপক বলের অভিমত, যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ নাগরিকের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের একমাত্র উপায় হল এ নির্বাচন[১১]। এভাবে ভোটারদের মধ্যে এক পারস্পরিক চেতনার সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে বিবেচিত। শাসক ও শাসন পদ্ধতির বৈধকরণের ব্যাপারে নির্বাচন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই এ কথা সত্য। কারন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ শাসক ও শাসন ব্যবস্থাতো প্রতিষ্ঠিত হয়ই, এমনকি বৈপ্লবিক সরকার বা সামরিক এক নায়কনতন্ত্রও নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের শাসনের বৈধতা প্রমানে উদ্যোগী হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমেই বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশিত হয়, আবার নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির তারতম্য যাচাই করা হয় তাই অধ্যাপক অ্যালান বল বলেন, "Election are primarily a means of legitimising the right of the rulers to govern."[12]

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় তাই আজ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়, জনগনই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এমনকি জনগণের আস্থা অনাস্থার উপর সরকারের উত্থান পতন নির্ভর করে। জনগণের এ সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই কার্যকর হয়ে থাকে। এ জন্য নির্বাচকমন্ডলীর জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে। তাইতো প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী W.F. Willoughby নির্বাচকমন্ডলীকে সরকারের ভিন্ন একটি বিভাগ বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের বিকল্প কিছু নেই।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ নিরপেক্ষ নির্বাচন

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে নির্বাচন। আর নির্বাচনই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম যেখানে জনমতের প্রতিফলন ও সন্নিবেশ আমরা দেখতে পাই। নির্বাচন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে মনোনয়ন, বাছাই, পছন্দ বা নিজের শ্রেষ্ঠ মতকে প্রতিষ্ঠিত করা যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্টপূর্বের বহু রাষ্ট্রনায়ক দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের লেখনীতে ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে। কিন্তু বর্তমান প্রতিযোগিতা মূলক বিশ্বব্যবস্থা তথা Unipolar বিশ্বে "নির্বাচন" এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবর্তিত হচ্ছে যে- নির্বাচন শব্দটির পূর্বে নতুন একটি লুকায়িত প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই, যা "নিরপেক্ষ" নামে পরিচিতি। জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রযুক্তির প্রসার উন্নত সামরিক জোট, প্রশাসন যন্ত্র, ক্ষমতার দাপট, মিডিয়া, ইত্যাদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে "নিরপেক্ষতা" কে চ্যালেঞ্জের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আমার প্রশ্ন হলো কেন চ্যালেঞ্জ? তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র শিক্ষার অনুপস্থিতিই এর অন্যতম কারণ। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাকে আমরা গণতন্ত্রের চারণভূমি হিসেবে বর্তমানে এবং পূর্বে বিভিন্ন অর্থে নতুন নতুন প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত করি ও G.A. Almond এর নতুন নতুন শব্দের ব্যবহারের মত নতুন শব্দ সংযোজন ও মডেলের কথা চিন্তা করি। তখন কি মনে পড়ে নিক্সনের ওয়াটার গেট কেলেংকারীর কথা? যদিও ওয়াটারগেট কেলেংকারী অনেক পুরানো তারপরেও মার্কিন ঐতিহ্য ও ইতিহাসে নিরপেক্ষ নির্বাচন কে কলংকিত করে তুলেছিল। গত নির্বাচনেও ক্ষমতার দাপট ও পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ উঠেছিল; তবু সহনশীলতা প্রদর্শন করে মেনে নেয় মার্কিন জনগন ও রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু কেন প্রশ্ন উঠবে? এর মূল কারণ হলো যে কোন ভাবেই হোক ক্ষমতায় আসা যা গনতন্ত্রের সম্পুর্ণ নীতি বিরোধী।

দক্ষিন এশিয়ার রাজনীতি ও নির্বাচন পর্যবেক্ষন করলে একটা বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ শাসনামলে বৃটিশরা যখন মুসলমানদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে তখন মুসলমানদের মনে একটা বিষয় জাগ্রত হয় "নিজের উপরে আস্থা রাখ"। অর্থ্যাৎ সে আস্থার ফলেই (অনাস্থার উপরই) বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু দেশ বিভাগের পর একটা বিষয় ব্যাপক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শাসক ও

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রয়েছে। সে ব্যবধান হলো আস্থা ও ঐক্যের যা সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিপন্থী। যদিও ভারতের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান অনেকটা কম লক্ষনীয়। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে যেখানে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সাধারণত প্রশ্ন উঠেনা; যেখানে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনের পর দেখা যায় বিরোধী দল সরকার গঠনে আমন্ত্রিত হয়। কিন্তু কেন ভারতের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেনা? গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র যদিও শিক্ষা, তারপরেও যে বিষয়টি শিক্ষার পাশাপাশি গণতন্ত্রকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেয় তা হলো জনগণের মনোভাব, দেশপ্রেম, ঐক্য ও একতা। যার ফলশ্রুতিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ৫৭ বছরেও গণতন্ত্র হুমকীর সম্মুখীন হয়নি কিংবা সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেনি।

→ গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলে। কিন্তু কেন বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন?

"নিরপেক্ষ নির্বাচন বলতে পক্ষপাতহীন, শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বুঝায়। অর্থ্যাৎ নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কোনরূপ পক্ষ সমর্থন না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে একটি নির্বাচন পরিচালনা করবে। এখানে প্রশাসনযন্ত্র থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনার সাথে জড়িত সকলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিরোধী দলসহ সমগ্র নির্বাচকমন্ডলী যেন ভয়ভীতিহীন ভাবে তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট প্রদান করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কালো টাকা বা পেশী শক্তি যেন কোনভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারে। "আমার ভোট আমি দিব, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিব"- এ শ্লোগানটিতে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাড় করানোর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থ্যাৎ যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে এবং জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন প্রনয়ন করবে, নিরপেক্ষতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল পরবর্তী নির্বাচনে তাদের নির্বাচন করা হবে।"

নির্বাচন রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের একটি পথ বা পন্থা[১৩]। একটি দেশে ভোট দানের হার মাত্রা দেখে বুঝা যায় রাজনীতিতে সে দেশের জনসাধারণের উৎসাহ কতটুকু বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিষয়ে, সরকারের বিষয়ে, জনপ্রতিনিধিদের বিষয়ে জনগণ কতটা সচেতন বা আগ্রহী। বিগত দিনে বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, কেন বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার? সত্তর দশকের শেষ থেকে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত নির্বাচনগুলো এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিবে। কারণ সে সময় ভোট বা নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের কোন আগ্রহ ছিল না বললেই চলে। খুব কম সংখ্যক ভোটার ভোট দিতে পারত বিধায় কেউ ভোট কেন্দ্রে যেতে আগ্রহ দেখাতনা। সে সময় পত্র পত্রিকায় এ রকম খবরও বেরিয়েছে যে, মৃত লোকেরও ভোট দেয়া হয়েছে। এমনকি একটি কেন্দ্রের মোট ভোট সংখ্যার চেয়েও বেশি ভোট কাষ্ট হয়ে গেছে। কালো টাকা ও পেশী শক্তির প্রভাব ছিল একচেটিয়া। সরকারি ক্ষমতায় থাকা দলের প্রভাব ছিল সীমাহীন। তারা সরকারি অর্থ, যানবাহন বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করত। এ ক্ষেত্রে ১৯৯৪ সালের মাগুরা-২ আসনের নির্বাচনের কথা স্মরণ করা যায়। সে নির্বাচনের প্রচারাভিযানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিগণ ও বি.এন.পি. নেতৃবৃন্দ সরকারি অর্থ, যানবাহন ও সুযোগ-সুবিধা বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করেন।[১৪]

১৯৯৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি মিরপুর-১৪ আসনের নির্বাচনেও ব্যাপক কারচুপি ও সন্ত্রাসী-কার্যকলাপ চলে। আওয়ামীলীগ তখন সরকারের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যু এবং কারচুপির অভিযোগ আনে।[১৫]

১৯৯৬ সালের ১৫ফেব্রুয়ারি ভোটারবিহীন ভাবে জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে দেশব্যাপী সহিসংভার কমপক্ষে ১৫ ব্যক্তি নিহত হয়। বিদেশী সাংবাদিকদের মতে, এ নির্বাচনে ৫% থেকে ৬% এর বেশি ভোটার উপস্থিত হয়নি।[১৬] অথচ ভোট কাষ্টিং এর পরিমান দেখানো হয়েছে অনেক বেশি। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরও আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সম্প্রতি ২০০৪ সালের ১ জুলাই এর নির্বাচনেও কারচুপির সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে সরকারি দলের প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। কারচুপি প্রসঙ্গে দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক বলেন, ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচন ছিল নির্বাচনের নামে প্রহসন।[১৭] সাংবাদিক আতাউস সামাদ স্বীকার করেছেন যে, নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপি হয়েছে এবং মন্তব্য করেছেন, ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে পরাজিত হয়েছে সুষ্ঠু নির্বাচন এবং বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক ধারা[১৮]। ২ জুলাই সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ) ও জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষন পরিষদ (জানিপপ) বলেছে, ঢাকা-১০ উপনির্বাচনে ব্যাপক ভুয়া ভোট ও জালিয়াতি হয়েছে। অতিমাত্রায় জাল ভোটের অনেক প্রমান থাকায় এ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলা যায় না[১৯]। নির্বাচন পর্যবেক্ষনে নিযুক্ত ফেমা ও ব্রতীর বক্তব্য হলো ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচন ছিল জাল ভোটের মহোৎসব এবং পুরোপুরি অগ্রহনযোগ্য নির্বাচন[২০] এ

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে জাল ভোট, জাল ভোট দিতে অন্যস্থান থেকে ভোটার আনা বিরোধী দলের প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, প্রকৃত ভোটারদের ভোট দিতে না পারা, প্রশাসনের পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ প্রভৃতি বাংলাদেশের রাজনীতিকে কলুষিত করেছে। ফলে দাবী উঠেছে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের।

তাই আজ বাংলাদেশে সাংবিধানিক ভাবে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের নির্বাচন গুলোতে জনগনের নির্বাচন সম্পর্কে আস্থা অনেক গুন বেড়ে গেছে। আজ ভোট কাস্টের হার ৪৫/৫০ এ দাড়িয়েছে, জনগণের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়েছে। যদিও ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু কাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবুও দেখা যায় দলীয় সরকারের আমলের নির্বাচনের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমালের নির্বাচন অনেকগুন নিরপেক্ষ। আর তা দেখে দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ এ পদ্ধতির কথা চিন্তা করছে। এমনকি খোদ গণতন্ত্রের চারনভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এ নিয়ে ভাবছে।

২.৮ নির্বাচনের ঐতিহাসিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

সুদীর্ঘকাল ব্যাপী মরণপন সংগ্রামের পর মানবজাতির বিরাট অংশ আজ নিজেদের প্রতিনিধির মাধ্যমে দেশ পরিচালনার অধিকার অর্জন করেছে। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় বৈজয়ন্তী জনগণের প্রতিনিধিত্বের দাবি ও স্বীকৃতিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই আজ গণতন্ত্র বলতে প্রতিনিধিত্বমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্রকেই বোঝায়। গণতন্ত্রের এ অগ্রযাত্রা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি করেছে তেমনি জনগণকে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিনত করেছে।

সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের লগ্নে দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে প্রয়োজন হল প্রতিনিধির আর তা বাছাইয়ের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা। প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমে ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র (City-State) ছিল। সে সময় সমাজের অভিজাত শ্রেণীই প্রত্যক্ষ ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করত। ফলে বিশেষ প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র জাতীয় রাষ্ট্র। এর আয়তন যেমনি বিশাল লোকসংখ্যাও তেমনি বিপুল। এখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কোনক্রমে সম্ভব নয়। তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষ ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা না করে প্রতিনিধির মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

শাসন করে। এ জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই জনগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাই পরোক্ষ গণতন্ত্র এবং নির্বাচন ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কবে ও কোথায় প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা সর্বপ্রথম চালু হয় তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে প্রচলিত ধারনা হল এই যে, প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে মধ্যযুগে[২১]। কিন্তু সে সময়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে গণসম্মত বলা যায় না। কারন তখন জনগণের সকলের ভোটাধিকার ছিল না। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক যেমন ধনিক/বনিক শ্রেণী ভূস্বামী, অভিজাত সম্প্রদায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারত। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট, জার্মানীর ডায়েট, স্পেনের কারটেস, ফ্রান্সের এস্টেটস জেনারেল প্রভৃতি তখনকার এ সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় সীমাবদ্ধ প্রতিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

অতপর মানবজাতির ইতিহাসে জাতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এ সময় রাজতন্ত্র অত্যাধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে ফলে আইনসভার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়। আর তাই কর্তৃত্বের প্রশ্নে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র বনাম পার্লামেন্টের সুদীর্ঘ সংগ্রাম শুরু হয়। এ সংগ্রামের এক পর্যায়ে ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের পর পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর পরও পার্লামেন্ট সত্যিকার গণতান্ত্রিক প্রকৃতি সম্পন্ন হতে পারিনি। ১৮৩২ সালের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেন্টে জন প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থা ছিল না।[২২] মাত্র তখনই মধ্যযুগীয় প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সামান্য কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এরপরও বৃটিশ পার্লামেন্ট গণপার্লামেন্টের রূপ ধারণ করেনি। ১৮৩২ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত কতগুলো সংস্কার মূলক আইন প্রনীত হওয়ার ফলে বর্তমান বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্স সভায় ১৮ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত বৃটিশ নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

আজ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রেও প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বের এ অধিকার সহজে মেনে নেয়া হয়নি। এজন্য সত বছরের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও হাজার হাজার মানুষের রক্তের বিনিময়ে আইনসভায় জনপ্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই অধিকার বঞ্চিত মানুষের এ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তঝরা সংগ্রামের কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসে সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৯ বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচক মন্ডলীর ন্যায় নির্বাচন পদ্ধতিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এ নির্বাচন পদ্ধতির উপর গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। আর বর্তমান পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতিগত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে যথা- ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন খ) পরোক্ষ নির্বাচন।

ক) **প্রত্যক্ষ নির্বাচন ঃ** যখন নির্বাচক বা ভোটদাতা গণ প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে। এ পদ্ধতি বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কারন এ পদ্ধতিতে সাধারণ ভোটার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাঝে একটি সু সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এটি একটি অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি। ব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশের আইন পরিষদের সদস্যগণ এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

খ) **পরোক্ষ নির্বাচন ঃ** যে নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ সরাসরি ভোট না দিয়ে একটি মাধ্যমিক সংস্থা নির্বাচন করে এবং সেই মাধ্যমিক সংস্থার প্রতিনিধিগণই চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় সাধারণ ভোটদাতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সরাসরি কোন সম্পর্কে থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এ ভাবে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যগণ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন।

সুতরাং বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় নির্বাচন পদ্ধতিই কার্যকর রয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতি ও সংরক্ষিত মহিলা আসন ছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় সকল সংস্থায়ই প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত। বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। সংবিধানের ১২২(১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।[২৩] বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট সমূহ নিম্নরূপ-

১) **গণতান্ত্রিক ঃ** বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।[২৪]

২) **সর্বজনীন ভোটাধিকার ঃ** বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত রয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের সকল সুস্থ নাগরিক ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়।

৩) **ভোটার তালিকা ঃ** নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিটি এলাকার জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এ তালিকা ব্যতীত অন্যকোন তালিকা কার্যকর হয় না। প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে "এক ব্যক্তি, এক ভোট" নীতি প্রচলিত রয়েছে। সংবিধানের ১২১ ধারায় বলা হয়েছে, সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকায় একটি করিয়া ভোটার তালিকা থাকিবে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী পুরুষের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রনয়ন করা যাইবে না।[২৫]

৪) **গোপন ভোট পদ্ধতি ঃ** বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনে গোপন ভোটদান পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে। নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্রের বুথে বেস্টনি দিয়ে ভোটারদের ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়।

৫) **সহজ ভোট পদ্ধতি ঃ** বাংলাদেশের ভোট পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল। প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পত্রের যে কোন এক স্থানে ভোটারগন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীল ব্যবহার করেন।

৬) **একক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী এলাকা ঃ** জনসংখ্যা ও আয়তনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র বাংলাদেশকে একক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

৭) **নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান ঃ** বাংলাদেশে নির্দিষ্ট সময়ে ও নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে কোন কারণে যদি কোন আসন শূন্য হয়, তবে তা নির্ধারিত সময়ে উপনির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। সংবিধানের ১২৩ ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। উপধারা ১(৩), মেয়াদ অবসানের কারনে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উপধারা (৪) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূণ্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।[২৬]

৮) **নির্বাচন কমিশন ঃ** বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র নির্বাচন কমিশন রয়েছে। সংবিধানের ১১৮(১) ধারায় উল্লেখ আছে। "প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে"।[২৭]

২.১০ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণা

একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সাধারণত যে কোন প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় সরকারের স্থলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এরূপ তত্ত্বধায়ক সরকার গঠন করা হয়। এ স্বল্পস্থায়ী সরকার দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে এবং নীতি নির্ধারনী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে, যাতে এই সরকারের কার্যাবলী নির্বাচনের ফলাফলে কোন প্রভাব সৃষ্টি না করে। এ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। সংসদীয় শাসন কাঠামোয় মন্ত্রিসভা বিলোপের পর একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার এই অনুশীলন উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেই লক্ষ্য করা যায়।[২৮]

২.১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দার্শনিক ভিত্তি

যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে একটি দার্শনিক ভিত্তি কিংবা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্যনীয়; ঠিক তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অর্থাৎ সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে সরকার নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তারও একটি দার্শনিক ভিত্তি ব্যাপক ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। যদিও আমরা গণতন্ত্রের যাত্রার ইতিহাস গ্রীস থেকে শুরু করি এবং খ্রীস্টপূর্ব অব্দের রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের চিন্তা ও লেখনীর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, সেই সময়েই নিরপেক্ষ শাসক কিংবা শাসন ব্যবস্থার সুস্পষ্ট কিছু দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে যখন ক্ষমতার দাপট নির্বাচনে কারচুপির বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে

Dhaka University Institutional Repository

শাসকগোষ্ঠী কিংবা রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রকে আবারো চ্যালেঞ্জের দিকে ঠেলে দেয় তখন দার্শনিক ভিত্তি আমাদেরকে নিরপেক্ষতার দিকে ধাবিত করে।

মূল কথা দার্শনিক ভিত্তি হলো অনুসন্ধিৎসু ও বিচার বিবেচনার দৃষ্টি ভঙ্গি। অর্থ্যাৎ ভাবাবেগের পরিবর্তে দার্শনিক সুলভ সুষ্ঠু চিন্তা ও বিচার বিবেচনার মাধ্যমে কোন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই দার্শনিক ভিত্তি গড়ে উঠে[২৯] । প্রচলিত যে কোন ধারণা বা বিশ্বাসকে নির্বিবাদে গ্রহণ না করে দার্শনিক মুক্ত স্বাধীন চিন্তার আলোকে সেই ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তি ও যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে অনুধাবনের চেষ্টা করেন।[৩০] কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দার্শনিক ভিত্তি আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্টপূর্ব অব্দের গ্রীস দার্শনিক Plato তাঁর The Republic গ্রন্থে শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- দার্শনিকরা যতক্ষণ না শাসক হবে ততক্ষণ রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি কারোরই মঙ্গল সম্ভব নয়। তিনি বলেন, দার্শনিকরা হলো যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী যা একজন শাসককে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কি করণীয় কিংবা কি উচিত না - তা তাৎক্ষনিক ভাবে নির্দেশ করার শক্তি যোগায়। কিন্তু আলোচ্য গবেষণার মূল শিরোনাম বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি বিশ্লেষণ যা নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য একজন নিরপেক্ষ শাসকের ইঙ্গিত বহন করে। কেননা বাংলাদেশের বিগত নির্বাচন অর্থাৎ ৯০'র পূর্ববর্তী নির্বাচনের ভয়াবহ কারচুপি, অনিয়ম এবং পরবর্তীতে দলীয় সরকারের অধীনে উপনির্বাচনে দলীয় প্রভাব ও কারচুপি নির্বাচনের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। আর এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক আলোচনা লেখা লেখি হয়েছে প্রচুর। এমনকি অকালে ঝড়ে গেছে অনেক সম্ভাবনাময় তরুন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদে পাস হয় নতুন দিগন্তের নবচেতনার পুরানো দার্শনিক ভিত্তির নব-সংযোজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নিরপেক্ষ সরকার বিল।

২.১২ গণতন্ত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

গণতন্ত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার আলোচ্য গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত একে অপরের পরিপূরক বহুল আলোচিত প্রত্যয় হলেও বিষয়টি নিয়ে বির্তকের শেষ নেই। গণতন্ত্র হলো এক বিকাশমান ধারা যা দেশ কাল ও চেতনার স্তরনিরপেক্ষও নয়। গণতন্ত্র কোনো পরিশুদ্ধ, নির্ভুল পরিপক্ক ও পরিনত রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয় যা চরম লক্ষ্যে পৌছে গেছে। গণতন্ত্র হচ্ছে পরীক্ষা ও নবনব অভিজ্ঞতার আলোকে ও সম্মিলিত স্বাধীনতার ক্রমাগত শুদ্ধতার রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া। গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার যৌথ প্রকাশ। এই স্বাধীনতার সবেচেয় বড় দিক হচ্ছে মানুষের মনের

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তি জীবনের সাফল্য ও শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করার স্বাধীনতা। সত্যিকার গণতন্ত্রে চাপিয়ে দেয়া আদর্শ, দলগত স্বার্থ বা ব্যক্তি মানুষের আধিপত্য বা কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পনের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু গণতন্ত্রের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবে এটি গণতন্ত্রের অন্যতম একটি শর্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে দুটো শর্ত তাহলো সরকার জনগণের ও জনগণের জন্য। এই যে, জনগন, যাদের জন্য সরকার ও যাদের সরকার তারা শুধু ভোট দাতা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নয়। এদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও ব্যক্তি মানুষ, এমনকি যারা ভোট দেয়নি তারাও অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ গণতন্ত্র হলো এক জটিল প্রক্রিয়া; যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। আর গণতন্ত্রের মূল বিষয় প্রতিশব্দ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই যেহেতু আবর্তিত তাই নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালনার জন্য প্রণীত হয়েছে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার । এখন প্রশ্ন হলো গণতন্ত্র এখন কোন পথে?

সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবলিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত রীট পিটিশনের শুনানিতে আবদুর রাজ্জাক বলেন, ত্রয়োদশ সংশোধনী দেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা ও নিরাপদ করেছে। তিনি এ মামলায় ইন্টারভেনর হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, আলোচ্য সংশোধনী গণতন্ত্রের সহায়তাকারী হিসেবে প্রণীত হয়েছে। তিনি ভারত ও ইংল্যান্ডের উচ্চ আদালতসমূহে প্রদত্ত রায়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেন, প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদ্ধতি অপরিচিত নয়। তিনি আরো বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া ও পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে সকল অন্ত র্বর্তীকালীন সরকারই প্রকৃত পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে পরিগণিত হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি স্যার আইভর জেনিংস-এর "দি কেবিনেট গভর্নমেন্ট" নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে, ১৯৪৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর স্যার উইনষ্টন চার্চিলের সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাক ভারত ও পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানের বিধান উল্লেখ করে বলেন, এই দুই দেশে সংসদ সদস্য না হয়েও কোন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে হয়।[৩১]

সুতরাং বলতে পারি যে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্যই এই আইন। এতে জনগণের মনমানসিকতা, রাজনৈতিক দল ও সরকারের ভূমিকাই মুখ্য।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৩ তিন জোটের রূপরেখা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা

'৯০-এ স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিন জোটের যে ঐতিহাসিক রূপরেখা প্রণীত হয়েছিল তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ। পরে এই জোটভূক্ত যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়েছে তারা এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করেনি বা মনোযোগ দেয়নি। ভবিষ্যতে কি কেউ এর বাস্তবায়ন করবে? এ প্রশ্ন থেকেই যায়। কী ছিল সেই রূপ রেখায়? ১) অবিলম্বে এরশাদ ও তার সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের ৫১ (ক) ৩ দফা, ৫৫ ক (১) দফার বিধান অনুযায়ী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনরত জোট ও দলসমূহের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির (রাষ্ট্রপতি) নিকট প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। (২) এভাবে নিযুক্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করে তিন মাসের মধ্যে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং নির্বাচনের পর নির্বাচিত জাতীয় সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। (৩) এই অন্ত র্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকাররের অধীনে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় সেজন্য (ক) প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ। (খ) সকলের আস্থাভাজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন। (গ) নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণ। (ঘ) নির্বাচনকে যে কোন প্রকার সরকারি হস্তক্ষেপ অথবা পক্ষপাতমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা। (ঙ) ভোটারদের স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভোট প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ভোট কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং যে কোন বাধাকে কঠোর ভাবে দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। (চ) নির্বাচনী এলাকার ব্যালটের হিসাব ও বন্টন তদারকির জন্য প্রার্থীদের নির্বাচনী এজেন্টদের সুযোগ, গণনা শেষে কেন্দ্রেই চূড়ান্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করে ফলাফলের সত্যায়িত কপি প্রার্থীদের এজেন্টদের নিকট প্রদান করা। (ছ) গণমাধ্যমের নিরপেক্ষ ব্যবহার, ভোট-কারচুপি প্রতিরোধ, কার্যকর নিবৃত্তিমূলক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। (জ) নির্বাচনের নিরপেক্ষতা পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষকদের সুযোগ প্রদান। (৪) দেশে স্থায়ীভাবে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা, সাংবিধানিক ধারা অনুসারে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার ধারা সুপ্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অব্যাহত অগ্রগতি নিশ্চিতকল্পে সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের মতানৈক্য সত্ত্বেও সাধারণ কতকগুলি বিষয়ে দৃঢ়ভাবে জনগণের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে যে,- (ক) জনগণের সার্বভৌমত্বে স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে। নিবর্তনমূলক কালা কানুন বাতিল করা হবে এবং এমন কোন আইন কখনও প্রণয়ন করা হবে না। (গ) সরকার পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংসদ হবে সংবিধানসম্মতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং সেই সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠদের মত ও অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার গণতান্ত্রিক রীতিরও বিকাশ ঘটানো হবে। জনগণের ব্যালটের ভোটের রায়ের মাধ্যমে সরকারের ওপর জনগণের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হবে। (ঘ) প্রশাসনে পরিপূর্ণ দল-নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। গণ-মাধ্যমসমূহকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা করা হবে। (ঙ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক রীতি ও সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরম সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার আলোকে রাজনৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ ও দৃঢ়মূল করা হবে।[৩২]

ছবি ঃ ২.১

প্রথম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঐতিহাসিক মূহুর্ত

এখানেই সূচনা। প্রথম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। তাঁর সঙ্গে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া, ১৯৯০-এর ৬ ডিসেম্বর।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৪ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (১৯৯০-১৯৯৬)

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের দেশে দুটি নির্বাচিত সরকারের মধ্যবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করা হয়েছে। বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত ১৯৯৬ সালের সরকার হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আর ঐতিহাসিকভাবে সেক্ষেত্রে প্রথম হওয়ার দাবিদার ১৯৯০ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের। এটি গঠিত হয় প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী। অবশ্য দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারই গঠিত হয় সুদীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পরিণতিতে। তবে লক্ষনীয় হচ্ছে, উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে শান্তিপূর্ণভাবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের নয় বছর স্থায়ী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলনের শেষভাগে সারা দেশ হরতালে, বিক্ষোভ প্রতিরোধে আর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। এরশাদ সরকারও এই আন্দোলন দমনের জন্য সবরকম চেষ্টা চালায় এবং অনিবার্য রক্তপাত ঘটতে থাকে দেশজুড়ে। এই অবস্থায় শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি ফর্মূলা নির্ধারণ করে আন্দোলনকারী ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট একটি রূপরেখা ঘোষণা করে। তিন জোটের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা নামের এই ঘোষণাটি দেওয়া হয় ১৯৯০ সালের ১৮ নভেম্বর।[৩৩]

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর পদত্যাগ ও তিন জোটের মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। রূপরেখা অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর এরশাদের উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন। তিন জোটের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই সরকারের অধীনে ৯১-এর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে বিএনপি ১৪৬ টি বেশি আসন পেয়ে জামায়াতের সমর্থনে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জন করে। মার্চে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে এবং রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৫মার্চ তার উপদেষ্টা পরিষদ বিলোপ ঘোষণা করেন।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের ইচ্ছায় তিনি যাতে রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে আবার প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যেতে পারেন সেজন্য সংসদে একাদশ সংশোধনী বিল আনা হয়। মধ্যে কিছু রাজনৈতিক টানাপোড়নের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের পদত্যাগের হুমকির প্রেক্ষাপটে ৬ আগষ্ট ১৯৯১ সংসদে সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগের আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করার জন্য সর্বসম্মতভাবে দ্বাদশ সংশোধনী বিলও পাস হয়।

১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকারের আমলে প্রথম উপনির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা-১১ আসনে। এতে সরকারি দলের সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন নির্বাচিত হন। ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে আওয়ামীলীগ ১৬ কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন দাবি করে। কারচুপির প্রতিবাদে তারা ৬ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালন করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামীলীগের অন্দোলনের সূচনা এখানেই। অবশ্য এর আগে পরে ৯৩-এর ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলীয় এক জনসভায় শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে সরকারকে বাধ্য করা হবে।

১ মার্চ ১৯৯৪ সংসদ থেকে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা ওয়াকআউট করলেন হেবরণ প্রশ্নে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদার কটাক্ষের জের ধরে। যারা ওয়াকআউট করেছিলেন তারাও জানতেন না এই ওয়াকআউট একটি সুদুরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চলেছে। মাগুরা-২ আসনের সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আসাদুজ্জামান মারা যাওয়াতে ওই সময়ে সেখানে চলছিলো উপনির্বাচনের কাজ। ২০ মার্চ সেখানে উপনির্বাচন হলো উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিদেশী বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষদের উপস্থিতিতেই ভোট জালিয়াতি, ভোট ডাকাতি করা হলো। সংখ্যালঘুরা যাতে ভোট না দেয়, সেজন্য ত্রাস ছড়ানো হলো। বিএনপির সন্ত্রাসীরা তাদের প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সব কাজ করতেই প্রস্তুত ছিল এদিন। মাগুরার এ আসনে আওয়ামী লীগই যে বিজয়ী হবে, তাতে কারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ওই দিনই বেসরকারিভাবে ঘোষণা করা হলো বিএনপি প্রার্থী কাজী সলিমুল হক কামাল বিজয়ী হয়েছেন। মাগুরার ঘটনা বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার একটি নৈতিক ভিত্তি তৈরি করে দিল আওয়ামী

Dhaka University Institutional Repository

লীগ নেতাকর্মীদের পায়ের নিচে। শুরু হলো লাগাতার সংসদ অধিবেশন বর্জন ও অন্যদিকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন।

এই সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় এই ঘোষণা দিয়ে আওয়ামীলীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে ১০ এপ্রিল সারা দেশে দিনভর হরতাল কর্মসূচী পালন করে। ২৭ জুন আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণার মাধ্যমে এই দাবিতে আন্দোলনের সূচনা করে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তারা ৭ জুলাই এর বগুড়া-৪ আসনের উপনির্বাচন বর্জন এবং হরতাল কর্মসূচি দেয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামীলীগের দীর্ঘ আড়াই বছরের নিরন্তর আন্দোলনের মধ্যে অজস্র হরতাল অবরোধ, ঘেরাও, মিছিল সমাবেশ পদযাত্রা, রেলযাত্রা অন্তর্ভূক্ত ছিল। এসব কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রেই সহিসংতা ও রক্তক্ষয়ী ছিল। সরকারি বাহিনীর গুলিতে এই আড়াই বছরে আওয়ামীলীগের অনেক নেতা-কর্মী হতাহত হন। কারাবরণ করেন অনেকে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে আওয়ামীলীগের সব সাংসদ একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন।

এরই মধ্যে ১০ সেপ্টেম্বর বিরোধী দলের ডাকে অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। তারপর ১১, ১২, ও ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায়, বিভাগীয় সদরে ও সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় শেখ হাসিনার সারা দেশে ট্রেনযাত্রা। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় কমনওয়েলথ মধ্যস্থতার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্ণর জেনারেল স্যার স্টিফেন নিনিয়ান মধ্যস্থতা করার জন্য মনোনীত হন।

বিরোধী দলের আন্দোলনের মধ্যে সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে অনমনীয় অবস্থান নেয়। ১৯৯৪ সালের ১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মানিক মিয়া এভিনিউতে এক জনসভায় ঘোষণা করেন বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অসাংবিধানিক। ৫ অক্টোবর ঝালকাঠিতে এক জনসভায় তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ও বিরোধী দলের এরকম বিপরীতমুখী অবস্থানের মধ্যে স্যার নিনিয়ান মধ্যস্থতার জন্য ঢাকায় আসেন। তবে তার মধ্যস্থতার উদ্যোগ সফল হয়নি। ৬ নভেম্বর বিরোধী দলের সদস্যরা একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ৮ নভেম্বর তারা দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে তাদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। এ পর্যায়ে ১২ ও ১৩ নভেম্বর পরপর দুদিন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ১১ ডিসেম্বর হাইকোর্ট বিরোধী দলের সংসদ বর্জন অবৈধ ঘোষণা করে তাদের সংসদে যোগদানের নির্দেশ দেন। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪ শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেত্রীর সরকারি বাসভবন (২৯ মিন্টো রোড) ত্যাগ করেন। ২৮ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ জাতীয়, পার্টি, এনডিপি ও জামায়াতের সংসদ সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করেন।[৩৫]

সংসদ থেকে বিরোধী দলের সদস্যদের এই পদত্যাগের পর নতুন বছরের শুরু থেকেই আন্দোলন আরো জোরালো হয়। ১৯৯৫ সালের ১৫ জানুয়ারি শেখ হাসিনা দেশ ব্যাপী পদযাত্রার উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে মাঝে হরতাল, মিছিল, সমাবেশ অব্যাহত থাকে। বছরের মাঝামাঝি এসে আন্দোলনে নতুন দাবি যুক্ত হয়। বিরোধী দল প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সাদেকের পদত্যাগ দাবি করে। ২ সেপ্টেম্বর বিরোধী দলের টানা ৩২ ঘন্টা হরতাল কর্মসূচির প্রথম দিন বাংলাদেশ সফরে আসেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী সচিব রবিন র‍্যাফেল।

এর মধ্যে মধ্যস্থতার উদ্দেশ্যে ঢাকা আসেন কমনওয়েলথ মহাসচিব চিফ এমেকো অনিয়াকু। তিনি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন।

অক্টোবরে এসে সরকারকে অস্থিতিশীল করতে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে বিরোধী দল। একের পর এক লাগাতার হরতালের কর্মসূচি দিতে থাকে তারা। ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হয় বিরোধী দল কর্তৃক তখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্থায়ী ৯৬ ঘন্টার টানা হরতাল। এই হরতালকালে পুলিশের গুলিতে দুজন নিহত হয়। এর ঠিক এক মাসের মাথায় ১৬ নভেম্বর থেকে বিরোধী দল শুরু করে টানা ৬ দিনের হরতাল কর্মসূচি। দুসপ্তাহ পর আবার ৭২ ঘন্টার হরতাল দেয় তারা।

হরতালে হরতালে আগের বছর শেষ হলে সরকার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয় ৯৬-এর শুরুতেই। ৪ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের বৈঠকে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পুরো জানুয়ারি মাসে একের পর এক হরতাল কর্মসূচি দেয়া হয়। এরই পাশাপাশি

Dhaka University Institutional Repository

সরকার বিরোধী দলকে ছাড়াই নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে থাকে পুরোদমে। তাতে বিরোধী দলগুলো আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিরোধের মুখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি সিলেট ও খুলনা সফর বাতিল করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রতিবাদে ফেনীতে হরতাল পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে বোমা ছোড়া হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনমুখী মিছিল ও সমাবেশে বিডিআর ও পুলিশ বাধা দেয়। এ ঘটনায় ৩ শতাধিক আহত হয়।

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সচিবালয়ে এক যৌথ সভায় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানালে সরকার বিরোধী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। নির্বাচন ঠেকাতে বদ্ধপরিকর বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনে দেশ অচল হয়ে পড়ে। ১৩ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে গুলি ও বোমায় ৪ শতাধিক আহত হয়। সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘট পালন করা হয়। আর দেশব্যাপী বিরোধী দলের গণকায়ফিউয়ের মধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় নূন্যতম ভোটারের উপস্থিতিতে কার্যত একদলীয় নির্বাচন।

৩ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভবিষ্যৎ নির্বাচনকালে নির্দলীয় সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিরোধী দলগুলেকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। এ অবস্থায় বিরোধী দলগুলো মনে করে, রাষ্ট্রপতি উদ্যোগ নিলে তারা আলোচনায় বসতে রাজি। রাষ্ট্রপতি উদ্যোগ নেন। আলোচনা শুরু হয়, তবে মাঝখানে রাষ্ট্রপতি অকস্মাৎ তার অপারগতা জানিয়ে আলোচনা প্রক্রিয়ার অবসান ঘোষণা করেন।

এদিনে ৯ মার্চ শুরু হয় বিরোধী দলগুলোর অসহযোগ আন্দোলন। সকল সরকারি অফিস, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। দেশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। এর মধ্যে মার্কিন কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য বিল রিচার্ডসন ঢাকায় আসেন। মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়ে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার কাছে ফ্যাক্স পাঠান কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা আনিয়াকু। 'অবৈধ' সরকারের সঙ্গে কোনো আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সরকারের পদত্যাগ ও মে মাসের মধ্যে নির্বাচনের দাবি জানায় বিরোধী দলগুলো।

অবশেষে সরকার নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আনতে ২ মার্চ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে মে মাসে নির্বাচন দিতেও রাজি হয়। অবশ্য বিরোধী দলগুলো বলে সরকারের পদত্যাগই তাদের একমাত্র দাবি। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

যে সরকার গঠন হয়েছে তা অবৈধ। সুতরাং এই সরকারের পাস করা কোন আইন তারা মানবে না। মার্চের এই সময়টায় সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধের প্রধান ইস্যু দাঁড়ায় মধ্য ফেব্রুয়ারির নির্বাচন মানা না মানার মধ্যে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে সেনা মোতায়েন করা হয়। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি।

এর মধ্যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। ফলে আন্দোলন এক নতুন মাত্রা লাভ করে। ২৪ মার্চ জনতার মঞ্চ পুনরুদ্ধার করা হয়। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত সচিবালয়কে ঘিরে অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়। এতে সব শ্রেণী পেশার লোকজন অংশগ্রহণ করেন। প্রচন্ড চাপের মধ্যে ২৫ মার্চ সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস হয়। সরকারের ৩৫ জন সচিব রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আহ্বান জানান। নতুবা তাদের পক্ষে আর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়ে দেন তারা।

শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় নতুন সরকার গঠনের মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে ৩০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। বিরোধী দলগুলো অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে। বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

ছবি ঃ ২.২

বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মূহুর্ত। দেশের প্রথম সাংবিধানিক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মোঃ হাবিবুর রহমানের শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস, বঙ্গভবন ৩০ মার্চ ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাবিবুর রহমান সরকারের অধীনে ১২ জুন সপ্তম সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বেশি আসন পায় এবং জাতীয় পার্টির সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবসান হয়।[৩৭]

২.১৫ বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ সদস্যদের যোগ্যতা ও কার্যাবলী

দেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালিত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। ১৯৯০ সালের নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিন জোটের (৮ দল, ৭দল ও ৫ দল) অভিন্ন রূপরেখায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও পরে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টিকে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রীক ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ১৯৯৪ থেকে ৯৬ পর্যন্ত টানা দুই বছরের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য শরিক দল, ক্ষমতাসীন বিএনপিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করতে বাধ্য করে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সংবিধানের ৬১, ৯৯, ১২৩, ১৫৭, ১৫২ অনুচ্ছেদে এবং তৃতীয় তফসিল সংশোধন করে চতুর্থ ভাগে ২ পরিচ্ছেদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে একটি নতুন পরিচ্ছেদ যোগ হয় এবং সংবিধানের ৫৮ (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) নামে নতুন ৫টি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়।

সংশোধনীতে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টাসহ সর্বাধিক ১১ উপদেষ্টা সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হলে তার পনের দিনের মধ্যে অথবা মেয়াদ শেষে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পনের দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে।

ক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্যদের যোগ্যতা

ক) তাঁকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতা থাকতে হবে।

খ) তিনি কোন রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোন অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হবে না।

গ) পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না মর্মে তাকে লিখিত ভাবে সম্মতি প্রদান করতে হবে।

ঘ) তিনি ৭২ বছরের অধিক বয়স্ক হবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

খ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হবার যোগ্যতা

ক) বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি।

খ) যদি সর্বশেষ অবসর গ্রহনকারী বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তা হলে তার অব্যবহিত পূর্বে অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি।

গ) যদি অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তাহলে আপীল বিভাগের অবসর গ্রহণকারী বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসর গ্রহণ করেছেন তাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেয়া যাবে।

ঘ) যদি আপীল বিভাগের কোন অবসর গ্রহণকারী প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তাহলে রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে কোন ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দান করবেন।

ঙ) যদি উপযুক্ত কোন ব্যক্তি না পাওয়া যায়, তাহলে রাষ্ট্রপতি স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব ভার গ্রহন করবেন । তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পুনরায় শপথ নিতে হবে এবং শপথ বাক্য পাঠ করাবেন প্রধান বিচারপতি।

গ। কার্যাবলী

ক) শান্তিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে এ সরকার নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।

খ) দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন ব্যতীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।

২.১৬ বাংলাদেশে নির্বাচন

বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থানুযায়ী সরকার গঠিত হয়। শুধু কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রেই নয় স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

সরকার কাঠামোতেও নির্বাচন পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ পর্যন্ত এ দেশে স্বাধীনতার পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ধারা প্রদর্শিত হলো।

(ক) বাংলাদেশে এক নজরে সম্পন্ন হওয়া জাতীয় নির্বাচন সমূহ

টেবিল ঃ ২.১

পর্যায়	নির্বাচন	সংখ্যা	অনুষ্ঠিত হবার সাল	মন্তব্য
জাতীয় পর্যায়	১। সংসদ নির্বাচন	৮টি	১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৫ ফেব্রুয়ারি-১৯৯৬, ১২ জুন ১৯৯৬, ১ অক্টোবর-২০০১	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
জাতীয় পর্যায়	২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (রাষ্ট্রপতি শাসনামলে)	৩টি	১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৬	ঐ
জাতীয় পর্যায়	৩। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (সংসদীয় পদ্ধতিতে)	৪টি	১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০২, ২০০২	পরোক্ষ (সংসদ সদস্যদের ভোটে)
জাতীয় পর্যায়	গণভোট	৩টি	১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৯১	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে

উৎস: নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

Dhaka University Institutional Repository

(খ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহ

টেবিল ঃ ২.২

পর্যায়	নির্বাচন	সংখ্যা	অনুষ্ঠিত হবার সাল	মন্তব্য
জাতীয় পর্যায়	সংসদ নির্বাচন	৩টি	১৯৯১ [সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ কর্তৃক জাতীয় নির্বাচন যা একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা দেয়া হয়]	
			১৯৯৬, ১২ জুন সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১ম নির্বাচন	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
			১ অক্টোবর ২০০১ সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২য় নির্বাচন	

উৎস: নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহ

টেবিল ঃ ২.৩

পর্যায়	নির্বাচন	সংখ্যা	অনুষ্ঠিত হবার সাল	মন্তব্য
স্থানীয় সংস্থা/পরিষদ নির্বাচন সমূহ	ইউনিয়ন পরিষদ	৭টি	১৯৯৩, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭ এবং ২০০২-০৩	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
	সিটি কর্পোরেশন	৩টি	১৯৮৮, ১৯৯৪, ২০০২-০৩	ঐ
	পৌরসভা	৬টি	১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯৩, ২০০১-০২	ঐ
	পার্বত্য জেলা পরিষদ	১টি	১৯৮৯	ঐ
	উপজেলা পরিষদ	২টি	১৯৮৫, ১৯৯০	ঐ

উৎস: নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

গণতন্ত্র বিকাশে শুধু কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নির্বাচনই গুরুত্বপূর্ণ নয়; স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান মাধ্যম হলো তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতায়ন। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নির্বাচনে দলীয় প্রভাব এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সরকার ও রাজনৈতিক দল যে পন্থা অবলম্বন করেন তাতে করে নির্বাচন হয়ে উঠেছিল জনগণের কাছে অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। ফলে গণতন্ত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমে সাংবিধানিক ভিত্তি লাভ করে। তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনেও দলীয় প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যনীয় যদিও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন দলীয় নির্বাচন নয়, তারপরেও দলীয় একটা প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সাম্প্রতিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের এক গবেষণায় দেখা যায়- স্থানীয় পর্যায়ে পরাজিত কিংবা নির্বাচিত কমিশণারদের দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব কিনা জানতে চাওয়া হলে অধিকাংশ কমিশণার একমত পোষন করেছেন যে, দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই সকল নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত এ বিষয়টির সমাধান হলেই কেবল গণতন্ত্রের ভিত্তি যেমন মজবুত হবে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে।

পাদটীকা (Foot Notes)

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ-বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়- পৃ-১।

২. প্রাগুপ্ত, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৪, পৃ-২।

৩. ফিরোজা বেগম, সরকারের সমস্যাবলী, ঢাকা, ফাকলী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-২২২।

৪. ইউনুস আলী দেওয়ান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা, পূর্বদেশ পাবলিকেশনস, অক্টোবর-১৯৯১, পৃ-২৮৮।

৫. মোঃ মাকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও নীতিমালা, রাজশাহী, বাংলাদেশ বুকস প্যাভিলিয়ন, জুন-১৯৯০, পৃ-৪৮।

৬. প্রাগুপ্ত, ফিরোজা বেগম, পৃ-৩৮০।

৭. প্রাগুপ্ত, ফিরোজা বেগম, পৃ-৩৮।

৮. দেবাশিষ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, কলকাতা, সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টারপ্রাইজ, জুন ১৯৯৪ পৃঃ ১৭৬।

৯. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মল কান্তিঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা, শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানী জুন-২০০২, পৃ-৭১০

Dhaka University Institutional Repository

১০. প্রাগুপ্ত, দেবাশিষ চক্রবর্তী, পৃ-১৭৬।

১১. অনাদি কুমার মহাপাত্র, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা, ২০০২, পৃ-৮৫২।

১২. প্রাগুপ্ত, অনাদিকুমার মহাপাত্র পৃ- ৮৫০।

১৩. প্রাগুপ্ত, দেবাশিষ চক্রবর্তী, পৃ-১৭৫।

১৪. প্রাগুপ্ত, ফিরোজা বেগম, পৃ-২৮৩।

১৫. প্রাগুপ্ত, ফিরোজা বেগম, পৃ-২৮৩।

১৬. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ২০০২ পৃ-২৯১।

১৭. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১২ জুলাই-২০০৪।

১৮. প্রাগুপ্ত, দৈনিক প্রথম আলো।

১৯. প্রাগুপ্ত, দৈনিক প্রথম আলো।

২০. প্রাগুপ্ত, দৈনিক প্রথম আলো।

২১. প্রাগুপ্ত, অনাদি কুমার মহাপাত্র, পৃ-৮২৫।

২২. প্রাগুপ্ত, সত্যসাধন ও নির্মল কান্তি ঘোষ, পৃ-৭১০।

২৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ঢাকা (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত) পৃ-৯৯।

২৪. প্রাগুপ্ত, পৃ-৯।

২৫. প্রাগুপ্ত, পৃ-৯৯।

২৬. প্রাগুপ্ত, পৃ-১০১।

২৭. প্রাগুপ্ত, পৃ-৯৯।

২৮. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, বিকাশমান গণতন্ত্র এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সাময়িকী, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. মুহম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, ঢাকা, হাসান বুক হাউজ-২০০১, পৃ-৫।

৩০. আমিনুল ইসলাম, সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃ-১৮।

৩১. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২১ জুলাই ২০০৪, পৃ-১৯।

৩২. দৈনিক জনকণ্ঠ, পাক্ষিক, ঢাকা, সংখ্যা-২১-২১ এপ্রিল-৬ মে ২০০১, পৃ-১২।

৩৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ১৯ নভেম্বর- ১৯৯০

৩৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ১৬ মার্চ- ১৯৯১

৩৫. দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর- ১৯৯৪

৩৬. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা- ১৬ ফেব্রুয়ারি - ১৯৯৬

৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা- ২৪ জুন- ১৯৯৬

৩৮. সত্যজিৎ দত্ত, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন- ২০০২" অপ্রকাশিত, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৯. দেখুন, আনু মুহাম্মদ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ দুই দশক, ঢাকা, প্যাপিরাস প্রকাশনী।

৪০. দেখুন, ইউনুস আলী দেওয়ান, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা, পূর্বদেশ পাবলিকেশনস, অক্টোবর-১৯৯১।

৪১. দেখুন, সরদার ফজলুল করিম (অনুদিত), *প্লেটোর রিপাবলিক*, ঢাকা, মাওলানা ব্রদাস-৭ম সংস্করণ-২০০০।

৪২. Please also see, Ahmed, Moudud, *Democracy and the Challange of Development,* Dhaka, U.P.L. 1995.

৪৩. Please also see, John, Peter W. M., *Statistical Design and Analysis of Experiments,* Newyork, The Macmillan Co., 1971.

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. Please also see, Kathari, C.R., *Research Methodology;* New Delhi, wishwa Prokashan, 1985.

৪৫. Please also see, Siddiqui, Kamal, *Towards good Goverance in Bangladesh,* Dhaka, University Press Limited, 1996.

৪৬. Please also see, Sobhan, R, *Problems of Governance in Bangladesh,* Dhaka, U.P.L., 1993.

৪৭. Please also see, Alam, M.S. and Ahmed, *N. Good Governance in Bangladesh,* Annual Report, Dhaka, Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) 1994.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ও দলিলাদি বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ও দলিলাদি বিশ্লেষণ

৩.১ সাহিত্য পর্যালোচনা

৩.১.১ ভূমিকা

সাহিত্যের আহবান কেবলমাত্র নান্দনিক উৎসবেই নয়, সাহিত্য নানাবিধ জিজ্ঞাসায় আমাদের মনকেও উদ্দীপ্ত করে। যেখানে সাহিত্যই থাকে গবেষকের অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের কেন্দ্রভূমিতে, তাকে বলে সাহিত্য গবেষণা। সাহিত্যিক গবেষণা যে একান্তভাবে জ্ঞানমর্গেরই বিষয় বা কোন নান্দনিক সৃষ্টি নয়, একথা বলা বাহুল্য। সাহিত্যিক গবেষণার বিষয় বিচিত্র ও বহুমখী এর ক্ষেত্রও বিস্তৃত। সাহিত্যিক গবেষণার বিষয়, ক্ষেত্র, পরিধির নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। এক বা একাধিক সাহিত্যিকের কোন বিশেষ সৃষ্টিধারা বা রচনা শৈলী বা সামগ্রিক সাহিত্য চেতনার বিচার, সমকাল বা ভিন্নকালের সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা, বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই হলো আলোচ্য গবেষণার মূল ক্ষেত্র[১]। আবার বর্তমান যুদ্ধের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন গণতন্ত্র, রাজনৈতিকদল ক্ষমতায়ন, আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি একটা দলের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তোলে তখন সাহিত্য আবারো স্মরণ করিয়ে দেয়- "যখন আমি তরুণ ছিলাম তখন অনেক তরুণ বয়সী ব্যক্তির মতো আমারও সাধ জেগে ছিল আমি রাজনীতিতে যোগদান করবো! কিন্তু নগর রাষ্ট্রের কিছু ঘটনাবলী আমাকে রাজনীতি ত্যাগ করতে বাধ্য করে-" যদিও এই শ্লোগানটি খ্রীস্ট পূর্ব অব্দের, তারপরেও আলোচ্য গবেষণার মূল সমস্যা সমাধানের তাগিদে সাহিত্য পর্যালোচনাকে গবেষণার অতীত ও তাত্ত্বিক দিকের উপর আলোকপাত করাতে সহায়তা করছে।

আলোচ্য বিষয়ে এ পর্যন্ত স্বীকৃত খুব বেশী গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি, তাই এ ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আলোচ্য গবেষণাটি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা কর্ম পরিচালনায় গবেষকদের সহায়তা করবে। তবে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্দিৎসু তথা পর্যালোচনামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ পর্যালোচনার মাধ্যমে আলোচ্য অধ্যায়টি সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.১.২ উন্নয়ন সাহিত্যের আলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

ডেড লাইন বাংলাদেশ, ১৯৯০ জিয়োপয়েন্ট। অপরাজেয় এক তারুন্য দাঁড়িয়ে। মুখে তাঁর মুক্তির গান। দু'চোখ জুড়ে দিন বদলের স্বপ্ন। দুঃসাহসিক এই তরুণের নাম নূর হোসেন। খালিগায়ে একটাই শ্লোগান ছিল "গণতন্ত্র মুক্তিপাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক" যার আত্মত্যাগের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচারের অবসান ঘটে এবং নবরূপে উদ্দীপ্ত গণতন্ত্রকামী জনতার স্বপ্ন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটাই দায়িত্ব তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে তাহলো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন। যে নির্বাচন শুধু জাতীয় ভাবেই নয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও স্বীকৃতি পেয়েছে অতীতের যে কোন নির্বাচনের চেয়ে। শুধু তাই নয়, জনগণ স্বতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে ১৯৯১'র নির্বাচনে। যদিও ১৯৯০'র তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধতা দেয়া হয় নির্বাচনের পর নতুন গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। কিন্তু আমরা সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সন্ধান পাই ১৯৯৬ সালে যা ত্রয়োদশ সংশোধনী নামে পরিচিত। যদিও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন বিষয়টি অত্যন্ত গৌরবের কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তা গৌরবের ছিলনা। কেননা মাগুরা ও মিরপুরের উপনির্বাচনে সীমাহীন সন্ত্রাস ও কারচুপি এবং ইতিহাসের সবচাইতে কলংকজনক ৯৬'র ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতিকে আবারো অন্ধকারে ঠেলে দেয়। যদিও এই সংসদেই পাস হয় ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল। সাংবিধানিক এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে এই তত্ত্বাবধায় সরকার সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন উঠেছে যা বির্তকের সৃষ্টি করেছে। তারপরেও উন্নয়ন সাহিত্যের আলোকে গণতন্ত্রকামী জনগণের স্বপ্নকে রক্ষার জন্য উক্ত গবেষণার (উন্নয়ন সাহিত্যের আলোকে) যৌক্তিক দিক গুলো তুলে ধরে গবেষণা কর্মটি রচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার শীর্ষক গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেছেন-তারা (তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন) নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিদদের যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন গণতন্ত্র চর্চার জন্য যেমন নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রয়োজন তেমনি ঐ নির্বাচন করতে গেলে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোরই। শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না; শান্তিপূর্ণ তো হবেই না। একদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর দায়িত্ব দেয়া হবে নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো নিজস্ব সশস্ত্র ক্যাডার দিয়ে মাঠ দখল করতে চাইবে, শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইবে- এমন স্ববিরোধিতা দিয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে কেমন করে?[২]

প্রকৃত পক্ষে শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়েই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা অবশ্যই মুখ্য। কিন্তু তার সাথে সাথে প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর গণতন্ত্রের প্রতিশ্রদ্ধাশীল থাকা। এদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে এ গ্রন্থে বলা হয়েছে- প্রধান বিষয় হচ্ছে, (কার) হচ্ছে গণতন্ত্র চর্চা, নির্বাচন তো নির্ভেজাল এক সিভিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এর মধ্যে সামরিক বাহিনী নামানো কতটা বৈধ সে প্রশ্নও ওঠা স্বাভাবিক। ওরমধ্যে পাকিস্তানী-পাকিস্তানী গন্ধ বড় বেশি। সামরিক বাহিনী দিয়ে যে গণতন্ত্র রক্ষা করা যায় না, তার সবচেয়ে কাছের প্রমাণও পাকিস্তান। প্রশ্ন উঠতে পারে গণতান্ত্রিক আচরণ যদি রাজনৈতিক দলগুলো করতও তাহলে সেনাবাহিনী নামানোর কথা কি বলত? যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। কিন্তু কথা হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোই সশস্ত্র ক্যাডার পুশছে, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। এমনকি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিও তাদের শ্রদ্ধাবোধ এখনও মানসম্মত নয়। হুমকি-ধামকি দেয়ার প্রবণতা বড় বড় নেতা-নেত্রীরও আছে। তাঁরা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন, সশস্ত্র ক্যাডার তাদের দলেও আছে। এই প্রবণতা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সেনাবাহিনীই নামান হোক আর যাই নামান হোক, আসল সমস্যার সমাধান হবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি রাজনীতিবিদদের মাথা থেকে সন্ত্রাসী প্রবণতা উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে দেশবাসী চিরদিন তাদের স্মরণ করবে।[৩]

যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণের একদিন স্বপ্ন দেখিয়েছিল সে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি শেষ পর্যন্ত বির্তকিত হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৮৮ দিন গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেছেন-১ অক্টোবর ২০০১ নির্বাচন নিয়ে জনগণের বিপুল আগ্রহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ হলো না।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে জয়-পরাজয় অবশ্যই থাকে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, একটি দলকে টার্গেট করা হবে, আর একটি দলকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। একটি জনপ্রিয় দলকে কিভাবে নাস্তানাবুদ করা যায় এবার নির্বাচনে জনগণ তা প্রকাশ্যে দেখেছে। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমান কলঙ্কিত করেছেন।

১ অক্টোবর, জাতীয় নির্বাচনের পর ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে। সুষ্ঠু রাজনীতি বলে আর কোন কিছু থাকলো না। গণতন্ত্র এখন অবমাননার যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত। সাবেক রাষ্ট্রপতি, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভীষণভাবে বিতর্কিত। তাদের ভূমিকা নিয়ে সব মহলে প্রশ্ন উঠেছে। শুধুমাত্র জামাত-বিএনপি জোট তাদের কর্মকান্ডে সন্তুষ্ট এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এর কারণ, তারা বিএনপির দেয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করেছে। হাওয়া ভবন থেকে হাওয়ায় ভেসে আসা সবরকম আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী ষড়যন্ত্রের নীলনকশা বাস্তবায়ন করেছেন। গণতন্ত্র যে ধ্বংস হলো, জনগণ যে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত এবং দেশ যে পিছিয়ে গেলো এ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। শুধুমাত্র একটি দলের পরামর্শ ও নির্দেশানুযায়ী তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সর্বাত্মকভাবে ঘায়েল করার ষড়যন্ত্র করেছে যাতে তারা নির্বাচনে পরাজিত হয়।[৪]

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বর্তমানে যে আইন বাংলাদেশে প্রচলিত আছে সে আইন কতটুকু প্রযোজ্য? কিংবা এই আইনের অধীনে কি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর লিখিত এক গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেছেন- নির্বাচন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচনের দিন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা। প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচনের দিন না হয় হলো, তার আগে কি হানাহানি চলতেই থাকবে? মানুষ মরতেই থাকবে? আসলে জননিরাপত্তার মতো একটা আইন থাকা উচিত ছিল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে। তাহলে তার অপব্যবহার না হয়ে সুষ্ঠু ব্যবহার কিছুটা হলেও হতো এবং জনসাধারণ তাহলে একটু নিরাপদ বোধ করত। অন্য যে আইনগুলো আছে সেগুলোর প্রয়োগ যদি ঠিকমত হয় তাহলেও মানুষ একটু স্বস্তি পায়। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পুলিশ কতটা দায়িত্বশীল হবে, কে জানে! অনেকেরই যে এদের ওপর আস্তা নেই তা বোঝা যায়। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনের জন্য সেনাবাহিনী নামানোর কথা বলেছেন, তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারও বলেছেন, ফেনীর মতো খুব

Dhaka University Institutional Repository

বেশি ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচনী অঞ্চলগুলোতে তিনি ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে সেনাবাহিনী নামিয়ে দেবেন। ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতার প্রধান বিষয় হচ্ছে গুলি করার মতো চরম সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকা।[৬]

'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভাগ্য ও দুর্ভাগ্য' গত ২৫ জুলাই ২০০৩ দৈনিক জনকণ্ঠের এক সংবাদ ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়- তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিষয়টি সংবিধানে সংযোজনের জন্য গণভোট প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। হাইকোর্ট আরও বলেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি গণতান্ত্রিক কাঠামো পরিপন্থী অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের দু'টি অনুচ্ছেদেরও পরিপন্থী।

প্রথমত যে বিষয়টি সবার দৃষ্টি কাড়বে, সেটি হচ্ছে, আসলে কি ১৯৯৬ সালের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের পরিপন্থী ছিল? আইনের বা সংবিধানের বিচার বিশ্লেষণে হতেও পারে, যা সাধারণ নাগরিকদের হতচকিত বিস্মৃত করলেই বা কি করা যাবে। কিন্তু একটি সঙ্গত প্রশ্নও উঠবে। সেটি হচ্ছে, যে সংশোধনীর বদৌলতে বাংলাদেশে ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে দু'দুটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, যে নির্বাচনগুলো দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করল, যে নির্বাচনের মাঝ দিয়ে আওয়ামী লীগ ৫ বছর একটি সরকার পরিচালনা করল এবং বিএনপির নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট এখন পর্যন্ত ২১ মাস সরকার পরিচালনা করে যাচ্ছে, সে সরকারগুলোর আইনগত ভিত্তি কি দাঁড়াবে তাহলে?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান যদি সংবিধানের পরিপন্থী বলেই বিবেচিত হয় তাহলে সেই সংশোধনীর ধারা বলে বাংলাদেশে যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে, যে সরকারগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা যে ইত্যকার কর্মগুলো সমাধা করেছে, বলাইবাহুল্য, তার সবই অবৈধ হয়ে পড়বে এবং এর ফলে ফিরে আসবে আগের পদ্ধতি, অর্থাৎ যে সরকার ক্ষমতায় আছে তার অধীনেই নির্বাচন যা মোটেই কাম্য নয়।

যেভাবেই পাস করা হোক সংবিধানে এই ধারর প্রবর্তন করে সেদিনকার ক্ষমতাসীনরা নিঃসন্দেহে একটি ভাল কাজ করেছিলেন। এ দেশে জাতীয় ঐকমত্য বরাবরই সুদুরপরাহত ব্যাপার। এর প্রয়োজনীয়তা গোটা জাতি বোধ করলেও আমাদের মান্যবর রাজনীতিবিদগণ খুব একটা বোধ করেন বলে মনে হয় না। কি দুর্ভাগ্য আমাদের, এমন কোন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই, যা আজ অনৈক্যের প্রতীক হয়ে ওঠেনি, কিংবা সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে জাতি আজ ক্রমান্বয়েই বিভাজিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠছে। সামাজিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলোও লুণ্ঠিত হচ্ছে। কি দুর্ভাগ্য আমাদের, ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলোকেও দলীয় রাজনীতির প্রয়োজনে বদলে দেয়া হচ্ছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ না হলে এ দেশের মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হবার মর্যাদা পেত না, সেই জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকেও আজ শুধু বিতর্কিত নয়, অপমানিত পর্যন্ত করা হচ্ছে। অপমানিত করা হচ্ছে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পর্যন্ত।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যাশিত সেই জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশে-বিদেশে প্রচুর সাধুবাদ পর্যন্ত কুড়িয়েছিল। কারণ বিধানটি এমনই যা মানুষের ভোটের অধিকারকে সংরক্ষণ ও সম্মানিত করে, প্রত্যাশিত গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করে, জাতীয় নির্বাচনকেও গ্রহণযোগ্য করে দেশে-বিদেশে। কারণ সাধারণ মানুষের ভোট নিয়ে ক্ষমতাসীনরা এ দেশে কম কারচুপি করেননি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রায়কে পাল্টে দেয়াটা ছিল যেন ক্ষমতাসীনদের এখতিয়ার। কাজেই একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে নির্দলীয়-তত্ত্বাবধয়াক পদ্ধতিটি সাধুবাদ পেয়েছিল।

অবশ্য ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানুষের সেই আস্থাকে সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এ ধরণের সরকারের জবাবদিহিতার প্রশ্নটি তখন থেকেই জোরেশোরে উঠতে শুরু করেছিল। একে আরও কার্যকর করার পদ্ধতি খুঁজে বের করার চিন্তাভাবনা হচ্ছিল। কিন্তু এ পদ্ধতি টিকে থাকুক- এ নিয়ে কারও দ্বন্দ্ব ছিল না।[৬]

গত ২৭ জুলাই ২০০১ দৈনিক আজকের কাগজের এক নির্বাচিত কলামে কে. এম. সোবহান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও জণগণের প্রত্যাশা সম্পর্কে বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ হবে নির্দলীয়। ঐতিহাসিক ভাবে নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্যেই ২ক পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে সংবিধানে। সরকারের যারা উপদেষ্টা হবেন তাদের কোন বিশেষ দলের প্রতি অনুগত্য থাকবেনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে কাজ করবেন তা ২ক পরিচ্ছেদে অর্পিত কর্তব্যের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করা। কিন্তু সরকারের উপদেষ্টাদের যদি দলীয় মানসিকতা থাকে তাহলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবী করাতে পারে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ১৯৯১ ও ৯৬ এর দুটি নির্বাচন হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যা নিয়ে জনগণের মনে কোন

Dhaka University Institutional Repository

সংশয় ছিলনা। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে ২০০১ এ অনুষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে[৭]। জনগণের প্রত্যাশা যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনই এমন কাজ করবে না যা জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করে। আন্তরিক ভাবে জনগণের প্রত্যাশা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন বিতর্কে জড়াবে না যা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। তাই আলোচ্য গবেষণায় নিরপেক্ষ সরকার যেন পক্ষপাতমুক্ত ভাবে তার উপর সাংবিধানিক ভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে এর উপর ভিত্তি করেই সাহিত্য পার্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষক লেখক উপরোক্ত লেখনীর মাধ্যমে দেশের অতীত রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দল গুলোর আচরণ, সংসদীয় গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রকৃত পক্ষেই সন্ত্রাস হচ্ছে এ দেশে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, এ সন্ত্রাস দূরীকরণ সম্ভব না হলে কোন ব্যবস্থাই সফল হবে না।

৩.২ দলিলাদি বিশ্লেষণ

আলোচ্য গবেষণার বিভিন্ন বিষয়কে আরো যৌক্তিক এবং গ্রহনীয় করার জন্য দলিলাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, নির্বাচনী আইন, সুপ্রীম কোর্ট তথা আদালতের রায়ের আলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বিভিন্ন সরকারি আইন, সংসদের দলিলাদি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য অংশের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন দিক পরিস্কার ভাবে ফুটে ওঠেছে।

৩.২.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক রূপ

দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোণাম ছিল, "গতকাল ১৩ জুলাই সপ্তম জাতীয় সংসদের মেয়াদশেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের অপেক্ষা। সংবিধানের ৫৮গ(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি লতিফুর রহমান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এ পদে নিযুক্ত হবেন। স্থায়ী সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় এটা হবে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।"

Dhaka University Institutional Repository

ক. **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ঃ** সংবিধানের ৫৮গ(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া আরো অনধিক ১০ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। ৫৮গ(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে উপদেষ্টাগণকে নিয়োগ দিতে হবে। উপদেষ্টাগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তবে ৫৮গ(৮) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী এ নিয়োগ প্রদান করবেন ও শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। ৫৮গ(৭) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল বা দলের সঙ্গে যুক্ত বা অঙ্গীভূত সংগঠনের সদস্য নন, আসন্ন সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী নন ও প্রার্থী না হওয়ার জন্য লিখিতভাবে সম্মত এবং ৭২ বছরের বেশি বয়স নন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে।

খ. **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী ঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলীর বিষয়ে ৫৮ঘ অনুচ্ছেদের (১) দফায় বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিতদের সাহায্য ও সহায়তায় ঐইরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেবে না। এ অনুচ্ছেদের (২) দফায় বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সব সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করবে।

গ. **তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর কার্যকাল ঃ** ৫৮খ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে, সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে। ১২৩(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ক্ষমতা

i. প্রতিরক্ষা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে রাষ্ট্রপতিকে প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী করা হয়েছে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ৬১ অনুচ্ছেদ। আগে এতে ছিল, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হবে এবং আইনের দ্বারা তার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে। আইন প্রণয়নের অধিকারী হবে সংসদ। তাছাড়া স্বাভাবিক সময়ে ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া সব কিছুই করতে হয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে। তাই রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক সর্বাধিনায়ক হলেও সংসদ নেতা ও সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর হাতেই অন্য সব ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও থাকে সব কর্তৃত্ব। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে এ অনুচ্ছেদের শেষে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

উল্লেখ্য, সাংবিধানিক কাঠামোতে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে' ৯৬ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস সেনাপ্রধানকে অপসারণ করে নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ দিলে বিতর্কিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

ii. জরুরী অবস্থা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধানবলি প্রয়োগের কর্তৃত্ব থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে। সংবিধানের ১৪১ক(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, যাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীন গোলযোগ দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন হুমকির সম্মুখীন, তাহলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার সময়ে মৌলিক অধিকার আদায়ে মামলা করা বা বিচারাধীন এ ধরনের মামলা স্থগিত করতে পারবেন। সংসদীয় সরকারের সময়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর এবং মামলা স্থগিতের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অপরিহার্য। ৫৮(৬) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ৪৮(৩), ১৪১ক(১) ও ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাক না কেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তার প্রতিস্বাক্ষরে রাষ্ট্রপতির কার্য করার বিধান অকার্যকর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

iii. প্রধানমন্ত্রীর ও মন্ত্রিপরিষদ সংক্রান্ত সব বিধান অকার্যকর

৫৮ ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির নামে সব কিছু সম্পাদিত হওয়ার বিধান সংবলিত ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদ ছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ সংক্রান্ত বিধানবলি সংবলিত সংবিধানের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকবে। উল্লেখ্য সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাহী সরকারের সর্বোচ্চ ফোরাম-মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী। এটাই সংসদীয় পদ্ধতির মূল কথা। কেবল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ রীতির ব্যতীক্রম রয়েছে।

iv. নির্বাহী ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টার হাতে

৫৫(২) অনুচ্ছেদের মতোই ৫৮খ(৩) অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকাররের সময়ে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক ও তার কর্তৃত্বে প্রয়োগ হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শে নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালনা করতে হবে। তাই নির্বাহী ক্ষমতার ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন।[৮]

৩.২.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দূর্বল দিক ঃ একটি পর্যালোচনা

সংসদ কর্তৃক পাসকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত বিলে ৫৮খ(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জবাবদিহিতা থাকবে রাষ্ট্রপতির কাছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই বিধানের ফলে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি রাষ্ট্রপতির পক্ষপাতিত্ব থাকলে তিনি ঐই দলের পক্ষে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রভাবিত করতে পারেন। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রাষ্ট্রপতির কাছে আইনগতভাবে জবাব দিহির ব্যবস্থা না থাকলে যে কোন অতভ চক্রান্তের শিকার হতে পারে সমগ্র দেশ ও জাতি। তাই শেষ পর্যন্ত একটি আপোষরফা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের কার্যাবলীর জন্যে যৌথভাবে দায়ী থাকবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টাদেরকে অপসারণ করতে পারবেন না। আইনের দৃষ্টিতে এটি কোন ভাল সমাধান নয়। কারণ এখানে জবাবদিহিতা সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বিলের ৫৮গ(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের নিয়োগ দেয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা একেবারেই গৌণ বা অনুপস্থিত। আইনজ্ঞদের মতে অন্য কারো মতামতের তোয়াক্কা না করে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে এককভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা থাকায় প্রধান উপদেষ্টা পদে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের বা বিশেষ পছন্দের ব্যক্তি নিয়োগ পেলেও অন্য কারো কিছু বলার থাকবে না।

আলোচ্য বিলের ৫৮গ(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করবেন। আইনজ্ঞদের আশংকা হচ্ছে যে, প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শের বিষয়টির সাথে লিখিত পরামর্শের কোন শর্ত যুক্ত না থাকায় রাষ্ট্রপতি এক্ষেত্রে আদৌ কোন পরামর্শ নিয়েছেন কি - না বা পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন কি না তা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। ফলে রাষ্ট্রপতি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১০ জন উপদেষ্টার সকলকেই বা অধিকাংশকে ঐই বিশেষ দলের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের নিয়োগ করলে অন্য কারো কিছু বলার নেই।

বিলটি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল, তাতে বিলটিকে আইনে রূপান্তিরিত করার জন্যে গণভোটের প্রয়োজন ছিল। কারণ সংসদে কোন সংশোধনী বিল পাস হলেই প্রেসিডেন্ট তাতে সম্মতি দিতে পারেন না, যদি ঐ বিল সংবিধানের একটি মৌলিক কিছু পরিবর্তন ঘটাতে চায়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি বা হ্রাস করাও সংবিধানের একটি মৌলিক বিষয়। তাই এই ক্ষেত্রে গণভোট প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদদের চাপে পড়ে সরকারি দল গণভোটকে এড়ানোর ব্যবস্থা করে।

সাবেক এটর্নি জেনারেল ব্যারিষ্টার রফিকুল হক এই বিলের অসঙ্গতিগুলোর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, এত আন্দোলন, এত রক্ত ঝরার পরেও দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্থাপিত বিল ক্ষমতাসীন দলের আন্তরিকতার অভাবকেই প্রকট ভাবে তুলে ধরেছে। তিনি বিলের ৫৮খ(১), ৫৮গ(১), ৫৮গ(৬), ৫৮গ(৮) অনুচ্ছেদেগুলো ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সবক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির পদের আবরণে এক ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে এভাবে তৈরি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে কার্যত ঃ রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ সরকার মাত্র। তাই ঐই সরকারের অধীনে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির আশা-আকাঙ্খারই প্রতিফলন ঘটবে, জনগণের নয়। তিনি বলেন প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লিখিত পরামর্শের শর্ত যুক্ত থাকলেও একটা কথা ছিল, কিন্তু এখানে ওসব কোন কিছুরই বালাই নেই।

প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সর্বোচ্চ ফায়দা লুটতে চেয়েছে। তাই গণভোটের ব্যাপারটিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই টেনে আনা হয়েছে। আবার রাজনৈতিক কারণেই গণভোটকে পরিহার করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে জনমত যাচাইয়ের কোন সদিচ্ছা বা পরিকল্পনা কোন রাজনৈতিক দলেরই ছিল না।[৯]

১৯৯৬ সনের ১৫ মার্চ অধ্যাপিকা ড. রওনক জাহান দৈনিক ভোরের কাগজে তার লিখিত প্রবন্ধে আমাদের রাজনীতির তিনটি প্রধান সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত ঃ আমদের রাজনীতির কোন পর্যায়েই কোন সঠিক জবাবদিহিতার বালাই নেই। দ্বিতীয়ত ঃ রাজনৈতিক দলগুলো জনমত সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বেখবর। তৃতীয়ত ঃ প্রতিটি রাজনৈতিক দলই মূলত ঃ একনায়কতন্ত্র চর্চা করে।

উল্লিখিত কোন সমস্যার সামান্যতম সমাধানও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে সম্ভব নয়। ডঃ রওনক জাহান ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে Constitutional Compulsion. (সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা) থেকে সৃষ্ট সমস্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই কথা মেনে নিয়ে সৈয়দ আলী কবীর ২৩/৩/৯৬ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে লিখেছেন ঃ

"সত্যি বলতে কি কেয়ারটেকার সরকার গঠনের জন্যে কোন বিল আনার পরিস্থিতি বর্তমানে নেই। কারণ যে সংসদ কেবলমাত্র সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় বলে স্থাপিত হয়েছে, তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দেয়া যায় না।..... তবে কি আমরা ষষ্ঠ সংসদকে বাদ দিয়ে একটা সাংবিধানিক শূন্যতার সৃষ্টি করব? তার ফলেও জটিলতা বাড়বে বই কমবে না। বলাবাহুল্য বিরোধী দল পঞ্চম সংসদ থেকে পদত্যাগ না করলে এই জঘন্য/ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি থেকে দেশ মুক্তি পেত।..... ষষ্ঠ সংসদ বাতিল হলেও আমরা পরে সাংবিধানিক বৈধতাকে পূরণ করে নিতে পরি। তবে যদি ঘটনাটা না ঘটে, তাহলে আমরা নতুন করে সংকটের মুখে পড়ব। এ জন্যেই দেশের আইনজীবী মহল থেকে বলা হচ্ছে যে, সুপ্রীম কোর্টে আমাদের সংবিধানের ১০৬ ধারা অনুযায়ী এ প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স

Dhaka University Institutional Repository

+ করে সমস্যার সমাধান করা হোক।..... তবে আমি নিশ্চিত নই যে, রাজনৈতিক ব্যর্থতার ফয়সালার কোন আইনগত সমাধান আদালত দিতে পারে বা দেয়া উচিত। ..... ষষ্ঠ সংসদকে পরবর্তীকালে সাংবিধানিকভাবে অবৈধ করার জন্যে পথ খোলা থাকতে পারে।..... যখনই এই দেশকে শাসন করা বৃটেনের জন্যে অসম্ভব হয়েছিল তখন তারা উপনিবেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যখন আমরা পাকিস্তানী শাসন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করলাম, তখনই আমরা তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করলাম। কিন্তু আমরা তো নিজেরা নিজেদের কাছ থেকে পালাতে পারি না। এখন রাজনীতি বিদদের আগুন নিয়ে খেলার বদলে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেখাবার সময় এসেছে।"[১০]

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে রীতিমত একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যা দেশীয় রাজনীতিতে সদাই অনুপস্থিত। রাজনীতিতে যখন বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন থাকে না, তখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া নৈতিক বৈধতা হারায়। কাজেই সাংবিধানিক বৈধতাও অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক ও হাস্যকার হয়ে পড়ে। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ রাজনৈতিক বৈধতা ছাড়াই সাংবিধানিক বৈধতা তালাশ করছে। এবং তা প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর বিরোধী দলগুলো সাংবিধানিক বৈধতা ছাড়াই রাজনৈতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এবং সেই লক্ষ্যে তারা বর্জন অর্থাৎ উভয় পক্ষই নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। কোন পক্ষই নৈতিক বৈধতা ও জনগণের স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। দেশপ্রেম ও নৈতিক বৈধতা লালিত হয় রাজনৈতিক ও আইনগত বৈধতার মাঝে। রাজনীতি এখন ন্যায়-নীতি বিবর্জিত এক ক্ষমতার লড়াই মাত্র। আইনের বাঁধনই এখন শেষ ভরসা। সেই বাঁধনটি এখন দিন দিন হালকা হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই বাঁধনকে আরো বিড়ম্বিত করতে যাচ্ছে। তাই সবকটি প্রধান বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন রূপরেখা পেশ না করে সরকারি দল নিয়ে একটি আইন পাশ করিয়ে নিয়েছে। সরকার বিপদে পড়েই সবাইকে খুশি করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল উত্থাপন করেছেন। এবং দ্রুত-গতিতে তা পাস করে নিজের মান বাচিয়েছেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের সাথে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্পর্ক একটি নাজুক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। নির্দলীয় ও অনির্বাচিত একজন সাময়িক সরকার প্রধানের ক্ষমতা নিশ্চয়ই পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়ে বেশী হতে পারে না। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার বালাই নেই, সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান (প্রধান উপদেষ্টা) জবাবদিহিতা ছাড়াই ফেরেশতার মতো কাজ করে যাবে, এমন কল্পনা করা ছেলেমানুষী বৈ ভিন্ন কিছু নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্বলতা ব্যবহার করে যারা দ্রুত প্রতিপক্ষকে ক্ষমতার লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে চায়, তারা এখন রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝেনা বা বুঝতে রাজি নয়। কারণ ক্ষমতা দখলই এদের একমাত্র লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাষ্ট্রপতি

দ্বাদশ সংশোধনীর পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। নির্বাহী সকল ক্ষমতার মালিক প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর অসহায়ত্ব দূর করার জন্যে এবং তাঁর (প্রধানমন্ত্রীর) কাজের বৈধতার জন্যেই রাষ্ট্রপতির হাতে নামমাত্র কিছু ক্ষমতা রাখা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি বিভিন্ন বাণী ও ভাষণ দিয়ে এবং কিছু কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাংলাদেশের সাংবিধানিক উন্নতির ক্ষেত্রে ১৯৭২, ১৯৭৫ এবং ১৯৯১ সন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সবগুলোতে সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনের সাহায্যে আমাদের রাষ্ট্র কাঠামো ও সরকার পদ্ধতি ঠিক করার চেষ্টা চলে। ১৯৯১ সনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি ছিল দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী। তবে ঐ সরকারের গঠন ও কার্যকারিতা নিয়ে জটিলতাও ছিল কম। কারণ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না।

১৯৯৬ সনের ত্রয়োদশ সংশোধনীর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবেই জটিলতার সম্মুখীন। প্রধান উপদেষ্টা সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। কিন্তু তিনি সকল নির্বাহী ক্ষমতার মালিক নয়। মূলতঃ নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্ব। তাই প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর সমান নয়। ফলে রাষ্ট্রপতির জন্যে একটি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। তারপরও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর যখন মন্ত্রণালয় ভাগ করার দরকার পড়ল তখন দেখা গেল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভার নিয়ে বিতর্ক উঠল।[১১]

৩.২.৪ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

একটি আধুনিক রাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না। নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান সেনাবাহিনীর নাম মাত্র সর্বাধিনায়ক। প্রধানমন্ত্রীই সেনাবাহিনীর সবকিছু দেখাশুনা করেন। আধুনিক যুগে প্রতিরক্ষা কোন সহজ ব্যাপার নয়। যুদ্ধ করে দেশ রক্ষা করতে হয় খুব কম দেশেরই। কিন্তু বিদেশী গুপ্তচর এবং দেশী-বিদেশী শত্রুর হাত থেকে দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের। বিদেশী কোন সংস্থা বা গুপ্তচর সেনাবাহিনীতে বা প্রশাসনে শত্রু ঢুকিয়ে দিয়ে যে কোন দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করতে পারে। বড় ধরনের নাশকতামূলক কাজের বিরাট অংশই বিদেশী এজেন্টদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সরকারি ভাবে সকল ব্যবস্থা দ্রুততার সাথে নেয়ার মতো উপযোগী প্রশাসন বহাল থাকতে হয়। এখন বিতর্ক হচ্ছে তিন মাসের জন্য নেহায়েতই ভাগ্যচক্রে পাওয়া কোন ক্ষমতা দিয়ে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চালানো যায় না। তাছাড়া সাংবিধানিকভাবেও উপদেষ্টাদের সেই ক্ষমতা নেই। রাজনৈতিকভাবে বৈধ হয়ে ক্ষমতার বিভিন্ন দিক বোঝার পূর্বেই তাদেরকে আবার ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় আপন নিয়মে। এই তিনমাসে প্রধান উপদেষ্টাকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন তথ্যাদি জানতে দেয়া ঠিক নয় এ মতামত প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা।

আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধান উপদেষ্টা কি পরিমাণ ক্ষমতার অধিকারী এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন- তা আমরা পরিষ্কার বলতে পরি না। তবে তিনি routine functions পরিচালনা করবে। (অনুচ্ছেদ ৫৮ঘ) কিন্তু এই রুটিন কাজ বলতে আসলেই কি বুঝায়, তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। তবে প্রধান উপদেষ্টাকে অক্ষমতা বা মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহারের জন্যে রাষ্ট্রপতি তাকে বরখাস্ত করতে পারবেন না। অন্যদিকে নির্দলীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন- সরকার সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে জবাবদিহি করার কথা। (অনুচ্ছেদ ৫৮খ) এই জবাবদিহিতার কোন ধরন বা মাত্রা ত্রয়োদশ সাংবিধানিক সংশোধনীতে নেই। কাজেই বহু বিষয়ের মত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতার বাইরে রাখা হয়। তাই ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বলা হচ্ছে ঃ

"In the constitution, in article 61 after the word law" at the end, the commas, words and figure "and such law shall, during the period in which there is a Non-Party Care-taker Government under article 58B, be administered by the President."

Dhaka University Institutional Repository

এটি নেহায়েতই একটি অপরিহার্য বিধান। এই ব্যবস্থার অনুপস্থিতি যে কোন মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। এই ব্যাপারটি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন আমরা অনুচ্ছেদ ৫৮ঙ পড়ি ঃ "Certain provisions of the constitution to remain ineffective- Notwith standing anaything contained in articles 48 (3), 141 A (1) and 141C (1) of the constitutin, during the period the Non-Party Care-taker Government is function, provisions in the constitution requring the President to act on the advice of the Prime Minister or upon his prior counter-signature shall be ineffective."

বাস্তবে ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের বহু অনুচ্ছেদকেই অকার্যকর করে দেয়। প্রতিরক্ষা বিষয়ক অনুচ্ছেদ ৬২ ও ৬৩ সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়ে। সংসদের অনুমতি ব্যতীত প্রসিডেন্ট কোন রাষ্ট্র বা শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

শুধু তাই নয় কোন বিদেশী শত্রু বাহিনীও যদি এই সময় সমগ্র দেশটি দখল করে নেয়, তবুও রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ করার আদেশ দিতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী নিজ পদে বহাল থাকলে যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। সেই বিধান সংবিধানে রয়েছে। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই কাজটি প্রেসিডেন্ট কিভাবে করবেন তা কেউ জানে না। আনাড়ীভাবে একটি সাংবিধানিক সংশোধনী দাবি করলেই বা ঠেকায় পড়ে ভাষাগত বিবেচনায় একটি সুন্দর ও উদার সংশোধনী আনলেই সংবিধান বা সাংবিধানিক আইন কার্যকর হয় না, বরং জটিলতা বৃদ্ধি পায়। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়। অস্থিরতা বাড়ে। অশান্তিতে ভোগে নিরীহ জনগণ।

দেশের প্রতিরক্ষাসহ বহু বিষয় আজ অনিশ্চয়তার গভীরে নিমজ্জিত হয়েছে। এই অনিশ্চয়তা দূরীকরণের ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টা বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই। সাংবিধানিক ভাবে উপেদেষ্টার হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার সামান্যতম সুযোগও নেই।[১২]

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ে বিতর্কের অবকাশ সবচেয়ে কম ছিল। কারণ ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংবিধানের ৬১ নং ধারার পরিবর্তন সাধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চলাকালীন সময়ে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রতিরক্ষা বিষয়ক দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের হস্তে ন্যাস্ত হয়েছে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ভাষা ও বক্তব্য এ ব্যাপারে অত্যন্ত পরিষ্কার।

Dhaka University Institutional Repository

"and such law shall, during the period in which this in a Non-Party Care-taker Government under article 58B, be administered by the President[১৩]."

সাংবিধানিক ও আইনগত প্রশ্ন উত্থাপন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা নিয়ে বির্তক করার সুযোগ অপরিসীম। এই স্বল্পস্থায়ী সরকার সকল কাজের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট-জবাবদিহি করার অর্থ কিন্তু এমনও দাঁড়াতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট যে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পুনর্বন্টন করার ক্ষমতা রাখেন। কারন প্রত্যেক উপদেষ্টার নিয়োগদাতা প্রেসিডেন্ট নিজে এবং প্রধান উপদেষ্টাসহ সবাই তার কাছে সাংবিধানিক বিধান মতে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

"The Non Party Care-taker Government shall be collectively responsible to the President."

প্রধান উপদেষ্টাকে নির্বাহী ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ৫৮খ(৩) বিধান মতে, কিন্তু ৫৮খ (১) বিধান দ্বারা প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত করে দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির কোন ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার অধিকার প্রধান উপদেষ্টার নেই। অথচ প্রধান উপদেষ্টার সকল ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার পরোক্ষ সুযোগ রাষ্ট্রপতির জন্যে রাখা হয়েছে। শুধু মাত্র তাকে সরাসরি বরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রসিডেন্টকে দেয়া হয়নি।

৩.২.৫ নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব না হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ কাল

ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আয়ুস্কাল নব্বই দিনের বেশী নয়, কিন্তু এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কারণে সংসদ নির্বাচন করা না গেলে বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা সম্ভব না হলে দেশ ও সরকারের কি হবে তাও সংবিধানে নির্দেশ নাই। অর্থাৎ সংবিধানে এজন্য কোন ব্যবস্থা নেই। ত্রয়োদশ সংশোধনীর ভাষ্য হচ্ছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"The Non Party Care-taker Government shall stand dissolved on the date on which the Prime Minister enters upon his office after the constitution of new Parliament," [58C (12)]

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্বলতা থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপস্থিতিতে সংসদীয় পদ্ধতি কার্যকর থাকতে পারে না, এ সত্যটি কি রাজনীতিবিদগণ জানতেন না, না-কি জেনেও না জানার ভান করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন কার্যকরী হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত (সংসদীয় পদ্ধতি) কোন পদ্ধতিই কার্যকর থাকতে পারে না। আর এই জন্যে পৃথিবীর কোথাও (পাকিস্তানে ছিল একবারের জন্যে একমাত্র ব্যতিক্রম মঈন কোরেশীর সরকার) তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামের কোন শাসন ব্যবস্থা চালু করার সাংবিধানিক নিয়ম আবিস্কার কোন রাষ্ট্র বা জনপদ ঘটাতে সাহস পায়নি।

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ও চরিত্র বলতে আজ আমরা কি বুঝব? ত্রয়োদশ সংশোধনীর পর এই সংবিধানটির আলোকে আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার কোন মৌলিক কাঠামো ও চরিত্র নির্ণয় করা সম্ভব নয়। প্রতিটি সংশোধনীই সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ত্রয়োদশ সংশোধনীটি বার বার মূল সংবিধানটিকে অচল রাখবে সাময়িক ভাবে। ১৯৭৫ ও ১৯৯১ সনের পরিবর্তনের পরও কোন না কোনভাবে সংবিধান একটি স্থায়ী সরকার কাঠামো পেয়েছে। ১৯৯৬ সনের পরিবর্তন নিজেই বলে দিচ্ছে যে, এ সংবিধানের অধীনে আমাদের কোন স্থায়ী সরকার ব্যবস্থা থাকবে না। সংসদ নির্বাচন যে প্রতিবারই পাঁচ বছর পর পরই হবে এ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। ১/২ বছর পর পর এমনকি ২/৪ মাস পর পরও সংকটের আবর্তে পড়ে বার বার সংসদ নির্বাচনে যেতে হতে পারে। এবং প্রতিবারই একটি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্ম নিতে পারে। কাজেই ত্রয়োদশ সংশোধনী নিজেই সংসদীয় পদ্ধতির শত্রু ও হত্যাকারী। যেভাবেই একে প্রয়োগ করা হোক না কেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন অবস্থাতেই গণতান্ত্রিক হতে পারে না, বলে একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ক্ষমতা নিয়ে বিতর্কে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল। তাই তিনি ১৪০৩ সনের ১লা বৈশাখ (১৩/৪/৯৬ইং) উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেনঃ

"বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অত্যন্ত সীমিতকালের মধ্যে কতকগুলো সীমিত উদ্দেশ্য পালনের জন্যে গঠিত। দেশের বিরাজমান, বিভিন্নমুখী সমস্যা পুরোপুরি সমাধান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্যে নির্ধারিত স্বল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয় এবং তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণও নয়। জনগণের নির্বাচিত সরকার যথাসময়ে দেশের বিরাজমান সমস্যার উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করবেন। আপনাদের সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা এমন কোন বিতর্ক উত্থাপন করবেন না, যা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।"[১৫]

৩.২.৬ নির্বাচন কমিশন ও বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সমূহ

ক) নির্বাচন কমিশন ঃ নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা তৈরি, ভোটগ্রহণ তত্ত্বাবধায়ন, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনী অভিযোগ-মোকদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দান করবেন। বর্তমানে নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ তিন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। স্বাধীন সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, সংসদ ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে শপথের দ্বারা দায়বদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশন সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করে। নির্বাচন তফসিল, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নির্বাচনের সামগ্রিক আয়োজনের ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভোটার নিবন্ধন, ভোটার তালিকা তৈরি ও হাল নাগাদ করা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়েও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নির্বাচন কমিশন আলাপ আলোচনা করে।[১৬]

২ যদিও সাংবিধানিক ভাবে নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা তথাপি দলীয় সরকার ক্ষমতাসীন থাকলে তারা নির্বাচন কমিশনের উপর সরাসরি না পারলেও নির্বাচনের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী নিয়মনীতি তৈরী করে এবং নির্বাচন পরিচালনা তথা ভোট গ্রহণকারীরা করে এবং তারা সরকারি কর্মকর্তা। নির্বাচন কমিশনের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে কোন জনবল নেই। তাই জেলার ডিসি বা উপজেলার টিএনও বা কোন সরকারি কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য পদে নিয়োগ দেয়। নির্বাচনকালীন সময়ে কাগজে কলমে তারা নির্বাচন কমিশনের অধীনেও প্রকৃত পক্ষে তারা সরকারের আজ্ঞাবহ থাকে। উদাহরণ- ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচন কুলা প্রতীক বরাদ্দের জন্য নির্বাচন কমিশন সুপারিশ পাঠালেও রিটার্নিং অফিসার সে সুপারিশ অগ্রাহ্য করেছেন কিংবা নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়াই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর অর্থাৎ নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বদলী করণ ইত্যাদি কর্মকান্ড সরকার তার নির্বাহী ক্ষমতায় করে। ফলে নির্বাচন কমিশন দলীয় সরকারের অধীনে অনেকটা ঠুটো জগন্নাথের মত। এ সময়ে তারা স্বাধীন ভাবে দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারায় স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ মাগুরা-১ অথবা টাঙ্গাইল উপনির্বাচন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়কের সময় তারা বেশ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং প্রশাসনের উপর অনেকটা নিয়ন্ত্রন আরোপ করে থাকে।

খ. নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক, আইনগত এবং বিধিগত দায়িত্ব

"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধায়ন, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশণ এই সংবিধান আইনানুযায়ী অন্যান্য পদের নির্বাচনের ন্যায় সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১. ১২০ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারী প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

২. ১২৬ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

গ. গণ প্রতিনিধি আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগের উপর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ

নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রন

i. গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৩ ধারা অনুসারে উল্লিখিত আদেশের বিধানবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন ইহার নিজস্ব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবে। উক্ত আদেশের ৫ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন যে কোন ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে তাহার যেরূপ দায়িত্ব পালনে এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন। প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনের কার্যাদি পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করিবেন এবং গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর উদ্দেশ্যাবলী সাধনকল্পে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নির্বাচন কমিশন যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ নির্দেশ জারী করিবেন।

ii. নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত যে সকল কর্মকর্তা, পাবলিক বা সরকারী কর্মচারী এবং নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধাদান করেন কিংবা বাধাদানের সময় কোন পোলিং কর্মকর্তা বা ভোটারের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন বা এমন কার্যকলাপ করেন যাহা পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবান্বিত করে সেই সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বা আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যগণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কারণাবলী লিপিবদ্ধ করে যে কোন সময় নির্বাচনের দায়িত্ব হতে অব্যহতি দিতে পারিবেন। এরূপভাবে অব্যহতিপ্রাপ্ত ব্যাক্তিগণের/কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কমিশন যেরূপ বিবেচনা মনে করবেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারবেন। এ রূপ অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং

Dhaka University Institutional Repository

† আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন তাহাদের সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

iii. গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৪৪ই ধারা অনুসারে নির্বাচনের জন্য সময়সূচী জারীর পর হতে নির্বাচনের ফলাফলের ঘোষণার পর ১৫দিন সময়কালে-

(ক) জেলা জজের নিম্নে কর্তব্যরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা;

(খ) জেলা প্রশাসক;

(গ) পুলিশ সুপার; অথবা

iv. উপরে বর্ণিত কর্মকর্তাদের অধীনে জেলায় কর্তব্যরত কোন কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া জেলার বাইরে কোন অবস্থায় বদলি করা যাবে না যদি বা নির্বাচন কমিশন লিখিতভাবে কোন কর্মকর্তার অন্যত্র বদলি সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন।

v. আদেশের ৯ ধারা অনুযায়ী বর্ণিত প্রস্তুতকৃত প্যানেলে যে সমস্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নাম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তাহাদিগকে ভোট গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসারের পূর্বানুমতি ছাড়া জেলার বাহিরে বদলি করা যাবে না।

vi. পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে রিটার্নি অফিসারের প্রয়োজন অনুসারে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

vii. ৯১ ধারা অনুসারে

(ক) বলপ্রয়োগ, ভয়প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যায় আচরণমূলক কার্যকলাপ বিদ্যমান থাকবার কারণে সুষ্ঠু সুন্দর এবং আইনসম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে প্রতীয়মান হলে সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যে কোন পর্যায়ে যে কোন ভোট কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন।

(খ) ব্যালট পেপার বাতিল বা গ্রহণ ছাড়াও আইন ও বিধি অনুযায়ী যে কোন কর্মকর্তার আদেশে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বিষয় পুনর্বিবেচনা করিতে পারেন; এবং

(গ) ভোটকেন্দ্রে আইন ও বিধিসম্মতভাবে ও সুষ্ঠু সুন্দর এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা নিশ্চিত করবার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন যেরূপ আদেশ ও নির্দেশ জারী করা অথবা

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করবেন আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(ঘ) ইলেক্টোরিয়াল ইনকোয়ারী কমিটি ঃ

i. প্রাক্ ভোট গ্রহণ অনিয়ম রোধ ঃ গণ প্রতিনিধত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৯১ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন প্রাক্ ভোট গ্রহনে অনিয়ম রোধকল্পে এবং অনিয়ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলেক্টয়াল ইনকুয়ারী কমিটি গঠন করিতে পরিবে।

ii. কমিটি গঠন ঃ ইলেক্টরাল ইনকুয়ারী কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন কমিশন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে যে সংখ্যক কর্মকর্তা সমন্বয়ে কমিটি গঠন বা প্রয়োজন বিবেচনা করবেন তাহা নির্ধারণ করতে পারবেন।

iii. কমিটির কার্যাবলী ঃ কমিটি আইনের অধীন তার কার্যাবলী সম্পাদনে এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষ হবার পূর্বেই তার বিবেচনা অনুযায়ী তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করিবেন।

iv. কমিটির ক্ষমতা ঃ তদন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনায় কমিটি নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, যথা ঃ-

ক) লিখিতভাবে যে কোন ব্যক্তিকে কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হতে এবং শপথবাক্য বা হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্যদানের আদেশ দিতে পারবেন।

খ) কোন ব্যক্তিকে তাহার নিয়ন্ত্রণে যে কোন দলিল-দস্তাবেশ অথবা বস্তু তার নিকট দাখিল করবার লিখিত নির্দেশ দিতে পারবেন।

v. তদন্ত অনুষ্ঠানের পর পরবর্তী কার্যক্রম ঃ

তদন্ত অনুষ্ঠানের শেষে কমিটি ৩ দিনের মধ্যে তদন্তের বিষয়বালী নির্বাচন কমিশনে অবহিত করবেন এবং এমন সুপারিশ করতে পারবে যাতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যে কোন অনিয়মতামূলক কার্যকলাপের দায়ে দায়ী ব্যক্তির ওপর আদেশ, কোন কার্যকলাপ বন্ধ অথবা নির্দেশিত কাজের যে কোন প্রকার বরখেলাপ, প্রয়োজনমতে ভুল তথ্য সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আদেশ জারীর সুপারিশ থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত থাকে যে, উপরে বর্ণিত যে কোন প্রকার আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য নির্বাচন কমিশন ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত জরিমানা সাব্যস্ত করতে পারবেন।[১৭]

ঘ. নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ ঃ সুষ্ঠু, অবাদ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রনের জন্য ২৭ ডিসেম্বর ৯০ থেকে এ আইন কার্যকর হয়েছে। এ আইন অনুসারে নির্বাচন কর্মকর্তা বলতে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বা কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি এবং পোলিং ষ্টেশনে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিতদেরও আইনের আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে। এখানে আইনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা তুলে ধরা হল।

১। অধ্যাদেশের প্রাধান্য ঃ আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে বা কোন চাকুরী বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকবে।

২। নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরী ও উহার নিয়ন্ত্রণ-

১) কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে, তিনি কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগহ্য কোন কারণ ব্যতীত তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণেও বা পালনে অপরাগতা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারবেন না।

২) কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসাবে কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাধা দিতে পারবেন না বা বিরত রাখতে পারবে না।

৩) কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে, তিনি তার উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনী দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাহার চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরীতে আছেন বলে গণ্য হবেন।

৪) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কমিশন এবং ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তিনি তাদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরীতে থাকাকালে নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাবে এবং দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তিনি তার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৩। নির্বাচন কর্মকর্তার শৃঙ্খলামূলক জনিত শাস্তি

১) কোন নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে প্রদত্ত কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যর্থ হলে বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃত ভাবে লঙ্ঘন করলে বা উহার অধীন কোন অপরাধ করলে তিনি অসদাচরণ করেছেন বলে গণ্য হবেন এবং উক্তরূপ অসদাচরণ তাহার চাকুরীবিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

২) কোন নির্বাচন কর্মকর্তা উপ-ধারা (১)এ উল্লেখিত অসদাচরণ করলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হতে অপসারণ বা বরখাস্ত করতে পারবেন বা বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারিবেন বা তাঁর পদাবনতি করতে পারবেন বা তার পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি অনধিক দুই বৎসরের জন্য স্থগিত রাখতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন শাস্তি উপধারা (১)-এ উল্লিখিত ব্যর্থতা, অস্বীকৃতি, লঙ্ঘন বা অপরাধের জন্য অন্য কোন আইনে নির্ধারিত কোন দন্ড প্রদান বা তার জন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ ব্যাহত বা বারিত করবে না।

৩) কোন নির্বাচন কর্মকর্তা উপ-ধারা (১)-এ উল্লেখিত অসদচারণ করলে কমিশন বা ক্ষেত্রমত কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার তাকে তার বিরুদ্ধে আনীত চাকুরীবিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণসাপেক্ষে অনধিক দুই মাসের জন্য সাময়িকভাবে চাকুরী হতে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারবেন এবং উক্তরূপ বরখাস্তের আদেশ তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁর চাকুরীবিধি অনুযায়ী প্রদত্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তদনুযায়ী ইহা কার্যকর হবে।

৪) উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত অসদাচরণের জন্য কোন নির্বাচন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণের জন্য কোন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার অনুরোধ করলে কর্তৃপক্ষ অনুরোধ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং কমিশনে অবহিত করবেন। এ আইনের ৪(১) বা ৪(২) ধারা লঙ্ঘনের অপরাধে এক বছর কারাদন্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে এবং ৫(৩) এবং ৫(৪) ধারা লঙ্ঘন করলে ছয় মাসের কারাদন্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডের বিধান রাখা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তবে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, কমিশন বা এ জাতীয় কাজের জন্য সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এ আইনের অধীনে কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করতে পারবে না। উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ৮ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কেউই নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। সবার বিরুদ্ধেই পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে এবং তাঁদের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে।

চ. নির্বাচন পরিচালনাকারী নির্বাচন কমিশনার সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত

১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সব দলের মতামতের ভিত্তিতে জনাব আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশণার হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে তার অধীনে অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনেই বি এন পি কারচুপির অভিযোগ এনেছে। এছাড়া ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সি ই সি) হিসাবে বিএনপির প্রস্তাবিত নামের তালিকায় আবু হেনার পরই বর্তমান সি ই সি এম, এ সাঈদের নাম ছিল। অথচ গত ২৩ মে ২০০০ জনাব সাঈদ দায়িত্ব গ্রহণের পর বিএনপি প্রধান বেগম জিয়া বলেছেন যে, কোথাও তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হবে না। দেশের পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময় প্রকাশিত প্রতিবেদনে চিহ্নিত হয়েছে নির্বাচন কমিশনের আরও কিছু সমস্যা যেমন, গত ৩০ বছরেও নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় হয়নি। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে সব সময় সব রাজনৈতিক দল জোরাল সমর্থন বা দাবি জানিয়ে এলেও কার্যকর কিছু হয়নি। নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব এখনও প্রধানমন্ত্রীর হাতে। তার পছন্দ-অপছন্দের ওপর ভিত্তি করেই ইসির সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিব নিয়োগ করা হয়। ডিসেম্বর ১৯৯৯ এ নির্বাচন কমিশনের কাজ পরিচালনা ও রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশনসহ আরও কিছু বিষয়ে মৌলিক সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশমাল পাঠানো হলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকারি নিয়োগের জন্য কমিশনের যে স্বাধীন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে কাজ করার কথা তা এ পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে না। কমিশনের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি সরকারের হাতে থাকায় সরাসরি সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনা সরকারের কাছে পাঠানো এক সুপারিশমালায় বলেছিলেন, ইসি সচিবালয়ের ব্যয়, কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের জন্য কেবিনেট সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি থাকবে। যার

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সংস্থাপন সচিব, ইসি সবিচালয়ের সচিব এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সচিব। এছাড়া জনাব আবু হেনা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিধি সংস্কারের জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, রাজনৈতিক দলের রেজিষ্ট্রেশন, এক ব্যক্তির সর্বোচ্চ দুটি আসনে প্রার্থী হওয়া এবং নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

জনাব আবু হেনা তার পদত্যাগের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেছিলেন, বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা ও আইন কাঠামোর মাধ্যমে পুরোপুরি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় কারণ দেশের নির্বাচনী আইন ত্রুটিমুক্ত নয় এবং নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাও অপর্যাপ্ত।[১৮]

৩.২.৭ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রনীত নির্বাচনী আচরণ বিধি

রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দেওয়া মতামতের ভিত্তিতে ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী সম্ভাব্য প্রার্থীদেরকে এই আচরণবিধির সকল বিধান মেনে চলার জন্য নির্বাচন কমিশন আহ্বান জানায়। আচরণবিধিটি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে যা নির্বাচনী আচরণ বিধি ১৯৯৬ নামে পরিচিতি পেয়েছে। সেই আচরণবিধিটি নিম্নরূপঃ

ক। গণতান্ত্রিক আচরণ

ক.১. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকাল রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কেবল নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

ক.২ জনগণের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকারকে সমুন্নত রাখতে হবে। কোন নাগরিকের জমি, ভবন ও অন্য কোন সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা যাবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উশৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারও শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

খ। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি

খ.১ সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনকানুন ও বিধি অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

খ.২ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হতে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোন প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাবে না অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না। তবে বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করা যাবে।

খ.৩ অর্থ বা প্রলোভনের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা এবং নিজের ও পরিবারের জন্য ছাড়া অন্য ভোটারদের জন্য কোনরকম যানবাহন ভাড়া বা ব্যবহার করা নির্বাচনী অপরাধ-এ সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

খ.৪ নির্বাচনে বিদ্যমান সর্বোচ্চ ব্যয়ের পরিমাণ ৩ লক্ষ্য টাকার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে এবং নির্বাচনের ব্যয় পরীক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কেবলমাত্র ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে।

খ.৫ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা অনুরূপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের পর তা যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে যে সমস্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপী-হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

গ। নির্বাচন পরিচালনায় সহযোগিতা

গ.১. ভোটার পরিচয় পত্র প্রস্তুত বিশেষ করে পরিচয় পত্রের জন্য ভোটারদের ছবি ও স্বাক্ষর/টিপসহি সংগ্রহ এবং পরিচয়পত্র বিতরণের কাজে রাজনৈতিক দলসমূহের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ.২. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল/প্রার্থীকে নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে তাদের কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করতে হবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত ভাবে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

গ.৩. নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম সম্পর্কে তদন্তক্রমে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য প্রত্যেক জেলায় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি করে ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করা হবে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করে দোষী ব্যক্তিদের ওপর জরিমানা আরোপ ও তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

গ.৪. সরকারি ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল দল ও প্রার্থীকে সম-অধিকার প্রদান করতে হবে। তবে নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হউস ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাবেন।

ঘ। নির্বাচনী প্রচারণা

ঘ.১. নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুস্থ নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে- যাতে ভোটাররা নির্ভয়ে ও অবাধে নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

ঘ.২. নির্বাচনী প্রচারাভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীর সমালোচনা করা স্বাভাবিক। তবে অশালীন ও উস্কানীমুলক বক্তব্য, বিবৃতি, শ্লেষ, বিদ্রূপ, কটাক্ষ, আক্রোশ, কুৎস্যা, ধর্মীয় ও সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কালে একদল অন্যদল সম্পর্কে এমন কোনো বক্তব্য রাখবে না যাতে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। নির্বাচনী প্রচারণা যাতে উত্তপ্ত বাকযুদ্ধে পরিণত না হয়, সে জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে বাকসংযম ও পরমতসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে।

ঘ.৩. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার থাকবে। প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা তাতে বাধা প্রদান করা যাবে না।

ঘ.৪. কোন মিছিল কিংবা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীগণ কোন অস্ত্র বহন করতে পারবে না। বহনকৃত কোন দ্রব্য যাতে কোন প্রকার ক্ষতিকর কিংবা সহিসংতামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সে দিকে সংশ্লিষ্ট দল এবং প্রার্থীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ.৫. কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা ও মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে সাধারণ ভাবেই পূর্বেই প্রতিপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

ঘ.৬. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ট্রাক/বাস কিংবা অন্য কোন যানবাহন মিছিল এবং মশাল মিছিল বের করা যাবে না।

ঘ.৭. নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সরকারের মন্ত্রীবর্গ নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রাচার যন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মকাচরীগণকে ব্যবহার, সরকারি যানবাহন ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার হতে বিরত থাকবেন।

ঘ.৮. নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সরকারি প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলের প্রচারের সুযোগ থাকবে।

ঘ.৯. কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিলের উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ব্যানার, পোষ্টার ইত্যাদি লাগানো যাবে না।

ঘ. ১০. কোন সড়কে কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না। নির্বাচনী ক্যাম্প যথাসাধ্য অনাড়াম্বর হবে। নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা যাবে না। নির্বাচনী ক্যাম্পের সংখ্যা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার বেশি হবে না।

ঘ. ১২. নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ব্যয়বহুল তোরণ নির্মাণ, একাধিক রঙের পোস্টার ছাপানো ও প্রচার, ব্যানার তৈরি ইত্যাদি ব্যয়বহুল প্রচারণা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও এজেন্টদের বিরত থাকতে হবে।

ঘ. ১৩. সরকারি ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস ও কোন সরকারি কার্যালয় কোন দল বা প্রার্থীর প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ঘ. ১৪. নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে সকল প্রচার দেয়াল লিখন হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬। আইনশৃঙ্খলা সংরক্ষণ

৬.১ স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি অপরাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের পূর্বশর্ত। কিন্তু কেবলমাত্র আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের একক প্রচেষ্টা একটি সুশৃঙ্খল নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই সকল রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে এ ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৬.২. সকল রাজনৈতিক দলকেই সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। দলীয় শক্তির প্রদর্শন ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য কোন দল কোনরকম সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেবে না। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে সকল রাজনৈতিক দল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করবে। নির্বাচনী প্রচারণাকালে অথবা ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্রে কিংবা ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে যদি কোন ব্যক্তি অস্ত্রসহ পুলিশের নিকট ধরা পড়ে, তবে তাকে ছাড়ানোর জন্য কোন রাজনৈতক দল কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। ভোট গ্রহণ চলাকালে কোন লোক কোন প্রকার প্রচার চালাবে না ও অস্ত্রসহ ভোটকেন্দ্রে অথবা ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করবে না।

৬.৩. নির্বাচনে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল ও অন্যান্য যানবাহন, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সন্ত্রাসীদের আনাগোনা এবং সরকারি কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৬.৪. অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতাদ্বারা নির্বাচনকে কলুষিত ও প্রভাবিত করা হলে নির্বাচন কমিশন যে কোন পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের নিবাচন বন্ধ করে দেবে ।

৬.৫. যে কোন ধরনের নির্বাচনী অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য নিকটস্থ আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৬. অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত গুজব ও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ ও শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

চ। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা

চ.১. পেশীশক্তির সাহায্যে ভোটকেন্দ্র দখল বা ভোটকেন্দ্রে কোনরূপ তৎপরতার মাধ্যমে ভোট সংগ্রহ করা যাবে না। নির্বাচন কমিশন এ সকল কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে দিতে পারবে।

চ.২. ভোটকেন্দ্রের আশপাশে বা নিষিদ্ধ চৌহদ্দির মধ্যে কোনো দলের নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না এবং ভোটকেন্দ্রের মধ্যে কোনো প্রকার প্রচারমূলক তৎপরতা চালান যাবে না।

চ.৩. ভোটকেন্দ্র বা তার চৌহদ্দির মধ্যে কোন প্রার্থীর নির্বাচন প্রতীক সংবলিত প্ল্যাকর্ড বা ব্যাজ বহন করা যাবে না।

চ.৪. ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়া কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করবেন না। কেবল পোলিং এজেন্টগণ নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে যাবে।[১৯]

৩.৩. নির্বাচনের ইতিহাসের ধারায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত একমাত্র বাংলা বিশ্বকোষ বাংলাপিডিয়া পর্যালোচনা করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চিত্র পাওয়া যায়। বাংলা পিডিয়ার আলোকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি, নির্বাচন ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

নির্বাচনের ইতিহাসের ধারায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার- কোন প্রতিষ্ঠান বা দপ্তরের কোন পদে প্রার্থীদের মধ্যে থেকে এক বা একাধিক প্রার্থীদের বাছাই প্রক্রিয়া; যেমন সরকার, আইনসভা এবং বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলিতে নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক প্রকাশ্য বা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সকল আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই কোন এক ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর ধরণ ছিল প্রায় অভিন্ন। নির্বাচন ছিল প্রাচীন গ্রিসীয় শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট এবং সেখানে সাধারণত লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন হতো। আমেরিকার আদিবাসীদের অনেক গোত্রের লোকেরা নির্দিষ্ট কোন পাত্রে শস্যকণা নিক্ষেপের মাধ্যমে গোত্র প্রধান নির্বাচন করত। প্রাচীন ভারতে কখনও কখনও স্থানীয় প্রধান নির্বাচিত হতেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল শাসন বিধানে স্থানীয় জনগণের মনোনীত ব্যক্তিরা স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন। সম্রাট জেলা পর্যায়ে ফৌজদারী ও অপরাপর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়োগ করতেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। বাংলায় গ্রামের লোকেরা নিজ নিজ গ্রামের মোকাদ্দম বা গ্রামপ্রধান, পাটোয়ারী বা কর আদায়কারী নির্বাচন করত। গ্রাম মোকাদ্দমদের পরামর্শক্রমে পরগণা, কাজী ও থানাদার নিযুক্ত হতেন। ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত প্রচলিত গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল স্থানীয় প্রশাসনের নির্বাচনধর্মী বৈশিষ্ট্যের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। ১৭৭৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পঞ্চায়েত প্রথা বহাল ছিল।

আধুনিক জাতি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের ফলে ঐতিহ্যগত নির্বাচন পদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছে। নির্বাচন এখন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সূচিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন নির্বাচনী আইনের (যেমন ১৬৯৪ সারে ট্রিনিয়্যাল অ্যাক্ট এবং ১৭১৬ সালের সেপ্টেনিয়্যাল অ্যাক্ট) মাধ্যমে এর নিয়মিতকরণ সম্পন্ন হয় এবং উনিশ শতকে পত্ম পর প্রণীত সংস্কার বিলগুলির আওতায় ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। ১৮৭২ সালে গোপন ব্যালট পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং অবশেষে ১৯২৮ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান চালু হয়।

অবশ্য বাংলায় নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুরূপভাবে বিকশিত হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসকেরা নির্বাচিত স্থানীয় সরকার সংস্থা, যেমন গ্রাম প্রধান, পঞ্চায়েত, পাটোয়ারী, আমীন, মুনসেফ,থানাদার ও কাজীর পদসমূহ বিলুপ্তির মাধ্যমে প্রাচীন নির্বাচন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে। এসব প্রতিষ্ঠান জনসমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। ১৮৬৮ সালে পৌর আইন (৬ নং আইন) প্রণয়ণের মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে পাশ্চাত্য ধরণের পৌর কমিটি গঠনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। শুধুমাত্র পৌরকরদাতাদেরই সদস্য নির্বাচিত করার অধিকার ছিল। বাংলার পৌরসভাগুলির মধ্যে প্রথম দিকে শ্রীরামপুর, বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (১৮৬৮)। ১৮৮৪ সালের প্রবর্তিত ৩নং আইন বলে ঢাকাসহ বাংলার গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভাসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়। একই আইনে আংশিক নির্বাচন ও আংশিক মনোনয়নের ভিত্তিতে জেলা কমিটি ও স্থানীয় বোর্ডসমূহ গঠিত হয়।

পৌর ও গ্রাম এলাকায় এই সীমিত নির্বাচনী ব্যবস্থা চালুর পর থেকেই গ্রাম পর্যায়ে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের নতুন পর্বের সূচনা হয়। ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইনসভায় নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ভোটাধিকার ও নির্বাচনী সংস্থাকে সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯০৯ সাল থেকে সম্প্রদায় ও পেশার ভিত্তিতে নির্বাচন শুরু হয়। ১৯২০ সাল থেকে অনিয়মিতভাবে হলেও প্রথম নির্বাচনের ওপর ভিত্তি করে স্থানীয়, পৌরসভা ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন তখনও সর্বজনীন না হলেও সেখানে ব্যাপকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক আইন পরিষদে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তিতে এটাই ছিল সর্বশেষ নির্বাচন।

সূচনালগ্ন থেকেই বাংলার জনগণ নির্বাচনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ঢাকা পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনের বিধান প্রবর্তিত হয়। ভোটাধিকার সম্প্রসারণের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল জনগণের দাবির ফল। কিন্তু প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থায় জনগণের আগ্রহ সত্ত্বেও পাশ্চাত্য ধাঁচের নির্বাতন বাংলায় কখনও সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর হয়নি। লক্ষণীয় যে, ভারতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলি ঔপনিবেশিক শাসকের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঔপনিবেশিক, সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠি স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। তাই ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় সরকার সর্বদাই নির্বাচনকে স্থানীয় অনুগত প্রভাবশালী মহল, বিশেষ করে জমিদারদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট ছিল। ১৯৩৫ সাল অবধি পৌরসভা, পর্যায়ের কমিটি ও বোর্ডে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ক্ষেত্রেই জমিদারদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এমন কি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনেও তাদের প্রভাব বজায় ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর নির্বাচনের ইতিহাসে রাজনৈতিক মেরুকরণের ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০ সাল পর্যন্ত দলীয় মনোনয়ন ছাড়াই প্রার্থীরা ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এমন কি ১৯৩৭ সালের নির্বাচন দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ২৫০ আসনের মধ্যে ৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী (মুসলিম ৪৩, হিন্দু ৩৯) জয়ী হন। দলীয় ভাবে মনোনীতদের মধ্যে কংগ্রেস ৫২, মুসলিম লীগ ৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬ এবং বিভিন্ন উপদল অবশিষ্ট আসন লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থীদের মধ্যে তখনও তেমন রাজনৈতিক মেরুকরণ ছিল না। পরবর্তী দশকে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত করে। প্রায় ৩০০ প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তাদের মধ্যে মাত্র ৮ জন (হিন্দু ৬ ও মুসলিম ২) নির্বাচিত হন। পরবর্তী সকল নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সাফল্য ছিল একান্তই ব্যতিক্রম।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর হিন্দুদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ, জমিদারি প্রাথার বিলোপ এবং ১৯৫৬ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান প্রবর্তনের ফলে বিভাগপূর্ব নির্বাচন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ ও জেলা বোর্ড নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে নবীন ও অনাবাসিক আইনজীবীরা প্রাধান্য বিস্তার করে। ষাট ও সত্তরের দশকে এ প্রক্রিয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং তখন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পেশাদার রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি গুরুত্বলাভ করে। আইয়ুবের দমনমূলক শাসন (১৯৫৮-১৯৬৯) স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন (১৯৬৬-১৯৭৫) মুক্তিযুদ্ধ, বাকশাল গঠনসহ যুদ্ধোত্তর রাজনৈতক পরিবর্তন বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ড এবং তৎপরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা নির্বাচনের ধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। তখন থেকে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য নয়, বরং নির্বাচনকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আইনসিদ্ধ ও বৈধকরণের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়। ১৯৭৫ পরবর্তী দশকগুলিতে অনুষ্ঠিত এ ধরনের বেশ কিছু সাধারণ নির্বাচন বর্জন কিংবা প্রতিরোধের মুখে বাতিল হয়ে যায়।

১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচন গণআন্দোলনের ফসল। বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন দুটি স্বাভাবিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা রাখে। কিন্তু তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে প্রথম বারের মতো নির্বাচনের ইতিহাসে যুক্ত হয় নতুন উপাদান, সন্ত্রাস। সন্ত্রাস কেবল সাধারণ নির্বাচনেই নয়, ব্যক্তিবিশেষের দলীয় অবস্থান নিরূপণের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থা অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনকে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি সশস্ত্র ক্যাডার লালন করে। এদের কাজ হচ্ছে ভয় দেখিয়ে ভোট সংগ্রহ, নির্বাচন কেন্দ্র দখল এবং প্রয়োজনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই। এ পরিস্থিতিতে রাজনীতিবিদ, সংবাদপত্র ও জনগণ অত্যন্ত তিক্ততার মধ্যে নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ করে। নির্বাচন এমন আত্মকেন্দ্রিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে যে, পরাজিত দল নির্বাচনের ফলাফলকে পাতানো খেলা ও বানোয়াট রূপে আখ্যায়ীত করে তা বাতিল ও নতুন রূপে অনুষ্ঠানের দাবি জানায়, আর বিজয়ী ক্ষমতাসীন দল এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে অস্বীকার করে।[২০]

৩.৩.১ ইতিহাসের আলোক ৩টি তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ, একাধিক পর্যালোচনা মূলক গ্রন্থ ও বিশ্বকোষ পর্যালোচনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত তথ্য সমূহ সংকলিত হয়েছে

ক. ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক অবিশ্বাসও সমঝোতার অভাব থেকেই উদ্ভুত। একটি বিদায়ী সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আইনানুগ রীতিসিদ্ধ পদ্ধতিগুলির কতখানি সুষ্ঠু প্রয়োগ করবে এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কতটা স্বচ্ছতা ও পক্ষপাতহীনতার পরিচয় দেবে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এ সন্দেহ থেকেই মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিটি উঠে আসে। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে ১৯৫৪ এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বচ্ছ নির্বাচন হিসেবে বিপুল ভাবে সমাদৃত হয়েছিল এবং আপামর জনগণের আন্দোলনে প্রভাব ফেলেছিল যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর থেকে নির্বাচন অবৈধ পন্থা অবলম্বনের কারণে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা দুরত্ব তৈরি হতে থাকে। এর ফলে নির্বাচনের ফলাফল আগে থেকেই ছকে বাঁধা থাকায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তা কোনরূপ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে নি। আর এ ধরনের পূর্ব নির্ধারিত প্রহসনের নির্বাচন গুলির উপর জনগণের অবিশ্বাস চরমে পৌছেছে জেনারেল এরশাদের শাসনামলে। ফলে স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল একযোগে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এভাবে ১৯৯০ সালে তিন বিরোধী শক্তির যৌথ ঘোষণায় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখার বিশদ উল্লেখ করা হয়। ঘোষণায় বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে; কিন্তু তার আগে এরশাদ সরকারকে ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি গ্রহণে বাধ্য করা হবে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে যে সরকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নতুন করে ঢেলে সাজাবে।

আপামর গণমানুষের বিক্ষোভ ও গণআন্দোলনের মুখে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির কাছে জেনারেল এরশাদ আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। এরূপ সম্মিলিত বিরোধী দলগুলির মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতোপূর্বে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন এবং বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর জেনালে এরশাদ প্রধান বিচারপতির হাতে দেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্বভার অর্পণ করে নিজে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারে মোট সতের জন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, কোন সাংবিধানিক সংশোধনী ছাড়াই ১৯৯০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়েছিল, কারণ সময়ের স্বল্পতার কারণে তখন সংসদ অধিবেশন আহ্বান সম্ভব ছিল না। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল ভিত্তি ছিল সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন; কাজেই এর কর্মতৎপরতার বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপই ১৯৯১ সালে নির্বাচিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

খ. ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সাংবিধানিক ভিত্তি (১ম সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার)

১৯৯০ সালে মূলত এরশাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়েই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উচ্চারিত হয়েছিল। কাজেই বিরোধী দলগুলির যৌথ ঘোষণায় ভবিষ্যতেও নির্বাচনের সময়ে এরূপ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রয়োজন হতে পারে এ ব্যাপারটি বিবেচনায় আনা হয়নি। বামপন্থী দলগুলি থেকে পরবর্তী তিনটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হলেও প্রধান দুই বিরোধী দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ তাতে কর্ণপাত করেনি।

১৯৯১ সালে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন একটি ইতিবাচক পদক্ষেপের সূচনা করে। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের মাত্র দু'বছরের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে অনৈক্য, পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও অবিশ্বাসের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। বিরোধী দল তাদের নিরবিচ্ছিন্ন সংসদ বর্জন, বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী এমন একটি জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছিল যে, সরকারি দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অবৈধ হস্তক্ষেপ করে গণতান্ত্রিক আদর্শ নস্যাৎ করেছে।

আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিরোধী দলগুলির মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবিত রূপরেখা নিয়ে কোন অনৈক্য ছিল না। প্রধান তিনটি বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়েত ইসলামী বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাসহ তিনটি পৃথক বিল যথাক্রমে ১৯৯১, ১৯৯৩ এর অক্টোবর ও নভেম্বর জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে জমা দেয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে কাকে মনোনীত করা হবে এ প্রশ্ন ছাড়া বিলগুলির মৌলিক বিষয় প্রায় অভিন্নই ছিল। আওয়ামী লীগ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতিকে মনোনয়ন দানের পক্ষে মত দেয়। জাতীয় পার্টির প্রস্তাব ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর দাবি ছিল একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করে এর প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ দান। অবশ্য এ তিনটি বিল বিরোধী দলগুলির সংসদ বর্জন ও সরকারি দলের অনিচ্ছাহেতু জাতীয় সংসদের আলোচ্যসূচিতে স্থান পায়নি। ফলে তিনটি প্রধান বিরোধীদল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভ ও হরতাল শুরু করে। সরকারি দলের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৪৭ জন বিরোধীদলীয় সংসদ ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরের ২৮ তারিখে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত আন্দোলনের মুখে অবশেষে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা দানের জন্য ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এরপর ১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠনের পর সরকারি দল বিএনপি বিরোধী দলগুলির আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে স্বতন্ত্রভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধকরণের পদক্ষেপ নেয়। এভাবে ১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ২৬ মার্চ ২৬৮-০ ভোটে বিলটি পাস হয়। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮ (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এসব অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়গুলির অবতারণা করা হয়; সংসদ বিলুপ্তির পর প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন ১১ সদস্য বিশিষ্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে; তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে; প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত হবেন, অন্যদিকে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে ১০ জন উপদেষ্টা মনোনীত হবেন; প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর অনুরূপ পদমর্যাদার অধিকারী হবেন; নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে এর কার্যাবলী, বিশেষত দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকবে এবং নিতান্ত প্রয়োজন না হলে নীতি নির্ধারণী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকবে; তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করবে; নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের দিনই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত ঘোষিত হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণের পর ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ ব্যাপক বিরোধী আন্দোলনের মুখে বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্তি ঘোষিত হয়। এর পর সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর অধীনে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয় এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চারদিন পর (৩ এপ্রিল) দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অবাধ ও স্বচ্ছ সপ্তম সংসদীয় নির্বাচন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে এবং ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলশ্রুতিতে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দুদিন পর দশজন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন। এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম সংসদীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে এবং ১০ অক্টোবর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার মূলত অবাধ ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলির প্রবল আন্দোলনের মুখেই জন্ম নিয়েছিল। ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি বৈধকরণের ফলে বাংলাদেশ বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় একটি অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

৩.৪ সংবিধান নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

কয়েকটি সুক্ষ্ম বিষয়

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার শিরোনামে ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে-

"প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে। মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"[২১]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক দেশ পরিচালনা সংবিধান লংঘন কিনা কিংবা তা কতটা যুক্তিযুক্ত। এ নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে বিভিন্ন আইনী বিবাদের সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টে এ বিষয়ে করা হয়েছে একাধিক মামলা। বিভিন্ন আইনজ্ঞ দিয়েছেন তাদের আইনী মতামত। নিম্নে জাতীয় সংসদের স্পীকারের রোলিং, কার্যবিধি এবং বিভিন্ন মামলার রায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ বর্জন মামলার রায়ে দু সদস্যের হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেনঃ

"The concept of Caretaker Government is nowhere to be found within the four corners of the Constitution. In the fundamental Principal of State Policy as stated in Part II of the Constitution it does not even contemplate such idea."

জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ২৩ ফেব্রুয়ারি ৯৫ বিরোধী দলের ১৪৭ সাংসদের পদত্যাগপত্র নাকচ করতে যেয়ে ওই একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলেছেন। ইংরেজিতে টাইপ করা ২৯ পৃষ্ঠার দীর্ঘ রুলিং-এ তিনি উল্লেখ করেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের মৌলনীতির পরিপন্থী। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনায় সংবিধানের ঘোষণা রয়েছে। স্পিকার বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্র অনুশীলনরত যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের ইতিহাসে এ ধারণা অজ্ঞাত।[২২]

অপরদিকে অনেক আইন বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্র পরিচারনায় মূল নীতি সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন, যার মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন সংবিধান লংঘন নয়, কেননা সংবিধানের ৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে-

"এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।"

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, এই ভাগে ৮ থেকে ২৫ পর্যন্ত মোট ১৮টি মৌলনীতি নির্দেশক অনুচ্ছেদ রয়েছে। ভারতের সংবিধানের ৩৬-৫১ অনুচ্ছেদে এবং পাকিস্তানের সংবিধানের ২৯-৪০ অনুচ্ছেদে অনুরূপ মূলনীতি রয়েছে একইভাবে সেসবও আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। অর্থাৎ কোন আদালত ঐসব মূলনীতি মেনে চলতে সরকার বাধ্য করতে পারে না।[২৩]

অপরদিকে, সুপ্রীম কোর্টের একটি মামলার রায়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতির সাংবিধানিক গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন ঃ

"They are in the nature of peoples programme for socio-economic development of the country in peaceful manner, not overnight, but gradually."[২৪]

অপরদিকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আরেকটি বিতর্কিত প্রশ্ন হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাশের পর গণভোটের প্রয়োজন ছিল কি না?

401595

এ বিষয়ে মিজানুর রহমান খান তার সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক বইয়ে লিখেছেন- এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে,দ্বাদশ সংশোধনী পাসের পর রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারো হাতে দেয়ার সুযোগ সংবিধানে রাখা হয়নি। রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সংসদ সদস্যের বাইরে কাউকে এক মূহূর্তের জন্যও প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবে না। আর কেবল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত থাকার বিধান রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন আনতে হলে ১৪২ক অনুচ্ছেদ অনুসারে গণভোটের প্রয়োজন বাধ্যতামূলক। সম্প্রতি হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ সংবিধানের ১৩তম সংশোধীনর ওপর একটি রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ রায়ের পূর্বে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রদান করেছে। মাননীয় বিচারপতি বৃন্দ অভিমত দিয়েছেন-তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিষয়টি সংবিধানে সংযোজনের জন্য গণভোটের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি। হাইকোর্ট আরও বলেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের দুটি অনুচ্ছেদেরও পরিপন্থী[২৫]। এ প্রসঙ্গে বলা যায়-

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবি তোলা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে, জাতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকালীন সময়ের জন্য ঐ সরকার কাজ করবে। দেশ শাসনে বা রাষ্ট্রের পলিসি নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে ওই সরকারের কোন ভূমিকা না থাকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর সরকারের তরফ থেকে গোড়া থেকেই বলা হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা সংবিধানের মৌলনীতি বিরুদ্ধ। অনির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানোর কোন সুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা তাই গ্রহণযোগ্য নয়।

আরেকটি সুক্ষ বিষয় হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন।পৃথিবীর বিভিন্ন সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে প্রধানমন্ত্রী তথা সরকার প্রধানকে অবশ্যই পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্য হতে হয়। এক্ষেত্রে সরকার প্রধান হিসাবে অনির্বাচিত প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন নিয়েও রয়ে গেছে প্রশ্ন।

বিচারপতি মোস্তফা কামাল কুদরত-ই-এলাহী বনাম বাংলাদেশ মামলার রায়ে সংবিধানের ৭, ৯, ১১, ৫৯, ৬০ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে বলেন, সংবিধান প্রণেতারা কেন্দ্র ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল স্তরে পূর্ণ গণতন্ত্রমনস্ক পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্বের অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় আমাদের সংবিধানের ৭, ৫৯, ৬০ অনুচ্ছেদের সংযোজন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তাঁর ভাষায়,

"The makers of the constitution wanted no such half wayhouse between autocracy and democracy. The choice was clearly for a fully democratic constitutional pattern, both at the national level and at the local level."[২৬]

কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বৃটেনের দিকে তাকালে দেখাযায় যে, প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই হাউস অব কমন্সের সদস্য হতে হবে। তবে Peerage act, ১৯৬৩ অনুসারে, অভিজাত শ্রেণীর (ডিউক, ব্যারন, আর্ল প্রভৃতি) কাউকে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে কোন আইনগত বাঁধা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তার আগে তাকে অবশ্যই অভিজাত শ্রেণীর পরিচয় আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করতে হবে এবং উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে হাউস অব কমন্সে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীকে হাউস অব কমন্সের সদস্য হতে হবে একারণে যে, তার সরকার কমন্সের কাছে দায়বদ্ধ। সুতরাং যেখানে তার নীতির পক্ষে তাকে কথা বলতে হবে এবং একই সঙ্গে ক্ষমতায় বহাল থাকার জন্য তাকে তার সমর্থকদের পরিচালনা করতে হবে।[২৭]

অতএব ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী সরকার প্রধানকে নির্বাচিত হতে হবে। অপরদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাবৃন্দ কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন এবং একই ধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের ৬৪ দফাটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে

"..... no minister of state shall hold office for a longer period than three months unless he is or becomes a senator or a member of the house of representatives."

কানাডার সংবিধানে অসংসদ সদস্য কাউকে মন্ত্রী নিয়োগে কোন বাঁধা সৃষ্টি করা হয়নি। কিন্তু সেখানের প্রথা অনুযায়ী, একটা গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে তাকে পার্লামেন্টের যে কোন একটি কক্ষে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। নচেৎ পদত্যাগ করতে হবে। ব্রিটেনের মতো এখানেও সেজন্য কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই।[২৮]

আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের বিধান আমাদের সংবিধানের অনুরূপ। আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের ২৮(৭) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মন্ত্রীদের অবশ্যই আইনসভার যে কোন চেম্বারের সদস্য হতে হবে। আমাদের সংবিধানে মন্ত্রিসভায় কেবলমাত্র 'অনধিক এক দশমাংশ' টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই হতে হবে সংসদ সদস্য। দেখা যাচ্ছে, আয়ারল্যান্ড এক্ষেত্রে আরো কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৮ সালের ফরাসি সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদ এরূপ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, যাতে সংসদের বাইরে থেকে কাউকে মন্ত্রী নিয়োগ করা যেতে পারে এবং তা যে কোন মেয়াদের জন্য। এমনকি সরকারি কর্মকর্তারাও মন্ত্রী হতে পারেন। তবে চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে হবে।

পশ্চিম জার্মানীর ১৯৪৯ সালের সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব ক্রমে বুন্ডেসটাগ (নিম্নকক্ষ) প্রধানমন্ত্রী (ফেডারেল চ্যান্সেলর) নির্বাচন করে। কিন্তু বুন্ডেসটাগ কখনই চ্যান্সেলর হিসেবে তার সদস্যের বাইরের কাউকে মনোনীত করে না। অবশ্য অন্যান্য মন্ত্রী চ্যান্সেলরের প্রস্তাবক্রমে প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে নিযুক্ত হন (৬৪ অনুচ্ছেদ)।

পার্লামেন্টের বাইরের কাউকে মন্ত্রী নিয়োগ সংবিধান কোনই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। চ্যান্সেলর এক্ষেত্রে বেশী স্বাধীন।

শ্রীলংকার অর্ডার ইন কাউন্সিলের ৪৯(২) দফাটি নিম্নরূপ

"A minister ... who for any period of four consecutive months is not a member of either chamber shall, at the expiration of that period cease to be Minister ... as the case may be...."[২৯]

উপর্যুক্ত বিভিন্ন দেশের সংবিধানের আলোকে দেখা যায় সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার প্রধান (তথা প্রধানমন্ত্রী বা সমকক্ষ অন্য কেউ) কে অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে। সাথে সাথে সরকারের অধীনে সরকারের সদস্য (কেবিনেট) দের ও নির্বাচিত হবার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতারা এব্যাপারে অত্যন্ত রক্ষণশীলতা দেখিয়েছেন। বাহাত্তরের মূল সংবিধানের (দ্বাদশ সংশোধনীর পর বর্তমানেও) এটা নিশ্চয়ই এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট যে, কোন অবস্থাতেই (সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পরও) পার্লামেন্টের বাইরের কাউকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নিয়োগের সীমিত বিধান আছে বটে তবে তাদেরকে অনেক বিধি- নিষেধ মেনে চলতে হয়। একজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীকে তার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত পার্লামেন্টের স্থায়ী কমিটির সভাপতি পর্যন্ত হতে দেয়া হয় না। ভোটাভুটিতেও তারা অংশ নিতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আমাদের সংবিধানের কাঠামো এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে সংসদের বাইরের কেউ কোন অবস্থাতেই নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ না করতে পারেন।

৩.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান

বাংলাদেশে, ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বন্টনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত।

বাংলাদেশে সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো ভারতেও পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতি। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বাংলাদেশের সংবিধানের মতো কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বে দেয়া হয়নি। নির্বাহী ক্ষমতা বন্টনে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে এক অদ্ভুত 'চেক এ্যান্ড ব্যালেন্স' সৃষ্টি করা হয়েছে। তার সংবিধানের ৫৩(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সংবিধান অনুযায়ী প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাহী ক্ষমতার শীর্ষে। অন্যদিকে ৭৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী সকল কাজ করতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য থাকবেন। মন্ত্রিপরিষদের কোন সিদ্ধান্ত মনঃপুত না হলে প্রেসিডেন্ট মন্ত্রিপরিষদকে সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পরামর্শ দিতে পারবেন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ তা যদি গ্রহণ না করে তবে তার পক্ষে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহনের অবকাশ নেই। ৭৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী। আবার ৭৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ The ministers shall be collectively responsible to the President. ভারতের প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার ভারসাম্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়েই আমাদের দেশে প্রেসিডেন্টের সাথে সরকার প্রধানের ক্ষমতার "চেক এন্ড ব্যালেন্স" দেখা যায়। এ সময় প্রেসিডেন্ট অধীক নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করেন। সশস্ত্র বাহিনী তার হাতে থাকে। পাকিস্তানের সাথে তুলনায় দেখা যায়-

পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির খোলসে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি কায়েম হয় ১৯৮৫ সালে। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দেয়া হয় প্রেসিডেন্টকে। মন্ত্রিসভার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক কেবল "to aid and advise-" এর । তিনি মন্ত্রিসভার কোন পরামর্শ মেনে চলতে সাংবিধানিকভাবে বাধ্য নন বা অন্যকথায় ঐরূপ পরামর্শ আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। পাকিস্তান সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারেন। এখানেও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের কথা বলা আছে বটে তবে তাতে আইনানুগ বাধ্যবাধকতা নেই। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করতে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে একটি বিল বিবেচনাধীন রয়েছে। নওয়াজ শরীফ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পার্লামেন্টে দেয়া এক নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতায় বলেন ঃ "If we want to run the Parliamentary system effectively, we will have to study what is relevant in Britain and India and to make our system in conformity with theirs."

যদিও পৃথিবীর কোন দেশেই বাংলাদেশের ন্যায় কাঠামোবদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। তারপরেও বিক্ষিপ্ত ভাবে কেয়ারটেকার মন্ত্রিসভা গঠনের বিধান বা দৃষ্টান্ত দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পাকিস্তানের সংবিধানের কথা।

আর পাকিস্তানের সংবিধানের ৪৮(৫) অনুচ্ছেদে রয়েছে বহুল আলোচিত কেয়ারটেকার মন্ত্রিসভা গঠনের বিধান। এতে বলা হয়েছে,

48(5) Where the President dissolves the National Assembly, he shall, in his discretion-

Dhaka University Institutional Repository

a) Appoint a date, not later than ninety days from the date of the dissolution, for the holding of a general election of the assembly; and

b) appoint a Care-taker cabinet.

পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের মূল সংবিধানেই নির্বাচনের আগে এ রকম কেয়ারটেকার মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ রাখা হয়। পরবর্তীকালে বছর বছর পাক সংবিধানের খোল-নলচে বদলেছে সত্য কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে প্রেসিডেন্টের হাতে এই ক্ষমতা সবসময়ই সংরক্ষণ করে দেয়া হয়েছে; যাতে তিনি নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন।

১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৩৭(৪) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ

".....but no person shall be appointed a minister of state or Deputy Minister unless he is a member of the National Assembly."

কিন্তু এই অনুচ্ছেদেরই ৯ দফায় উল্লেখ করা হয়

"Nothing in this Article shall be constructed as disqualifying the Prime Minister or any other Minister, or a Minister of State of Deputy Minister, for continuing in office during any period during which the National Assembly stands dissolved, or as preventing the appointment of any person as Prime Minister or other Minister, or as Minister of State or Deputy Minister, during any such period."

মূল সংবিধানের এই বিধানের ভাষাগত পরিবর্তন হতে সম্ভবত ১৯৭৩ সালের নতুন সংবিধানে Care-taker Cabinet কথাটি সংযোজিত হয়।

এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৮৮ সালে জেনারেল জিয়াউল হক নিহত হওয়ার পর পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে দুর্বল

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বেনজির ভুট্টো সরকার গঠন করেন। একপর্যায়ে প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান বেনজিরকে বরখাস্ত করেন এবং নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। বেনজির সুপ্রীম কোর্টে যান। যেমনটা গিয়েছিলেন জুনেজো। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে সমুন্নত রাখেন। দ্বিতীয়বার কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের অক্টোবরে। সরকার গঠন করেন নওয়াজ শরিফ। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনেন বেনজির ভুট্টো। কোন কোন পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেন যে, কেয়ারটেকার সরকারের মন্ত্রীরা বেনজিরের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দেখান এবং তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি নওয়াজ শরিফকে বরখাস্ত করেন। নওয়াজ শরিফ সুপ্রীম কোর্টে যান এবং তার অনুকূলে রায় লাভ করেন।

১৯৯৩ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। সেনাবাহিনীর ফর্মুলা অনুসারে, ক্ষমতার মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ান নওয়াজ শরিফ ও ইসহাক খান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে আসেন মঈন কোরেশী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রীরা এবার আর নির্বাচনে প্রার্থী হননি কেউ। ১৯৯৩-র নির্বাচনকে সামনে রেখে পাকিস্তানে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি গঠিত হয় তা ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকার। এই নির্বাচন তত্ত্বাবধান করতে ভোটকেন্দ্র গুলোতে দেড় লাখ সৈন্য মোতেয়েন করা হয়।

লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানের সংবিধানে বর্ণিত কেয়ারটেকার ধারণার সঙ্গে আমাদের তৎকালে বিরোধী দলের সংশোধনী প্রস্তাবের মৌলিক তেমন পার্থক্য নেই। ফারাক হচ্ছে একটি ক্ষেত্রে। বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবে না এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পাকিস্তানের সংবিধানে এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি।[৩০]

আমাদের বাহাত্তরের মূল সংবিধানের ৭২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ আহ্বান স্থগিত ও ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা এককভাবে প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই অনুচ্ছেদে নতুন শর্ত যোগ করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ ছাড়া সংসদ আহ্বান, স্থগিত বা ভঙ্গ করতে পারবেন না। কিন্তু তত্ত্বাবধায়কের সময় রাষ্ট্রপতির উপর এরূপ বাধ্যবাধকতা

Dhaka University Institutional Repository

থাকে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় একমাত্র নির্বাচিত ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্রপতি অনেকটা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের বাইরের কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের অধিকার সংরক্ষণ করেন। একইভাবে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের বাইরের কাউকে মন্ত্রী নিয়োগের জন্য প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিতে পারেন। ৭৫(৫) অনুচ্ছেদ এক্ষেত্রে একমাত্র শর্ত বেঁধে দিয়েছে যে, মন্ত্রিত্ব লাভের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে তাকে সংসদের কোন আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। যদি তিনি এই শর্তপূরণ না করতে পারেন তবে তার পদ ৬ মাসের মধ্যে শূন্য বলে ঘোষিত হবে।

১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে যখন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় তখন তিনি রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে এক উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি লোকসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেনে ভারতের মতো অনির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেয়ার রেওয়াজ থাকলেও সেখানে কিন্তু একটু রক্ষণশীলতাও চোখে পড়ে।

প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে সাধারণত অনির্বাচিত ব্যাক্তিদের ঠাঁই দেয়া হয় না। মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ পদধারীদেরকে অবশ্যই হাউস অব কমন্সের সদস্য হতে হয়।[৩১]
প্রধানমন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলির প্রতি এই গুরুত্বারোপের পেছনে মুখ্যত একটি মাত্র কারনই কাজ করছে। তাহলো কমন্সের কাছে মন্ত্রিসভার যৌথ দায়বদ্ধতা।

পাকিস্তানে অনির্বাচিত ব্যক্তি সমন্বয়ে মন্ত্রিসভা ও উপদেষ্টা পরিষদ উভয় গঠনেরই সুযোগ রয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানের ৯১(৭) অনুচ্ছেদের সঙ্গে ভারতের সংবিধানের ৭৫(৫) অনুচ্ছেদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের পুরোপুরি মিল না থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ ভারতের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও হাইকোর্টের রায়

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি মামলা Air 1954 MAD. 360 এর রায়ে প্রধান বিচারপতি Rajamanner ও বিচারপতি Venkatarama Aiyar উল্লেখ করেন যে, "সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াই প্রথম দেশ- যে ১৮৬৫ সালে সিক্রেট ব্যালটে নির্বাচন পদ্ধতির সূচনা করে"। এরপরেই এই ধারণা ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। Ballot Act of 1872 এর মাধ্যমে এটি ইংল্যান্ড গ্রহণ করে। প্রাচীন গ্রীস, স্পার্টা ও রোমে সংসদ নির্বাচনে ভোটাররা হাত তুলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতেন। এ রায়ে বলা হয়, স্থানীয় সংস্থা সমূহের কোন স্তরে সিক্রেট ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা আমাদের (ভারতীয়) সংবিধান কোথাও আরোপ করেনি।[৩২]

ভারতের প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব রেড্ডী ৯ জুলাই ১৯৭৯ তারিখে লোক সভার অধিবেশন ডেকেছেন। কিন্তু এর পরপরই ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে চমকপ্রদ সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে। জনতা দলের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ও তার মন্ত্রিসভা ১৫ জুলাই তারিখে পদত্যাগ করেন। দেশাই লোকসভায় কোন আস্থাভোটের মুখোমুখি না হয়েই এ সিদ্ধান্ত নেন।

প্রেসিডেন্ট তার এই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। তবে তার মন্ত্রিসভাকে বলেন যে, "to continue in office till a new Government is formed."

এর মধ্যে জনতা দলে সংসদীয় দলের নেতা পরিবর্তন হয়। দেশাইর পরিবর্তে এলেন জগজীবন রাম। প্রেসিডেন্ট রেড্ডীর সামনে তখন প্রথম সাংবিধানিক দায়িত্ব বর্তালো নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ। তিনি জনতা দলের নতুন নেতা জগজীবন রামের সঙ্গে আলাপ করলেন, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। এরপর তিনি বৈঠক করলেন বিরোধী দলীয় নেতা ওয়াই, বি চ্যাবনের সঙ্গে, তিনি অপারগতা জানান। প্রেসিডেন্ট পরবর্তীকালে কথা বলেন, অপর এক সংখ্যালঘু দলের নেতা চৌধুরী চরন সিং-এর সঙ্গে। এখানেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্টের এই উদ্যোগ গ্রহণের পর সরকার গঠনের প্রক্রিয়ায় জনতা দল ও চরণ সিং-এর দলই বেশ আগ্রহ দেখায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট এসময় চরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে চিঠি দেন ঃ

"Dear Mr. Charan Sing,

.....after consideration of all relevant aspects of the matter, I find that you enjoy the support of more members of the Lok Sabha than Mr. Morarji Desai. I, therefore, call upon you to form a Government.

.....

I trust that in accordance with the highest democratic traditions and in the interest establishing healthy conventions you would seek a vote of confidence in the Lok Sabha at the earliest possible opportunity, say, by the third week of August 1979."

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চরন সিং ও তার মন্ত্রিসভা লোকসভায় আস্থা ভোটের মোকাবিলা না করেই ১৯৭৯ সালের ২০ আগষ্ট পদত্যাগ করেন। এবং লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন।

রুদ্ধশ্বাস এ রাজনৈতিক ঘটনার এ পর্যন্ত ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু শোরগোলের দামামা বেজে উঠলো তখনই যখন প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে ঐ তারিখেই চরন সিংকে লিখলেন,

"My dear Sri Charan Singh,

I have received your letter dated on 20th August, 1979 tendering your resignation and that of your Council of Ministers. I accept the resignations and request to you and your colleagues to continue in office till other arrangements are made.

Your sincerely,

sd/-Sanjiva Reddy

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কার্যত চরণ সিং এর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা তত্ত্বাবধায়ক সরকারে রূপান্তর লাভ করে। প্রেসিডেন্টের ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ, কলিকাতা ও সর্বশেষ দিল্লি হাই কোর্টে রীট মামলা দায়ের করা হয়। প্রতিটি মামলাতেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চৌধুরী চরণ সিং এর নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। কিন্তু প্রতিটি হাইকোর্টেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চরন সিং- এর নিয়োগের বৈধতা সমুন্নত রাখেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের সংবিধান ও আইন বিষয়ক পন্ডিতরা পরবর্তীকালে কোর্টের ঐ রায়ের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ৫৪৫ সদস্যের লোক সভায় তখন জনতা দলের সদস্য সংখ্য ছিল ২০৫ জন এবং চরণ সিং-এর দলের মাত্র ৭৫ জন।

তবে লক্ষনীয় যে, হাইকোর্টের রায়ে এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রিসভা কেবল দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করবে। কোন নীতি নির্ধারণী বিষয় নয়। উল্লেখ যে, বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায় এই দৈনন্দিন কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রূপরেখার সংশ্লিষ্ট দফাটি নিম্নরূপ ঃ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধু জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

এই রীট পিটিশনে যুক্তি দেয়া হয় যে, নতুন সরকার ১৯৭৯ সালের ২০ আগস্টে বা তার পরেও লোকসভায় আস্থা অর্জন করেনি। অর্থাৎ যে সরকারটি সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিতই হলো না, সে সরকার কিভাবে লোকসভা বাতিল ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিতে পারে? মন্ত্রিসভাকেতো লোকসভার কাছে যৌথভাবে 'রেসপন্সেবল' থাকতে হবে।

প্রধান বিচারপতি জবাব দিয়েছেন, আবেদনকারীর এই যুক্তি সঠিক যে, মন্ত্রিসভা লোকসভার কাছে দায়ী এবং তাকে লোকসভার আস্থা অর্জন করতে হবে। কিন্তু আবেদনকারীর এই যুক্তি ঠিক নয় যে, নতুন সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লোকসভার আস্থা অর্জন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন ঃ

"The President in his wisdom thought that the vote of confidence should be sought by about the third week of August, 1979. His discretion has been exercised after considering the advice of the Council of Ministers and in the fact of an admitedly difficult and extraordinary situation"[৩৩]

৩.৭ ত্রয়োদশ সংশোধনী রীটের রায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনন্য এবং অভূতপূর্ব আইন: আদালত

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে বৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। হইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চের দেয়া রায়ে বলা হয়, এ সংশোধনীতে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ কোন উপাদান নেই। এ সংশোধনী সংবিধানের মূল ভিত্তি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত করেছে।

আদালত তার রায়ে বলেন, আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, রাজনৈতিক সরকার নির্বাচনের রায়কে নিজেদের পক্ষে আনতে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে। ত্রয়োদশ সংশোধনী পাসের প্রক্ষাপট বর্ণনা করে আদালত রায়ে বলেন, গণতন্ত্রের স্বার্থে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংবিধানের এ সংশোধনী আনা হয়েছে। আদালত বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অনন্য এবং অভূতপূর্ব আইন।

বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন, বিচারপতি আওলাদ আলী ও বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। তিনজন বিচারক আলাদাভাবে রায় দিলেও প্রত্যেকেই ত্রয়োদশ সংশোধনীকে বৈধ ঘোষণা করেন। আদালত ত্রয়োদশ সংশোধণীর বিরুদ্ধে দায়ের করা রিট আবেদনটি খারিজ করেন দেন।

আদালত বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ ব্যবস্থা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করেছে। বিগত নির্বাচনগুলোর মধ্য দিয়ে জনগণ এ ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আদালত তাদের রায়ে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর কোন হস্তক্ষেপ করেনি। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য তিনি প্রলুব্ধ হবেন, এটা বলা যায় না।

আদালত তার রায়ে উল্লেখ করেন, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানের মৌলিক কাঠামো গণতন্ত্রকে আঘাত করেনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রদান ও সংহত করতে সহায়তা করেছে।

আদালত বলেন, জনগণের আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হয়। হাইকোর্ট তাদের রায়ে আরো বলেন, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর জন্য গণভোটেস্ব প্রয়োজন ছিল না। কেননা ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং ৪৮ ও ৫৬ অনুচ্ছেদের কোনো সংশোধনী আনা হয়নি। এসব অনুচ্ছেদে সংশোধনীর জন্য গণভোটের প্রয়োজন হয়।

আদালত বলেন, সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে অনির্বাচিত টেকনোক্র্যাট ব্যাক্তিদের দিয়ে সরকার পরিচালনার বিধান রয়েছে। ত্রয়োদশ সংবিধানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার বিধান করা হয়েছে, ফলে এটা মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী নয়। রায়ে বলা হয়, এ সংশোধনীর ফলে সংবিধানের ৪৮ এবং ৫৬ অনুচ্ছেদ সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে, যা অনুচ্ছেদ দুটির সংশোধন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

উল্লেখ্য যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্বলিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী চ্যালেঞ্জ করে অ্যাডভোকেট এম সলিমুল্লা হাইকোর্টে রিট মামলাটি দায়ের করেছিলেন।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা (Foot Notes)

১. সুরভী বন্দোপাধ্যায়, গবেষণা ঃ প্রকরণ ও পদ্ধতি, কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং, জুলাই-১৯৯০ পৃঃ ১৭-১৮।

২. বি.বি. বিশ্বাস, সাংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জুলাই ২০০১, নীলা পাবলিশার্স, ঢাকা- পৃ-২১।

৩. প্রাগুপ্ত, বি. বি. বিশ্বাস- পৃ. ২০-২১

৪. বেবী মওদুদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৮৮ দিন, ফেব্রুয়ারি-২০০৩, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, পৃ-১।

৫. প্রাগুপ্ত, বি. বি. বিশ্বাস, পৃ-২০।

৬. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, জুলাই ২৫, ২০০০।

৭. দৈনিক আজকের কাগজ, নির্বাচিত কলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও জনগণের প্রত্যাশা, ঢাকা, ২৭ জুলাই ২০০১।

৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ত্রয়োদেশ সংশোধনী, (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)।

৯. মোঃ মাইনুল আহসান খান, সাংবিধানিক আইন, রাজনীতি, ধর্ম ও স্বাধীনতা, ঢাকা, বিশ্ব সাহিত্য ভবন ৫০, জুলাই- ১৯৯৮ পৃ-১৫৪-১৫৫।

১০. দৈনিক সংবাদ ঢাকা, ২৩ মার্চ ১৯৯৬ পৃ-৪।

১১. প্রাগুপ্ত, মোঃ মাইনুল আহসান খান, পৃঃ ১৫১-১৫৬।

১২. প্রাগুপ্ত, মোঃ মাইনুল আহসান খান, পৃ- ১৫৪-১৫৭।

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, ঢাকা, ত্রয়োদশ সংশোধনী-১৯৯৬।

১৪. প্রাগুপ্ত, বাংলাদেশ সংবিধান।

১৫. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৫।

১৬. প্রাগুপ্ত, বাংলাদেশ সংবিধান,

১৭. প্রাগুপ্ত, বাংলাদেশ সংবিধান।

১৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন-১৯৯১।

১৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচনী আচরন বিধি ১৯৯৬।

২০. বাংলাদেশ বিশ্বকোষ, বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

২১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২২. মিজানুর রহমান খান, সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, মার্চ ১৯৯৫, সিটি প্রকাশনী ঢাকা, পৃ-১।

২৩. প্রাগুপ্ত, বাংলাদেশ সংবিধান।

২৪. Kudrat-E-Elahi Vs Bangladesh 44 DLR AD 1992, P-325 (para 22).

২৫. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ২৫শে জুলাই ২০০৩।

২৬. Idid; Para-72

২৭. Hood Philips, *Constitutional Law, Publishes* 1981, P-114.

২৮. Riddell, *The Canadian Constitution in From and Fact,* Place : Publishes, 1923PP, 22, 27.

২৯. প্রাগুপ্ত, মিজানুর রহমান খান।

৩০. Keith, *Cabinet Government,* 1951, PP. 43-44

৩১. Madan Murari V. Chowdhury Charan Singh, AIR 1980 CAL 95 (Para 20).

৩২. Ibid : Para-20.

৩৩. Seervai, *Constitution Law of India* 2nd Ed. Vol-3 (paras: 33 (c) 40).

৩৪. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা ৫ আগষ্ট ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ, ঘটনা বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ, ঘটনা বিশ্লেষণ

৪.১ ভূমিকা

আলোচ্য গবেষণাটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ভিত্তিক পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের নির্দেশিকা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের সাপেক্ষে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচিত হলো-

৪.২ ঘটনা বিশ্লেষণ

৪.২.১ সাধরণ তথ্যাবলী

উত্তরদাতাদের সম্পর্কিত তথ্য- আলোচ্য গবেষণায় ৬টি পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে ২৩৪ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৮০ ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের সাধরণ জনতা, ৪জন ছিলেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে দায়িত্ব পালনকারী ৫ জন সদস্য, ১০ জন বর্তমান বা সাবেক সাংসদ অথবা মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, দেশের প্রথিতযশা ১০জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন ২০ জন। আলোচ অধ্যায়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপরে প্রাপ্ত তথ্যের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ ও রেখচিত্র (গ্রাফ) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে তথ্যগুলিকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের মাঝে তুলনামূলক আলোচনারও প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.২ উত্তরদাতাদের মতামত

উত্তরদাতা নির্বাচনে যথা সম্ভব লিঙ্গ সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার ভিন্ন ভিন্ন কৌশল বা এর লক্ষদল ভিন্ন হওয়াতে সমাজের সকল স্তরের লোকজন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৩% ছিল মহিলা বাকী ৫৭% ছিল পুরুষ।

রেখচিত্র ঃ ৪.১

মোট টার্গেট গ্রুপের স্তর

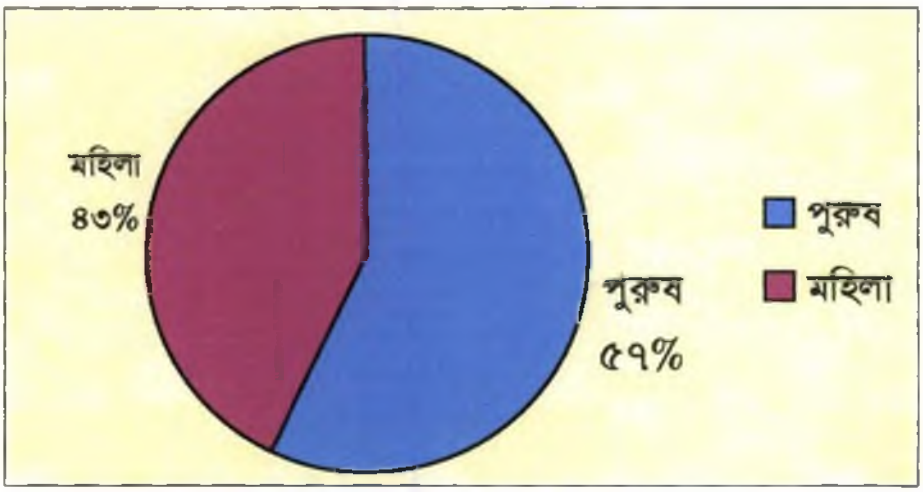

সাধারণ জনসাধারণের মতামত জরীপে ঢাকা শহরের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে স্তরীভূত দৈবচায়িত পদ্ধতিতে (Stratified Random Sampling Method) উত্তরদাতা বাছাই করা হয়েছিল। জনসাধারণের মতামত জরীপে সর্বমোট ১৮০ জন উত্তরদাতার কাছ হতে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৯% ছিল মহিলা। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী (পেশাজীবি বিশেষ শ্রেণীর) ৫৪ জনের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর মধ্যে পুরুষদের হার ছিল দৃশ্যমান বেশী (৫১%)।অপরদিকে মহিলা বিশেষজ্ঞ ছিলেন ৪৯% ।

৪.২.৩ উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

উত্তরদাতাদের বয়স ছিল (২০-৭০+) বছর পর্যন্ত। টেবিল ৪.১ অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩২% উত্তর দাতা ছিলেন ২০-২৯ বছর বয়স শ্রেণীর মধ্যে। এর পরেই ছিল ৪০-৪৯ বছর বয়স শ্রেণীর (২০%) গবেষণাটিতে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের বয়সসীমা ছিল ২০ থেকে ৭৫ বছর পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এবং বয়সসীমা শ্রেণী বিন্যাসের বৈজ্ঞানিক রীতির আলোকে টেবিল নং ৪.১ অনুসারে সর্বমোট ৬টি বয়স শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অপরদিকে সবচেয়ে কম সংখ্যা (৬%) উত্তরাদাতা ছিলেন ৭০ বা তদুর্ধ্ব বয়স শ্রেণীর।

টেবিল ঃ ৪.১

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

বয়সসীমা	উত্তরদাতা (%)
২০-২৯	৩২%
৩০-৩৯	১৮%
৪০-৪৯	২০%
৫০-৫৯	১০%
৬০-৬৯	১৪%
৭০+	৬%

রেখচিত্র ঃ ৪.২

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

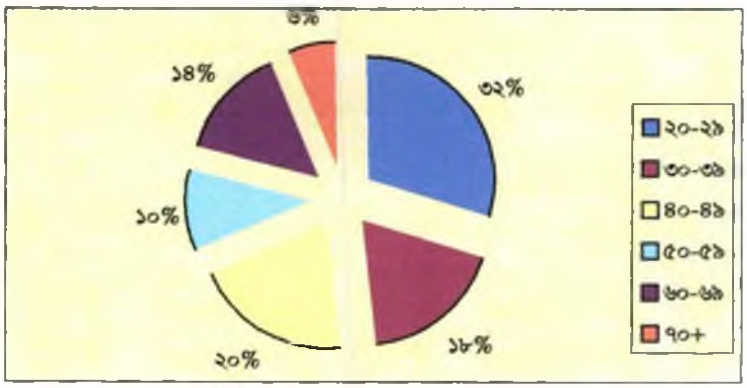

২০-২৯ বছর বয়স গ্রুপ থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যক (৫%) উত্তরদাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৪ উত্তরদাতাদের পেশা

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে এবং সঠিক তথ্য ত্রিভুজীকরণের (Triangulation) করার সুবিধার্থে বিভিন্ন পেশা শ্রেণীর লোকজন থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। টেবিলে ৪.২ অনুযায়ী পেশা ভিত্তিক প্রদত্ত সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রী। অপরদিকে পেশাজীবি বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অগ্রাধিকার ছিল অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক এবং এটা সারাদেশে স্বীকৃত যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ নিজ নিজ পেশাগত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। তাই তাদের থেকে গৃহীত মতামত গবেষণার লক্ষ্যে পৌছেতে অত্যন্ত দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছে এবং গবেষণা সমস্যার অন্তর্নিহিত সমাধান যথাযথভাবে তাদের সাক্ষাৎকারে প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৪.২

পেশা অনুযায়ী উত্তরদাতা

নং	ব্যবহৃত টুলস	দিন মজুর	গৃহিনী	স্কুল শিক্ষক	বিশ্ব ঃ শিক্ষার্থী	ক্ষুদে ব্যবসায়ী	NGO কর্মকর্তা	ব্যবসায়ী	স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি (সিটি ও পৌরঃ)	শিল্পপতি	সাংসদ	বিশ্ব ঃ অধ্যাপক	আইন জীবি	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য	রাজনৈতিক নেতা	সাবেক ও বর্তমান মন্ত্রী সদস্য	স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	মোট
১	জনগণের মতামত জরিপ	৩	২০	৪৫	৬৬	৩১	১	৬	৩						৫			১৮০
২	সংবিধান আইন বিশেষজ্ঞ সাক্ষাতকার											২	২					৪
৩	তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দায়িত্ব পালনকারী উপদেষ্টা													১০				১০
৪	বর্তমান/সাবেক সংসদ/মন্ত্রী পরিষদ সদস্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ								২		৪				২	২		১০
৫	[illegible]দের সাক্ষাৎকার											৭	২		১			১০
৬	স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার								১২								৮	২০
		৩	২৫	৬০	৬৬	৩১	১	৬	১৭		৪	৯	৪	১০	৮	২	৮	২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৫ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যক্তিবর্গ উত্তরদাতাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে চারটি স্তরে বিভক্ত করে পরিসংখ্যানিক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। টেবিল ৪.৩ ও রেখচিত্র ৪.৩-এ দেখা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৯০%-ই ছিলেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত অপরদিকে সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতার (২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এস.এস.সি-র চেয়ে কম।

টেবিল ঃ ৪.৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা

স্তর	সংখ্যা	%
এস.এস.সি. নীচে	৩	১%
এস.এস.সি.	৭	২.৯৯%
উচ্চমাধ্যমিক	১৩	৫.৫৬%
উচ্চশিক্ষা	২১১	৯০.১৭%
মোট	২৩৪	১০০%

রেখচিত্র ঃ ৪.৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা

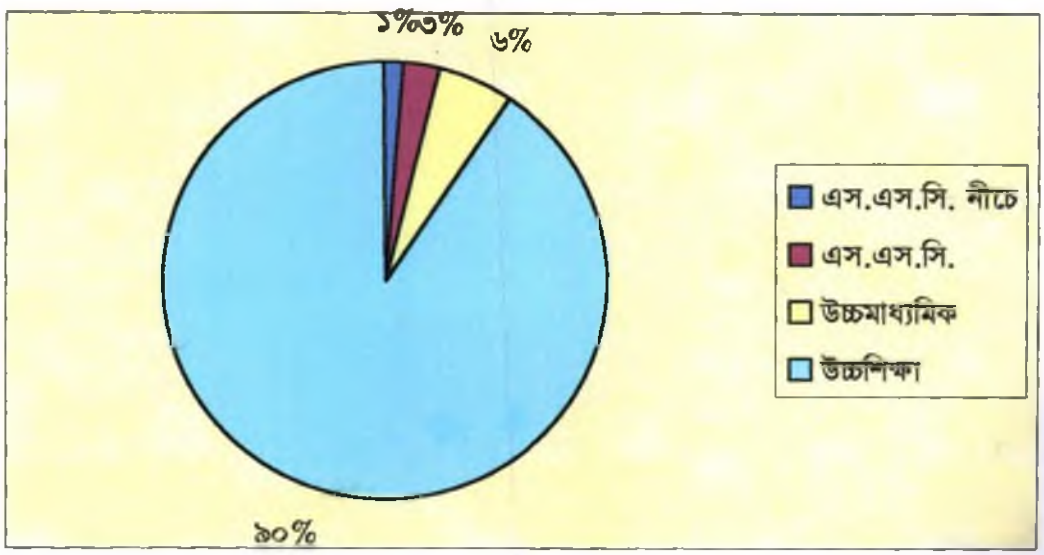

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ

বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রে বলা হয়ে থাকে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তাই গবেষণায় সাধারণ জনগণের মতামতকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। তাদের মতামত সংগ্রহের জন্য একটি মতামত জরীপ প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান মূলক ফলাফল বিশ্লেষিত হলো।

৪.৩.১ মতামত প্রদানকারীদের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা

মতামত জরীপের জন্য সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার সব ধরনের মানুষের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের প্রদত্ত তথ্যের পক্ষপাতহীনতা যাচাইয়ের জন্য মতামত জরীপে তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে শতকরা ৭৭% উত্তরদাতা সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। কিন্তু ৩৩% উত্তরদাতা সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আছেন। আলোচ্য মতামত জরীপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে বিশেষ কিছু বিষয়ে মতামত প্রকাশে এই দুই শ্রেণীর মতামতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কেননা রাজনৈতিক সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বীয় রাজনৈতিক আদর্শের দৃষ্টি কোন থেকেই মতামত দিয়েছেন।

৪.৩.২ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাঁধা সমূহ

মতামতদানকারী সকলেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাঁধা সমূহের বিষয় সমূহ সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্বাচনের প্রধান বাঁধা হচ্ছে কালো টাকা ও অস্ত্র, সন্ত্রাস, প্রশাসনেরর পক্ষপাতদুষ্টতা, রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ, স্থান বিশেষে বিশেষ দলের প্রভাব, গণ-অসচেতনতা, জাল ভোট প্রদান, গণ-দারিদ্র ও প্রার্থী কর্তৃক ভোট ক্রয়, নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব ইত্যাদি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ও বিভিন্ন দলীয় শাসনামলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে-

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৪.৪

জাতীয় সংসদে ভোট দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্তরে সমস্যার হার

ভোট প্রদানের সমস্যা	হ্যাঁ	না
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে	৩৬%	৬৪%
দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন	৬৪%	৩৬%

রেখচিত্র ঃ ৪.৪

জাতীয় সংসদে ভোট দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্তরে সমস্যার হার

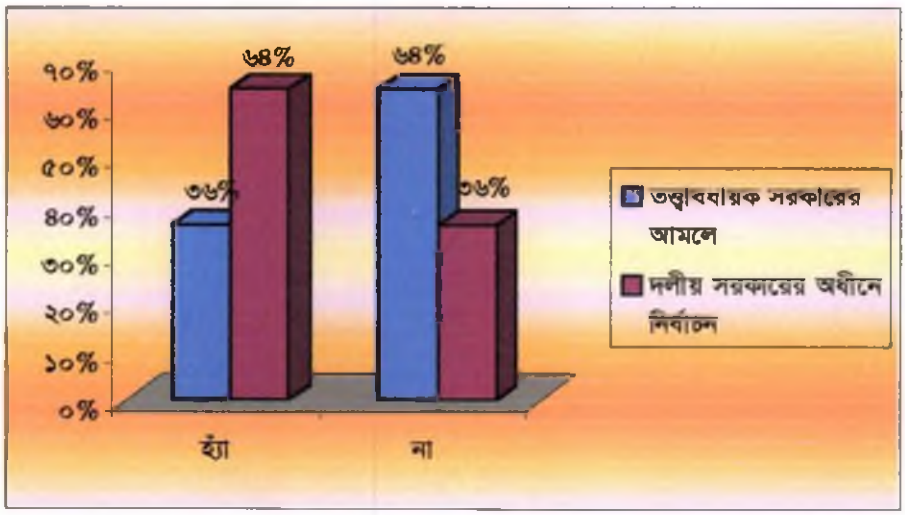

দলীয় সরকারের অধীনে শতকরা ৬৪% মতামতদানকারীর ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অপরদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মাত্র ৩৬% মতামত ব্যক্ত করেছেন যে তারা একই ধরনের সমস্যায় পড়েছিলেন। রেখচিত্র ৪.৫-এ দেখা যায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে স্বীয় ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার হার তত্ত্বাবধায়কের সময়কালে অনেক কম। ভোটাচারে অনিয়মের দীর্ঘদিনের এ চর্চার ফলে উৎপন্ন সমস্যার হার একেবারেই কমাতে হয়তো আরো সময়ের প্রয়োজন হবে। বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই মতামত দিয়েছেন যে, দলীয় সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে ভোটকেন্দ্রে দেখেন যে বিশাল সাজানো লাইন কিংবা তার ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে। এছাড়া ভোটদানের সময় যে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার হার টেবিল ৪.৫ উল্লেখ করা হলো।

টেবিল ঃ ৪.৫

ভোটদানে সমস্যা

সমস্যা	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	দলীয় সরকার	সর্বমোট
ভোট পূর্বেই দেয়া হয়ে গেছে	১৫	২৬	৪১%
বিশাল লাইন, কিন্তু কেউই বুথে যাচ্ছে না	৮	১৩	২১%
ভোটার তালিকায় নাম নেই	১	১	২%
বুথে ভোট দেবার গোপন কক্ষে বিশেষ দলের কোন এজেন্টের উপস্থিতি	৪	৯	১৩%
ভোট কেন্দ্রে না যেতে হুমকি প্রদান/বাধা দেয়	৭	১০	১৭%
কেন্দ্র দখল করে ফেলা	১	৫	৬%
মোট	৩৬	৬৪	১০০%

রেখচিত্র ঃ ৪.৫

ভোটদানে সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিল ৪.৫ ও রেখচিত্র ৪.৫ এর প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী উভয় সময়কালীন নির্বাচনে ভোটদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ঘটে যে একজনের ভোট অন্য কেউ জাল ভোট হিসেবে দিয়ে ফেলেছে। প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী যে কেন্দ্রে যার প্রভাব রয়েছে, যে সেই কেন্দ্রের ভোটারদের মধ্যে যাদের ভোট পাবার সম্ভাবনা নেই, এরূপ ভোটারদের নাম ভোট লিষ্টে চিহ্নিত করে ভোট শুরুর মধ্যেই জাল ভোট দিয়ে ফেলানোর ব্যবস্থা করে। কিংবা ভিন্ন মতাবলম্বীদের ভোটকেন্দ্রে না যাবার হুমকি দেয়া হয়। কিংবা বুথের ভিতর প্রভাবশালী প্রার্থীর এজেন্টের সম্মুখে ব্যালটে সিল মারার জন্য বাধ্য করা হয়। তুলনামূলক ভাবে কেন্দ্র দখল সহ এরূপ ঘটনা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অধীক ঘটে। নির্বাচনে শতকরা ৬% ক্ষেত্রে কেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটে। এ মধ্যে ৫% ঘটে দলীয় সরকারের সময়কালে।

৪.৩.৩ নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত মতামত

যে কোন নির্বাচন নিরপেক্ষ ভাবে আয়োজনে কোন্ বিষয় সমূহ প্রয়োজন তাকে প্রয়োজনীয়তার ক্রমহারে র‍্যাংকিং করা হয়েছে। নিম্নের টেবিলে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী দেয়া হলো।

টেবিল ঃ ৪.৬

নিরপেক্ষ নির্বাচনে করণীয়

১	রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্ট সহনশীলতা	৩৬%
২	সরকারি পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার	২৬%
৩	শিক্ষার প্রসার	২০%
৪	প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার আধুনিকীকরন সহ নির্বাচনী নীতিমালাও আইনের সংস্কার	১২%
৫	সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	৬%

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা (৩৬%) এর মধ্যে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্ট পারস্পরিক সহনশীলতা। এরপরে দেখা যায় শতকরা ২৬জন উত্তরদাতা নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সরকারি পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন ১২%। অপরদিকে প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থা আধুনিকায়ন সহ নির্বাচনী নীতিমালা ও আইন সংস্কারের পক্ষে মতামত দিয়েছেন ১২% উত্তর দাতা, যাহোক ৬% অংশগ্রহণকারী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন।

৪.৩.৪ অন্যান্য নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন

উত্তর দাতাদের মধ্যে শতকরা ৮৬ ভাগই স্বীকার করেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সাথে অন্যান্য নির্বাচনের পার্থক্য তারা অনুধাবন করেছেন। অপরদিকে ১৪ ভাগের দৃষ্টিতে বিশেষ কোন পার্থক্য চোখে পড়েনি। অধিকাংশের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

৪.৩.৫ ভোটার উপস্থিতি

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অধিকাংশের মতে ভোটার উপস্থিতি বেশী থাকে। শতকরা ৮৪ জনের মতামত অনুযায়ী সাধারণ ভোটারদের ভোটদানের উপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যথাসম্ভব নিরক্ষেভাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয় বলে নিজেদের মতামত ভোটের মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ থাকে, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে, ইত্যাদি।

শতকরা ৯৪ জনের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কালে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করনে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। গণ-মাধ্যমে চলে ব্যাপক প্রচারনা। "আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দিব।" "কিংবা ভোট আমার অধিকার" ইত্যাদি শ্লোগান গুলোরব্যাপক প্রচার, পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশ অন্যতম। যার ফলে জনগণ এসময় ভোটদানে দলীয় সরকারের অধীনের তুলনায় বেশী উৎসাহিত হয়। শতকরা ৭৪ ভাগ উত্তরদাতাই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোট দানে অনীহা প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৬ নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে সাফল্য

নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে (তত্ত্বাবধায়ক ও দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন) তুলনামূলক সফলতার হার সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে শতকরা ৯১ জন উত্তরদাতাই মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন আয়োজনে সফল। অপরদিকে মাত্র ৩১% এর মতামত অনুযায়ী দলীয় সরকার নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন আয়োজনে সফল কিন্তু ৬৯ % মনে করেন না।

টেবিল ঃ ৪.৭

নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন আয়োজনের তুলনা

নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন আয়োজন	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	দলীয় সরকার
সফল	৯১%	৩১%
ব্যর্থ	৯%	৬৯%

দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়না, অপরদিকে মাত্র ৯% এর মতামত অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ।

রেখচিত্র ঃ ৪.৬

নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন আয়োজনের তুলনা

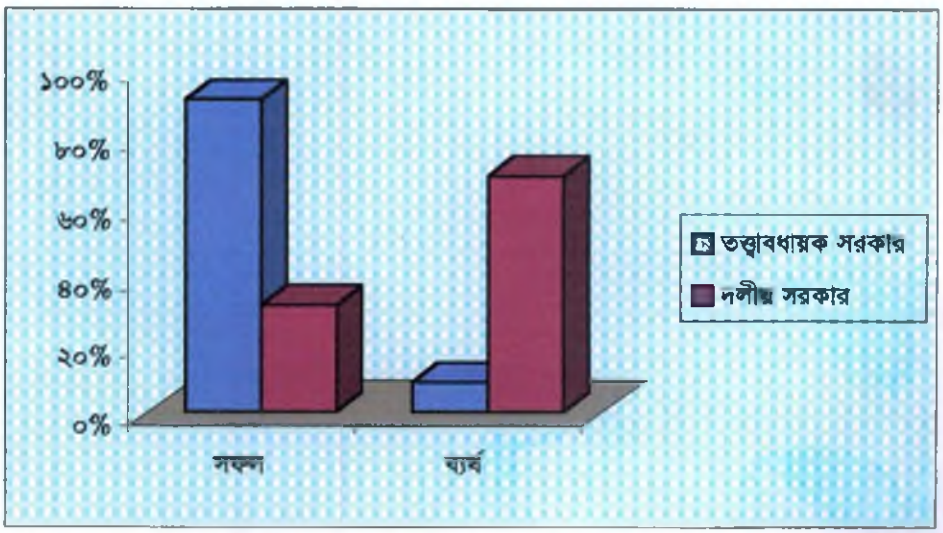

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৭ যে নির্বাচন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হওয়া উচিত

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কোন্ কোন্ নির্বাচন হওয়া উচিত- এ বিষয়ে মতামত প্রদানকারীরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন যা টেবিলে দেখানো হয়েছে-

টেবিল ঃ ৪.৮

তত্ত্বাবধায়কের অধীনে যে যে নির্বাচন হওয়া উচিত

নির্বাচনের প্রকৃতি	হার
সকল নির্বাচনই হওয়া উচিত	৬৬%
শুধুমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৩০%
শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার নির্বাচন	০%
কোনটাই না	৪%

উপরোক্ত টেবিল ৪.৮ ও রেখচিত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক ৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন সকল স্তরের নির্বাচনই তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হওয়া উচিত। কেননা এতে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে এবং ব্যয় কমবে, স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারি দলের প্রভাব থাকবেনা, অপরদিকে ৪ ভাগ উত্তরদাতা এমতের বিরোধীতা করে বলেছেন দেশের কোন নির্বাচনই তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হওয়া উচিত নয়।

রেখচিত্র ঃ ৪.৭

তত্ত্বাবধায়কের অধীনে যে যে নির্বাচন হওয়া উচিত

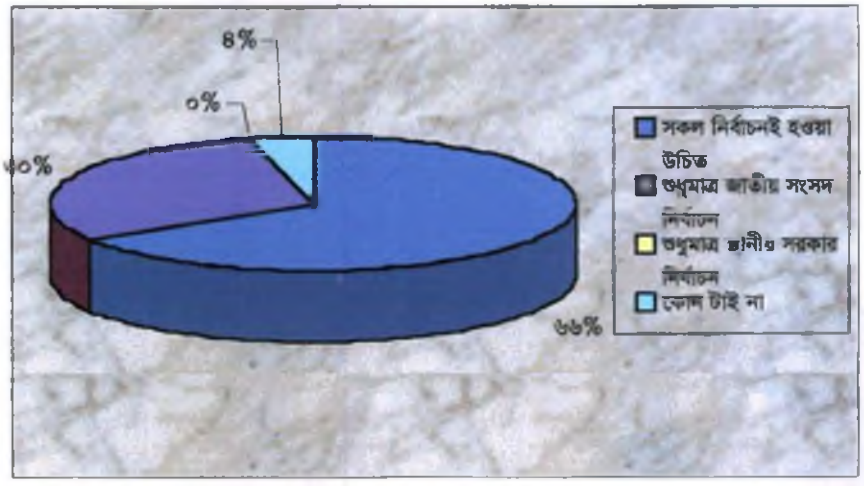

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে তারা ভারত সহ অন্যান্য দেশের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। কেননা ভারতে দলীয় সরকরের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদি দেশে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করে রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন কথা যায় তবে দলীয় সরকারের অধীনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব সে ক্ষেত্রে কেয়ারটেকার সরকারের প্রয়োজন হবে না।

৪.৩.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প কি হতে পারে এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে ৯৩ ভাগই বলেছেন যে এদেশের প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন বিকল্প নেই। অপরদিকে ৭% বিকল্প হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন এবং দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার কথা উল্লেখ করেছেন।

৪.৩.৯ আইন শৃঙ্খলা তুলনামূলক পরিস্থিতি সম্পর্কিত মতামত

মতামত দানকারীদের শতকরা ৭১ ভাগের মতে-এ সময়কার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় ভাল থাকে, ২৫ ভাগের মতে দলীয় শাসনামলে বিরাজমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সময়ের সাথে এ সময়ের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না এবং ৪% উত্তরদানে বিরত ছিলেন।

৪.৩.১০ জনগণের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা উদ্ভবের কারণ

অধিকাংশ জনগণ মত প্রকাশ করেন যে দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। এবং রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারনেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। তাই অধিকাংশ মানুষই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন। শতকরা ৯৭ ভাগ উত্তরদাতাই এ ব্যবস্থাকে গ্রহন যোগ্য ব্যবস্থা হিসেবে মনে করেন। উত্তরাদাতারা উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশে এবং প্রতিবেশী দেশ গুলোতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার না থাকার পরেও আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন। এর পিছনের কারণ অনুসন্ধানে অধিকাংশ উত্তর দাতাই বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। উত্তর দাতারা মনে

Dhaka University Institutional Repository

করেন আমলাদের দুর্নীতি ও দলীয় সংশ্লিষ্টতা, নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা ইত্যাদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা উদ্ভবের মূল কারন।

৪.৩.১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে ভোটপ্রদানে পার্থক্য অনুভব ঃ নিরপেক্ষ নির্বাচন

উত্তরদাতাদের ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কালে ভোটদানে কোন পার্থক্য অনুভূত হয় কিনা এ প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৮৮% ভাগ বলেছেন, তারা এ সময় অন্যান্য সময়ের নির্বাচনের চেয়ে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য অনুভব করেছেন। অপরদিকে ১২% ভাগের নিকট কোন রূপ পার্থক্য অনুভূত হয়নি।

শতকরা ৭৩% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। ২০% উত্তরদাতা বিরত ছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র ৭% ভাগ মনে করেন নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব। দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কেন সম্ভব নয় এর কারণ সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন কারণ সনাক্ত করেছেন। ৬০% এর মতে এ সময় প্রশাসন সরকারের নির্দেশে চলে, ৩০% ভাগ মনে করেন এ সময় সরকারের দলীয় ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য বেশী থাকে এবং তারা ভয়ভীতি সৃষ্টি করে, কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

৪.৩.১২ দেশে বিরাজমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা

চিত্র ৪.৮ অনুযায়ী শতকরা ৫২ জন উত্তরদাতাই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রতি

টেবিল ৪.৯

দেশে বিরাজমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা

আস্থা আছে	২০
আংশিক আস্থা আছে	২৮
আস্থা নাই	৫২

Dhaka University Institutional Repository

রেখ চিত্র ঃ ৪.৮

দেশে বিরাজমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা

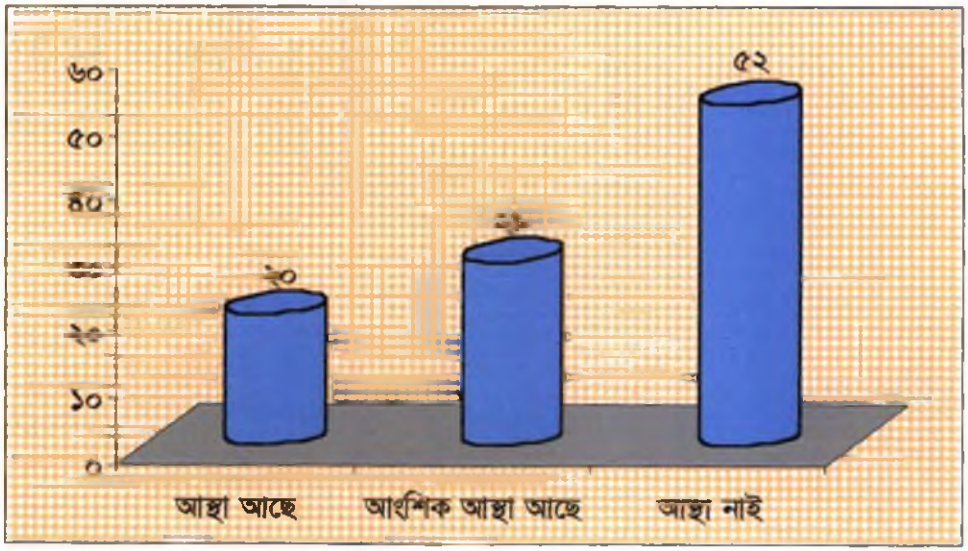

অপরদিকে ২৮% উত্তরদাতা দেশের বিরাজমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আংশিক আস্থার কথা বলেছেন। যাদের আস্থা নেই তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, যেখানে মানুষের দু'বেলা অন্নের নিশ্চয়তা নেই অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর এবং দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে তাদের নিকট গণতন্ত্র অর্থহীন। আস্থার কথা বলেছেন মাত্র ২০% লোক।

৪.৩.১৩ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করনের উপায়

নিম্নের টেবিলে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের উপর জনগণের প্রদত্ত মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হলো-

টেবিল ঃ ৪.১০

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করনের উপায়

উপায়	একমত পোষন কারীর রায়
নিরপেক্ষ নির্বাচন	৩৫%
পারস্পরিক সহনশীলতা	%
নিরপেক্ষ প্রশাসন	১২%
গঠনমূলক বিরোধীতা	৭%
গঠনমূলক রাজনীতি	২৬%
শিক্ষার প্রসার	২০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখ চিত্র ঃ ৪.৯

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করনের উপায়

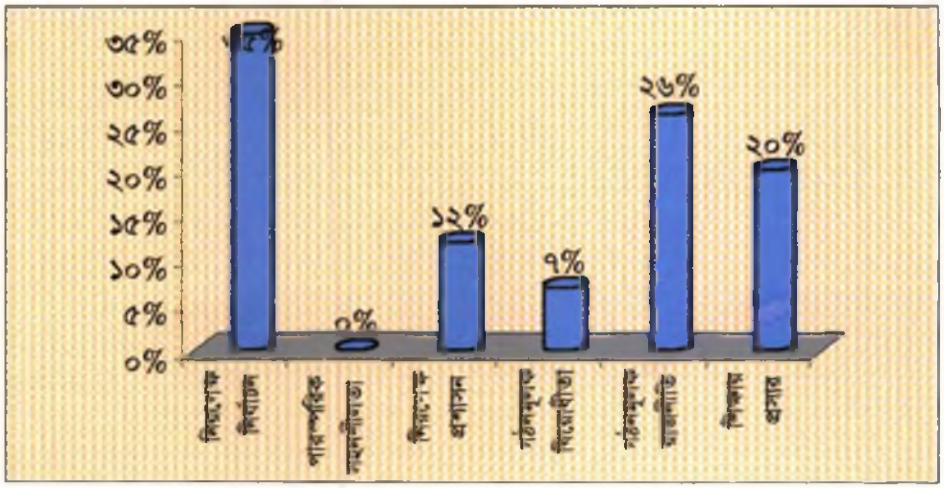

সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩৫%) উত্তরদাতা মনে করেন দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করনে ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নির্বাচন অত্যন্ত ফলপ্রসূ, এর পরে পর্যায়ক্রমে রয়েছে গঠনমূলক রাজনীতি (২৬%) ও শিক্ষার প্রসার (২০%)।

৪.৩.১৪ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে নিরপেক্ষতা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে বিভিন্ন বিষয়ে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত মতামতের হার টেবিলে প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ঃ ৪.১১

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে নিরপেক্ষতা

নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে	নিরপেক্ষ	আংশিক	নিরপেক্ষ নয়
দায়িত্ব পালনে	৮২%	১৪%	৪%
নির্বাচন কমিশন	৮২%	১১%	৭%
আমলাতন্ত্র	৬১%	২৮%	১১%
পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী	৬৮%	১৯%	১৩%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিল অনুযায়ী শতকরা ৮২ জন উত্তরদাতা মনে করেন দায়িত্ব পালনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীক নিরপেক্ষ থাকে, মাত্র ৭ ভাগের মতে এ সময় নির্বাচন কমিশনে নিরপেক্ষতা থাকেনা। ২৮ ভাগের মতে আমলারা আংশিক নিরপেক্ষ এবং ৬১ ভাগ নিরপেক্ষ থাকে বলে মনে করেন।

৪.৩.১৫ নির্বাচনী ফলাফল গ্রহণের হার

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনো নীচের দিকের স্তরেই রয়েছে। পরাজয়কে হাসি মুখে মেনে নেয়া, জনগণের ম্যান্ডেটকে সম্মান জানানো এবং বিজয়ী প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানানোর রেওয়াজ চালু না হলেও শতকরা ৯২ ভাগের মতে নির্বাচনী ফলাফল গ্রহণের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। যদিও নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার তাৎক্ষনিক প্রভাবে নেতিবাচক আচরণ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা মেনে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা বিগত কয়েকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে পরাজিত দল প্রধানের কথা উল্লেখ করেছেন। ৯১ এর নির্বাচনের পর পরাজিত দলের প্রধান সুক্ষ্য কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ উপস্থাপন করেন, ৯৬ এর নির্বাচনে পরাজিত দলের দলনেত্রী নির্বাচনী ফলাফলকে পুকুরচুরি এবং ২০০১ এর নির্বাচনে পরাজিতের স্থুল কারচূপির অভিযোগ উত্থাপন সত্ত্বেও পরাজিত দলগুলো ফলাফল মেনে নিয়ে সংসদে যোগ দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ সংবিধান/আইনবিশেষজ্ঞদের মতামত বিশ্লেষণ

অধিকাংশ সংবিধান আইন বিশেষজ্ঞই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন।

৪.৪.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রকৃতি নিয়ে আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রকৃতি নিয়ে আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দ্বিমত দেখা গেছে, একদলের মতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি অগণতান্ত্রিক অনির্বাচিত সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচন নৈতিক নয়। অপরদলের মতে নৈতিকতার চেয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন করে এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অতএব এ ব্যবস্থা গ্রহনযোগ্য।

৪.৪.২ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ

সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদ নিয়েও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীরা একাধিক মতামত প্রকাশ করেন। প্রশ্নমালা বিশ্লেষণে দেখা যায় সাক্ষাৎকার দানকারী ৪ জন আইনজীবীর মধ্যে ৩ জন আইনজীবী তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী মনে করেনা। শুধুমাত্র একজন আইনজীবী তত্ত্বাবাধায়ক সরকার ধারণাকে সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি মনে করেন। পূর্বে উল্লেখিত ৩ জন আইনজীবীর মতে- যেহেতু তা কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে, জাতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান কালীন সময়ের জন্য এ সরকার কাজ করবে, দেশ শাসনে বা রাষ্ট্রের পলিসি নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে এ সরকারের কোন ভূমিকা না থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নয়। অপরপক্ষে ১ জন আইনজীবী বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের মৌলনীতির পরিপন্থী। অর্থাৎ নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনায় সংবিধানের ঘোষণা রয়েছে যা কোন গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এ ধারণা অজ্ঞাত।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগতভিত্তি

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত ভিত্তির ক্ষেত্রে অধিকাংশই পক্ষে মতামত দিয়েছেন। মতামতদানকারীরা বলেন- সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত ভিত্তি রূপ লাভ করে। অধিকাংশ আইনজীবী উল্লেখ করেন- সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৮, ৪৮ এবং ৫৬ অনুচ্ছেদের কোন সংশোধন হয়নি। ফলে এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোতে প্রভাব ফেলেনি। যার ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্র একদিকে যেমন সংহত হয়েছে অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত ভিত্তিও রূপলাভ করেছে। যার জন্যে গণভোটের প্রয়োজন হয়নি।

৪.৪.৪ সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী সংযোজন

বেশিরভাগ সংবিধান বিশেষজ্ঞ/আইনজীবীই মনে করেন সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি সংযোজন সংবিধানের প্রকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করলেও এতে সংবিধান লংঘিত হয়নি। কিন্তু অল্পসংখ্যক আইনজ্ঞ এর বিরোধীতা করে বলেছেন এতে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। জনগণের সরকার নির্বাচনের অধিকার এর সাথে সাথে সংবিধানেরও লংঘন ঘটেছে।

৪.৪.৫ নির্বাচনী অনিয়ম দূরীকরণে

মতামতদানকারী সংবিধান বিশেষজ্ঞদের ৬০ ভাগ মনে করেন নির্বাচনী অনিয়ম দূরীকরণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহ ছিল আইনসম্মত। অপরদিকে ৩০ ভাগ মনে করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তাদের কর্মকান্ড অনেকটাই যুক্তিসম্মত। কেননা সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার শপথ গ্রহণের দিনে ৫৩ জন আমলাকে বদলির আদেশ দিয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত উপাচার্যদেরও পরিবর্তন করেছিলেন।

৪.৪.৬ এ ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করার পদক্ষেপ

বেশির ভাগ আইন বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, এ ব্যবস্থাকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। তাদের মতে নির্বাচনকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী রাষ্ট্রপতির অধীনে না রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে থাকা উচিত। এছাড়া দেশের জরুরী

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকা উচিত। নির্বাচন কমিশনের উপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়েও আইনজ্ঞরা তাদের মতামত দিয়েছিলেন। তাদের মতে বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম ভাগ নির্বাচন শীর্ষক অধ্যায়ের অধীনে নির্বাচন কমিশন গঠিত পরিচালিত হয়। সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ দান করেন। যেহেতু সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশন সদস্য নিয়োগ দলীয় ভাবে সাংসদদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির নির্দেশে হয়, সে ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কালে এ কমিশন নিরপেক্ষ নাও থাকতে পারে। সংবিধান অনুযায়ী ৪৮ (৩) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে "এই সংবিধানের ৫৬ নং অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫(১) ধারা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন।" এক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার দলীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের লোককেই প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেন। তাই এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন পুনগঠনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে দেয়া উচিত।

৪.৪.৭ সংবিধানের ১২০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

সংবিধানের ১২০নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হবে সেরূপ কর্মচরী প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী প্রদানের ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টার হাতে অর্পন করা সমীচীন।

১২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতে নির্বাচন কমিশন দলীয় সরকারের অধীনে যে কোন নির্বাচন আয়োজনে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবহেলার স্বীকার হয়। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ করা সত্য একজন প্রার্থীকে তার দলীয় প্রতীক নিয়োগকৃত রিটার্নিং অফিসার প্রদান করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনের কোন সিদ্ধান্তকে অমান্য করার দৃষ্টতা দেখাতে পারে না।

৪.৪.৮ নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব

আইন বিশেষজ্ঞদের নিকট নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে মতামতদানকারী শতকরা ৮০ জনই বলেছেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বাকী শতকরা ২৫ জন এই দায়িত্বের বাইরে সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সংবিধানের ৫৮ঘ অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব কি হওয়া উচিত তা উল্লেখ রয়েছে। তা হলো ৫৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক, সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হবে নির্বাচন কমিশনকে সেরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করবেন।

৪.৪.৯ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

আইন বিশেষজ্ঞরা সংবিধানের (৫৮৬) ধারার সমালোচনা করে বলেছেন, এ ধারার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আইন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সকল বিষয়ে না হলেও নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহন বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৪.৪.১০ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহন ও অপসারন

আইন বিশেষজ্ঞবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালনে কিছু আইনী সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। এ সময় তারা দেশ পরিচালনার ব্যাপারে জরুরী প্রয়োজনে কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। কিংবা নির্বাচনে প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়োগে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনী সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন আইন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগের পর যদি তাদের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয় তবে তাদেরকে অপসারণের সুনির্দিষ্ট বিধি নাই বা থাকলেও তা স্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারে নতুন আইন প্রনয়ন করা উচিত।

৪.৪.১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর জনগণের ম্যান্ডেট

একটি নির্বাচিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ভেঙ্গে দেবার পর অগণতান্ত্রিক (অনির্বাচিত প্রতিনিধি) একটি সরকার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জনগণের ম্যান্ডেট আছে কি না এ বিষয়ে আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মাঝে বির্তক পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকাংশের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনির্বাচিত সরকার হলেও তাদের জনগণের ম্যান্ডেট রয়েছে। কেননা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছিল অর্থাৎ জনগণ ও রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিই এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। যার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে জনগণের পরোক্ষ ম্যান্ডেট রয়েছে।

৪.৪.১২ ত্রয়োদশ সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ

অপরদিকে একদল আইন বিশেষজ্ঞ এর বিরোধীতা করেন এবং ত্রয়োদশ সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের কথা উল্লেখ করেন। সংবিধানের ৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক এবং ১১ নং অনুচ্ছেদেও তা রয়েছে।

প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। একদল আইন বিশেষজ্ঞের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেনা বিধায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ থাকেনা। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী বলে তারা অভিমত প্রদান করেন। তাছাড়া সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার সরাসরি সংসদ তথা জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধ থাকেন, কিন্তু জনগণের নিকট নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প রয়েছে কিনা-এ প্রশ্নের ক্ষেত্রে ৬৬ ভাগ আইনজ্ঞের মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর কোন বিকল্প নাই। অপরদিকে ৪৪ ভাগের মতে বিকল্প রয়েছে। তারা বিকল্প হিসেবে স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীরণ, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, ইত্যাদিকে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ দায়িত্ব পালনকারী সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার সদস্যদের মতামত

আলোচ্য গবেষণার জন্য ১০ জন দায়িত্ব পালনকারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্যদের মতামত নেয়া হয়েছে মূলত দায়িত্ব পালনে তারা কি রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তাদের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে তাদের প্রদত্ত মতামত তুলে ধরা হলো

উত্তরদানকারী ৮০% তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্যদের মতামতনুযায়ী নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। ২০% ভাগ মনে করেন দেশের জনগণের সার্বিক অবস্থা পরিবর্তন (জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা দরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্রতা দূরীকরণ) ব্যতীত কোন ব্যবস্থার অধীনে সঠিক সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয়।

শতকরা ৪০% ভাগ সদস্য দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কেননা এক একজন উপদেষ্টার অধীনে একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থাকাতে, অধীনস্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহের রুটিন ওয়ার্ক করা সমস্যা জনক হয়ে পড়ে। এর জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয় ক্ষমতা ত্যাগের পূর্বে পূর্ববর্তী দলীয় সরকার প্রশাসনে সর্বস্তরে নিজস্ব পছন্দনুযায়ী ব্যক্তিবর্গ তথা আমলাকে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়নে তাদেরকে বিশাল সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আইনী সীমাবদ্ধতার জন্য অনেক ব্যবস্থা গ্রহণে তারা অসহায় বোধ করেন।

নিম্নোক্ত রেখচিত্র অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্যদের মতে এদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা সমূহ হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ঃ ৪.১০

নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাঁধা

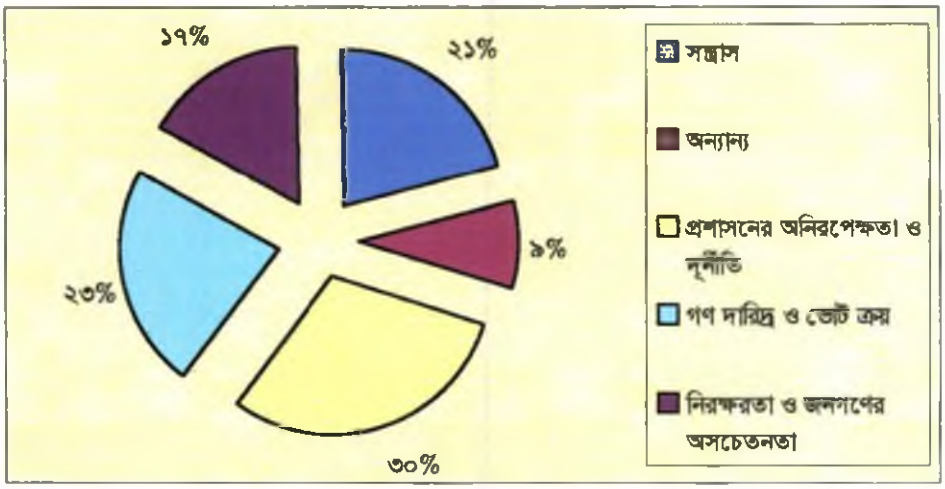

উপরোক্ত রেখাচিত্র অনুযায়ী শতকরা ৩০% ভাগ মনে করেন এদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে প্রধান বাঁধা হচ্ছে প্রশাসনের দুর্নীতি ও অনিরপেক্ষতা, ২৩% মনে করেন এ বাঁধা হচ্ছে গণদারিদ্র ও প্রার্থী কর্তৃক ভোট ক্রয়, ১৭% এর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও জনগণের অসচেতনতা এবং ২১% মনে করেন সন্ত্রাস নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে বাঁধা হিসেবে কাজ করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আরো শক্তিশালী করনে কিছু আইনী সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের হাতে অর্পনের কথা বলেছেন।

অধিকাংশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সদস্য দায়িত্ব পালন কালে তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা যে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন-২০০১ এ তারা সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে নির্দেশ মালা বাস্তবায়নে সমস্যায় পড়েন, কেননা বিষয়টি নীতিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে, যা তারা নিতে পারেন না। আবার অপরদিকে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অমান্য আদালত অবমাননার শামিল। এছাড়াও তারা যে সকল সমস্যার কথা বলেছেন তা হচ্ছে নীতিগত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সীমাবদ্ধতা, সাধারণ জনগণের বিশাল প্রত্যাশা একটি নৈতিক চাপ হিসেবে কাজ করেছে। অনেকক্ষেত্রে প্রশাসনের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেননি যা তাদের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। যে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সন্ত্রাস নির্মূলে পুরোপুরি সফল না হওয়া ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী বর্তমান বা সাবেক সাংসদ, বর্তমান বা সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সদস্য ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মতামত

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার উদ্ভব কেন হয়েছিল- এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন নেতা, উত্তরদাতা ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছেন। অধিকাংশ আওয়ামীলীগ, জামায়াতে ইসলামী ও বাম দলসমূহের সদস্যদের মতে দেশে প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার উপর জনগণ আস্থা হারাতে বসেছিল বলেই এ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। আওয়ামী লীগের মতে, (৯১-৯৬) সংসদে মাগুরা উপনির্বাচনে ক্ষমাসীন দল কর্তৃক ব্যাপক কারচুপির ফলে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হই যে দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই আমরা ব্যাপক আন্দোলন করে ভোটের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কায়েম করি। অপরপক্ষে অধিকাংশ বিএনপি নেতা, সাংসদ, মন্ত্রীর মতে আমরা জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আমাদের দলীয় নীতি বহুদলীয় গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করার জন্য এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করি।

তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ নির্বাচন ও দেশ পরিচালনায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলীয় নেতৃবৃন্দই ইতিবাচক মনোভাব পোষন করেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার তারা বিশেষ কোন প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টা সমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও উত্থাপন করেছেন যে তাদের অনেক কর্মকান্ড সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না।

৪.৬.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষ বিষয়ক মতামত

অধিকাংশ উত্তরদাতাই মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব পালনে নিরপেক্ষ, কিন্তু এ নিরপেক্ষতার মাত্রা নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন দলীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ।

দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণার উদ্ভব প্রসঙ্গে বলেছিলেন, শিশু ও পাগল ছাড়া কোন ব্যক্তিই নিরপেক্ষ নয়। দার্শনিক দৃষ্টি কোন থেকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় ব্যক্তি পর্যায়ে সকল ব্যক্তিরই নিজস্ব মতাদর্শ থাকে আবার সকল উপদেষ্টা ভোট প্রদান করেন। ভোটে তারা কোন না কোন ব্যক্তি বা দলকে ভোট দেন। অতএব, দার্শনিক দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তির পক্ষেই একশত ভাগ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে পরাজয়ের পর পরাজিত দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যেরূপ বর্তমান সংসদ নির্বাচনের পর পরাজিত দল বলেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করেছিল। কিন্তু সামষ্টিক অর্থে অর্পিত দায়িত্ব পালনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ বলে ৯০% ভাগ উত্তরদাতাই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৪.৬.২ নির্বাচন আয়োজনের সময়সীমা

নির্বাচন আয়োজনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বেঁধে দেয়া সময় সীমাকে শতকরা ৯৫% ভাগ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই পর্যাপ্ত মনে করেন। কিন্তু উত্তরদানকারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে ৭০% ভাগ এ সময়সীমাকে অপর্যাপ্ত মনে করেন।

অধিকাংশ (৬৮%) রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃষ্টিতে দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অপরদিকে, ৩২ ভাগ উত্তর দাতা মৌলিক পার্থক্য খুজে পাননি। অধিকাংশ উত্তরদাতার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটদানে জনগণ থাকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রায়। সকল দলই নির্বাচনে অংশ নেয় নির্বাচন বর্জন হয় না, ভোট প্রদানের হার বাড়ে, প্রার্থীর সংখ্যাও বেশী থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৪.১২

দলীয় সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাল	নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিকদল	ভোটের হার %	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	মন্তব্য
১৯৮৬	১৫২৭	২৮	৬০.৩১%	-	দলীয় সরকারের অধীনে
১৯৮৮	১১২০	৯	৫৪.৯৩%	১৮	ঐ
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬	১৯৮৭	৪২	২৬.৭৪%	৪৯	ঐ
১৯৯১	৩৮৫৫	৭৫	৫৫.৪৫%	-	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে
১২ জুন ১৯৯৬	৩০৯৩	৮১	৭৫.৬০%	-	ঐ
১ অক্টোবর ২০০১	২৫৬৩	৫৫	৭৫.৫৯%	-	ঐ

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ঢাকা।

বিশ্লেষণ (টেবিল ৪.১২) করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মতামত দানকারী যে মন্তব্য করেছেন তা টেবিলের সারণীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে একদিকে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি যেমন কম থাকে অন্যদিকে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যাও তুলনামূলক ভাবে থাকে অনেক কম। উল্লেখ্য যে, দলীয় সরকারের অধীনে ভোটের শতকরা হার ছিল সর্বনিম্ন অর্থাৎ ২৬.৭৪%। তাছাড়া আরেকটি বিষয় ব্যাপক ভাবে লক্ষ্যনীয় যে একমাত্র দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচনে অনেক প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় যা ছিল ইতিহাসে নজিরবিহীন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একদিকে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থী যেমন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিও সর্বাধিক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে ভোটের শতকরা হার ছিল অত্যন্ত সাফল্য জনক। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৭৫.৬০% যেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটাই প্রমানিত হয় যে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দলীয় প্রভাবই ব্যাপক লক্ষ্যনীয়, কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক আমলে যা সম্ভবপর নয়। যার ফলশ্রুতিতে দলীয় সরকারের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন গুলোতে জনগণের মধ্যে ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়।

তবে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রশাসনে ব্যাপক হারে বদলির আদেশ দান প্রশাসনে বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি করে।

৪.৬.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র যন্ত্রের নিরপেক্ষতা নিয়ে মতামত

টেবিল ঃ ৪.১৩

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কালে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসন পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী

নিম্নের টেবিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কালে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসন পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী

	নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে	
রাষ্ট্র যন্ত্র	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	দলীয় সরকার
প্রশাসন	৬৫%	৩৫%
পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	৮৬%	১৪%
নির্বাচন কমিশন	৯২%	৮%
প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার	৮২%	১৮%

নির্বাচন কমিশন, প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে উত্তরদাতারা তাদের মতামত প্রদান করেছেন। শতকরা ৬৫% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে প্রশাসন নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, অপরদিকে মাত্র ৩৫% মনে করেন দলীয় সরকারের সময়কালে প্রশাসন কিছু নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৮৬% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, অপরদিকে মাত্র ১৪% ভাগ মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও পুলিশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

যাহোক, শতকরা ৯২% জন উত্তরদাতা মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু দলীয় সরকারের সময় মাত্র ৮% উত্তরদাতা করেন যে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে দায়িত্বপালন করতে পারেন। উত্তরদাতা তাদের মতামতে বলেছেন, যদিও সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, কিন্তু দলীয় সরকার নির্বাহী ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশনের উপর প্রভাব বিস্তার করে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনাকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার বা যেহেতু সরাসরি সরকারের অধীনে তাই সরকার তাদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাই বদলী, পদচ্যুতি ইত্যাদির ভয়ে তখন রিটার্নিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসাররা সরকারি নির্দেশ মেনে চলেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যে তাদের মধ্যে দায়িত্ব পালনে এ চাপ থাকে না বলে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

অপরদিকে, শতকরা ৮২% ভাগ উত্তরদাতা তাদের মতামতে বলেছেন যে, প্রিসাইডিং অফিসার কিংবা পোলিং অফিসার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় স্বাধীন নিরপেক্ষভাবে তাদের উপর অর্পিতদায়িত্ব পালন করতে পারে, কিন্তু দলীয় সরকারের সময় মাত্র ১৮% মনে করেন যে, তারা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ স্থানীয় সরকারের জন প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ

আলোচ্য গবেষণায় স্থানীয় সরকার বা লোকাল গভর্নমেন্টে দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচিত কমিশনার (১২ জন), ঢাকার নিকটবর্তী তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ৫ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য। সর্বমোট ২০ জন স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের জন্য ছাপানো প্রশ্নপত্রের আলোকে প্রদত্ত মতামত বিশ্লষণ করলে দেখা যায়।

৪.৭.১ স্থানীয় সরকার নির্বাচন

অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬০%) মনে করেন, বর্তমানে স্থানীয় নির্বাচন ব্যবস্থা সঠিক রয়েছে। অপরদিকে, ৪০% মনে করেন বর্তমান ব্যবস্থা সঠিক নয়, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

৪.৭.২ জাতীয় নির্বাচন

সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত মতামতে দেখা যায়,বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত বলে মতামত প্রকাশ করেছেন সকল উত্তরদাতা।

৪.৭.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত মতামতে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা (৭৫%) এর মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। অপরদিকে, ২৫% উত্তরদাতা মনে করেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত নির্বাচন কমিশনকে আরো সাহায্য সহযোগিতা করা। এছাড়া তারা মনে করেন সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা নেয়া প্রয়োজন।

৪.৭.৪ সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন

সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে ৭০ ভাগ উত্তরদাতাই মনে করেন নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন, ২০ ভাগ মনে করেন নির্বাচনের সময় সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা অপরিহার্য। অপরদিকে,

Dhaka University Institutional Repository

অবশিষ্ট ১০ ভাগ উত্তরদাতা সুষ্ঠ নির্বাচন আয়োজনে অধিক ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৪.৭.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবল ও দুর্বল দিক

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবল দিক হিসেবে উত্তর দাতারা (৬০%) নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সক্ষমতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন, এছাড়া ৪০% ভাগ উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনেই সবল দিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা তাদের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রের মান্য গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়, যা এ সরকারকে গ্রহনযোগ্য রূপ প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

অপরদিকে, রাষ্ট্রপতির এ সরকারের উপর প্রভাবকে দুর্বল দিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৬০% ভাগ উত্তরদাতা, যাইহোক ৪০% ভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে এ ব্যবস্থার দুর্বল দিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৪.৭.৬ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা

শতকরা ১০০ ভাগ উত্তরদাতাই মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মানুষের অধিক স্বতস্ফূর্ততা থাকে। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এ রকম স্বতঃস্ফূর্ততা পরিলক্ষিত হয় না বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৪.৭.৭ স্থানীয় সরকার নির্বাচন

একটি তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে এ বিষয়ে, শতকরা ৮০% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত নয়। এর পিছনের কারন অনুসন্ধানে দেখা যায় তারা সবাই ক্ষমাতসীন দলের ছত্রছায়ায় স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত হয়েছেন। অপরদিকে বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত বলে মতামত প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল্যায়ন

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মনোনীত ও অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শতকরা ৯৫% উত্তরদাতাই মনে করেন যে, দেশের বিরাজমান বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যথার্থ ও ফলপ্রসূ হয়েছে। অপরদিকে, মাত্র ৫% উত্তরদাতা মনে করেন এ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়।

৪.৭.৯ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা

১০০% উত্তরদাতাই এদেশের প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তারা মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। তাতে জনগনের ইচ্ছার প্রতিফলন ও ঘটবে। ফলে এ নির্বাচন সম্পর্কে জনগনের আস্থা বাড়বে এবং বিদেশেও গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

৪.৭.১০ দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দোষ ত্রুটি

উত্তরদাতা স্থানীয় সরকার সদস্যরা দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের নানাবিধ দোষত্রুটি তুলে ধরেছেন। শতকরা ৯০% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না। কেননা সরকার নির্বাচনের সময় প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে, ১০% উত্তরদাতা মনে করেন দলীয় সরকার ক্ষমতা না ছাড়ার জন্য চেষ্টা করে বিধায় এ নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না।

৪.৭.১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকর ধারণাটি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার কারণ

উত্তরদাতারা বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য একাধিক বিষয় তুলে ধরেছেন। অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনই এ ধারণার উৎপত্তি। তারা মনে করেন, বিগত ৩টি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সমূহ সম্পন্ন হওয়ায় বহিঃবিশ্বে এদেশের সুনাম হয়েছে। এছাড়া ভোটার দের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা রয়েছে এবং ভোটারগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীকে ভোট দিতে পেরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮ আলোচ্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ

আলোচ্য গবেষণায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনার জন্য বাংলাদেশের স্বনামধন্য ১০ জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে। সাক্ষাৎকারে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন বিষয় এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৪.৮.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভবের কারণ

সাক্ষাৎদাতা রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণাটি উদ্ভবের জন্য একাধিক কারণ চিহ্নিত করেছেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে-বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভব। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বার বার ব্যর্থ হওয়া, অর্থাৎ নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে না পারা, নির্বাচনে নজিরবিহীন দলীয় প্রভাব কাজে লাগান, নির্বাচনকালীন সময় প্রশাসন কে ক্ষমতাসীন দলের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করা, সর্বোপরি সরকারি ও বিরোধী দল সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ না থাকা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সামাজিক রাজনৈতিক কারণ এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন।

৪.৮.২ উন্নত বিশ্বের সাথে তুলনা

উন্নত বিশ্বে দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন সম্ভব হলেও এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন কেন প্রয়োজন। এ প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে-আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোই এর মূলকারণ। ২ জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রতিবেশী ভারতের উদাহরণ তুলে ধরে বলেছেন, ভারতে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে না কেন? এক্ষেত্রে তারা বলেছেন রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা। উন্নত বিশ্ব ভারত সহ গণতান্ত্রিক দেশ গুলোতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বহুদিন ধরে। এ দেশগুলো কখনোই সামরিক শাসনের অধীনে যায়নি। যার ফলে এদেশ গুলোতে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ বিকাশ লাভ করেছে। তাছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে এবং বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্রটাই ভিন্ন। এদেশের মানুষ সুদীর্ঘ কাল থেকেই ঔপনিবেশিক শাসন আর সামরিক শাসনের যাতাকলে নিস্পেশিত হয়েছে। দুর্নীতি প্রবেশ করেছে সমাজের প্রশাসনের রন্দ্রে রন্দ্রে।

Dhaka University Institutional Repository

বিচারবিভাগ ও নির্বাচন কমিশন এখনোও নির্বাহী বিভাগের অধীনে থাকায় পুরোপুরি স্বাধীন নয়। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার মোহ প্রবল। জনগণের রায়কে শ্রদ্ধা জানানর মনোভব এখনো গড়ে ওঠেনি। আর রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, সামরিক আমলে নির্বাচনে কারচুপি করে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে, সকল অবৈধ কর্য কলাপকে সংবিধানিক বৈধতা দান একটা রেওয়াজে পরিনত হয়েছিলো, সেই মানসিকতা আমরা কাটিয়ে ওঠতে পারিনি। ফলে এদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভব ঘটেছে।

৪.৮.৩ অনির্বাচিত সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক নির্বাচন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সবাই একবাক্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গণতন্ত্রের প্রশ্নে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় আব্রহাম লিংকনকে উদ্ধৃত করে বলেছেন।

'The Government of the people, by the people and for the people'- এ সংজ্ঞার সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারো অসামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা এ সরকার জনগণের জন্য হলেও জনগণের দ্বারা অর্থাৎ জনগণ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার নয়। তাই এসরকার গণতান্ত্রিক সরকার নয়।

অপরদিকে, আরেকদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ মতামতের বিরোধীতা করে বলেছন, যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত সরকার নয়, তথাপি এর সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে ম্যান্ডেট (ত্রয়োদশ সংশোধনী) দিয়েছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট অর্থাৎ পার্লামেন্টে আনীত সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে যেহেতু এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত তাই এ ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনির্বাচিত হলেও এ সরকারের সময় একমাত্র নির্বাচিত ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্রপতি বহাল থাকেন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু বলে গ্রহনযোগ্য হয়, তবে রয়ে গেছে কিছু বির্তক। এ বিতর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

Dhaka University Institutional Repository

ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ক্ষমতা কতটুকু?

খ) রাষ্ট্রপতির নিকট তারা কি পরিমান জবাবদিহি করবেন।

গ) ত্রয়োদেশ সংশোধনী ও সংবিধানের বিভিন্ন ধারার সামঞ্জস্যতা।

ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দেশ বা জাতি কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হলে যুদ্ধ পরিচালনা বা ঘোষণা কিভাবে হবে।

ঙ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিধি।

চ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর থাকে কিনা ?

ছ) ত্রয়োদশ সংশোধনীর পর আমাদের সংবিধানের মৌল কাঠামোতে কি পরিবর্তন হয়েছে?

জ) তত্ত্বাবধায়কের মেয়াদ কাল ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনে ব্যর্থ হলে কি হবে? ইত্যাদি

উপরোক্ত বিতর্ক সমূহ নিয়ে আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন নিম্নরূপ অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে তিনটি বিষয় নিশ্চিত করা অধিক জরুরী

১। নিরপেক্ষ, সৎ ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন

২। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করন

৩। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯ সংসদীয় নির্বাচন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের তুলানমূলক পর্যালোচনা ঃ সেকেন্ডারী উৎস (নির্বাচন কমিশন হতে প্রাপ্ত তথ্য)

বিগত সংসদ নির্বাচন সমূহ তুলনা করলে দেখা যায় ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ৩টি সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। বাকী ৫টি সংসদ নির্বাচন হয়েছিল দলীয় সরকারের অধীনে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯০ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থায় ৫ম সংসদ নির্বাচন, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদ এবং ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৬.১৪

এক নজরে সংসদীয় নির্বাচন (১৯৭৩-২০০১)

	১৯৭৩	১৯৭৯	১৯৮৬	১৯৮৮	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯৬	২০০১
	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৫ম সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৭ম সংসদ	৮ম সংসদ
সরকার পদ্ধতি	সংসদীয়	প্রেসিডেন্ট-সিয়াল	প্রেসিডেন্ট-সিয়াল	প্রেসিডেন্ট-সিয়াল	প্রেসিডেন্ট-সিয়াল	সংসদীয়	সংসদীয়	সংসদীয়
ক্ষমতাসীন দল	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জাতীয় পার্টি	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	বিএনপি	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	তত্ত্বাবধায়ক সরকার
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোঃ ইদ্রিস	বিচারপতি নুরুল ইসলাম	বিচারপতি এটিএম মাসুদ	বিচারপতি সুলতান হোসেন খান	বিচারপতি আবদুর রউফ	বিচারপতি সাদেক	জনাবআবু হেনা	এম. এ. সাইদ
নির্বাচনের তারিখ	৭ মার্চ, ৭৩	১৮ ফেব্রুঃ '৭৯	৭ মে, '৮৬	৩ মার্চ, '৮৮	২৭ ফেব্রুঃ, '৯১	১৫ ফেব্রুঃ, '৯৬	১২ জুন, '৯৬	১লা অক্টোঃ, '২০০১
কত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে	২৮৯	৩০০	৩০০	২৮১	৩০০	২৫২	৩০০	৩০০
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	১১	-	-	১৯	-	৪৮	-	-
নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও জোট	১৪	২৯	২৮	৮	৭৫	৪৩	৮১	৫৫
স্বতন্ত্রসহ মোট প্রার্থী	১০৯১	২১২৫	১৫২৭	৯৭৮	২৭২৮	১৪৫০	২৫৭৪	২৫৬৩
মোট ভোটার	৩৫২০৫৬৪২	৩৮৩৬৩৮৬৮	৪৭৯১২৪৪৩	৪৯৮৬৩৮২৯	৬২১৮১৭৪৩	৫৬১৬৩২৯৬	৫৬৮৮৭৫৮৮	৭৪৯৪৬৩৬৮
প্রাপ্ত ভোট	১৯৩২৯৬৮৩	১৯৬৭৬১২৪	২৮৫২৬৬৫০	২৮৮৭৩৫৪০	৩৪৪৭৭৮০৩	পাওয়া যায়নি	৪২৫৫২১৪৯	৫৬১৮৫৭০৪
দলীয় আসন সংখ্যা	আওয়ামী লীগ ২৯৩ অন্যান্য-৭	বিএনপি-২০৭ আঃ লীগ (মালেক)-৩৯ অন্যান্য-৫৪	জাতীয় পার্টি ১৫৩ আঃ-৭৬ অন্যান্য-৭১	জাতীয় পার্টি ২৫১ অন্যান্য-৪৯	বিএনপি-১৪০ আঃ লীগ-৮৮ অন্যান্য-৭২	বিএনপি-২৭৮ অন্যান্য-১১	আঃ লীগ-১৪৬ বিএনপি-১১৬ অন্যান্য-৩৮	বিএনপি-১৯৩ আঃ লীগ-৬২ অন্যান্য-৩৮
নির্বাচন কেন্দ্র	১৫০৮৪	২১৯০৫	২৩২৭৯	২২৩৯৩	২৪১৫৪	২১১০৬	২৫৯৫৭	২৯৯৭৮

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯.১ দলীয় সরকার ও নির্বাচন

লক্ষ্যনীয় ব্যপার হচ্ছে যে, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহের মাধমে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ যে দলের অধীনে নির্বাচন হয়েছে তারাই- সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে মানুষ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে বলে প্রতীয়মান হয়। আর এ কারনেই ক্ষমতার পরিবর্তন হয়ে নতুন দল ক্ষমতায় এসেছে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ নির্বাচনে সদ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকারী দল নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বিরোধী দলে স্থান পেয়েছে। নৃতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচনে মানুষ নিরপেক্ষভাবে তার রায় দিয়েছে। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় আমাদের দেশে সীমাহীন দূর্নীতি ও পর্বতসম সমস্যা বিদ্যমান যা রাতারাতি সংক্ষিপ্ত সময়ে পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। এদেশে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র সীমার নীচে বাসকরে নিরক্ষরতার আধারে নিমজ্জিত। দেখা যায় যে যখনই সরকার তার শাসনকালে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, আবার সরকারের অনেক সাফল্য থাকা সত্ত্বেও জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে ব্যাপক তফাৎ থাকার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দলীয় প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভোট প্রদানের সুযোগ পেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় জাতি সরাকারি দলকে স্মরণ করে দিয়েছে যে জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস। অন্ত তপক্ষে পাচ বছর পর সরকারের কৃতকর্মের মূল্যায়ন ব্যালটের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুযোগ জনগণের হাতে এসেছে। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি নিপাত করলে দেখা যায় যে ১ম সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ সনে আওয়ামী লীগের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ টির মধ্যে ২৯৩টি আসন লাভ করে, ২য় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯ সালে বিএনপির অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন বিএনপি ২০৭ টি আসন লাভ করে ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টির অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩ টি আসন, ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির অধীনে ৫ম সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৫১ টি আসন লাভ করে। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া সর্বশেষ সংসদীয় নির্বাচন হচ্ছে বিএনপির অধীনে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল ২৭৮টি আসন লাভ করে। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন প্রাপ্ত আসনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সব সময় ক্ষমতাসীন দল অধিকাংশ আসন লাভ করেছে। নির্বাচন যতটাই সুষ্ঠ হোক না কেন এতে ১ টি বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, নির্বাচন সমূহে সরকার তার প্রভাব বিস্তার করে প্রশাসনকে সরাসরি দলীয় স্বার্থে কাজ করিয়ে নির্বাচনী ফলাফল পক্ষে নিয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯.২ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সাংসদ

বিগত সংসদ নির্বাচন সমূহের দিকে দৃষ্টি নিপাত করলে দেখা যায়, এদেশের ইতিহাসে কেবলমাত্র দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া সংসদীয় নির্বাচন সমূহেই কোন আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এ ধরনের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কেউই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারেনি। অর্থাৎ এসময় প্রতিটি আসনেই একাধিক প্রার্থী নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছে এবং নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮টি সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৭৮ জন সাংসদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়, যার সবগুলোই হয় দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সকল সদস্যই দলীয় সদস্য। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সাংসদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের সময় প্রার্থী দলীয় প্রভাবও ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগ্রহী বা সম্ভাব্য প্রার্থীদের জোর করে, কৌশলে নির্বাচন থেকে সরে দাড়াতে বাধ্য করেছে। সর্বাধিক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে ৬ষ্ঠ সংসদে ৪৮ জন অপর দিকে ১ম সংসদে ১১ জন এবং ৪র্থ সংসদে ১৯ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

৪.৯.৩ আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা

টেবিল ঃ ৪.১৫

আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা

	দলীয় সরাকারের অধীনে নির্বাচন					তত্ত্বাবধায়ক সময়কাল		
	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৫ম সংসদ	৭ম সংসদ	৮ম সংসদ
	১৯৭৩	১৯৭৯	৮৬	৮৮	৯৬	১৯৯১	১৯৯৬	২০০১
মোট প্রার্থী	১০৯১	২১২৫	১৫২৭	৯৭৮	১৪৫০	২৭৮৭	২৫৭৪	২৫৬৩
আসনপ্রতি প্রার্থী সংখ্যা	৪	৭	৫	৩	৫	৯	৯	৯
গড়ে			৫				৯	

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ উপরোক্ত টেবিল ৪.১৩ থেকে দেখা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা বেশী থাকে। এবং দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রার্থীদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় এবং ভয়ভীতি কম থাকার কারনে এ সময়ে অধিক লোক নির্বাচনে অংশ নেয়। সার্বিক ভাবে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনু'ষ্ঠিত হওয়া সমস্ত নির্বাচন পর্যালোচনায় দেখা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আসন প্রতি প্রার্থী সংখ্যা ছিল গড়ে ৫জন করে অপরদিকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ জনে। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনের প্রতি অধিক আস্থার সৃষ্টি করেছে।

৪.৯.৪ নির্বাচন বর্জন

বিভিন্ন দল কর্তৃক নির্বাচন বর্জন তুলনা করলে দেখা যায় দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনেক বড় বড় দল নির্বাচন থেকে সরে এসেছে, নির্বাচন বর্জন করেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোন দলই নির্বাচন বর্জন করেনি। উল্লেখ্য দলগুলো পূর্ণ শক্তি নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ন হয়েছে। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখায়, ৪র্থ সংসদ নির্বাচনে বিএনপি, ৬ষ্ঠ সংসদ নির্বাচন আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য প্রধান দলসমূহ বর্জন করে। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাগ্রহনকারী সরকারের অধীনে পরবর্তী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উপ নির্বাচনসমুহ বিরোধী দল বর্জন করেছে। সর্বশেষ বর্তমান সরকারের সময়ে ঢাকা-১০ আসনে নির্বাচন তার প্রমান। দলীয় সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহের প্রতি বিরেধী দলের কোন আস্থা থাকে না। কেননা এতে সরকার তার প্রভাব বিস্তার করে জনগণের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্বীয়দলীয় প্রার্থীকে জিতিয়ে আনে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এ ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না। এ জন্য বলা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবার কারনেই নির্বাচন সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.৯.৫ ভোট কেন্দ্র সংখ্যা

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সুবিধাজনক স্থানে ভোটকেন্দ্র বিশেষ ভূমিকা রাখে। কেননা গ্রাম্য রাজনীতির আলোকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেখা যায় কোন চেয়ারম্যান প্রার্থীর নিজ বাড়ীর কাছের কেন্দ্রে তার দাপট বেশী থাকে এবং কেন্দ্র দখল বা অবৈধ ভোট দিয়ে নিজে অধিকাংশ ভোট

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। আবার যতবেশী ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হবে ততই জনগণের সুবিধা হবে এবং ভোট প্রদানের হার বাড়বে। অনেক ক্ষেত্রে দেখাযায় ভোট কেন্দ্র দূরে অবস্থিত হওয়াতে অনেক ভোট দিতে যান না। এখন তুলনামূলক ভাবে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যার হিসাব করলে দেখা যায় দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহের তুলনায় তত্ত্বাবধয়ক সরকারের সময় নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল বেশী। নিম্নের রেখ চিত্রে দেখা যায়, তত্ত্বাবধয়ক সরকারের সময় কালে ভোট কেন্দ্র সংখ্যা সর্বাধিক। গ্রাফটিতে ভোটকেন্দ্র সংখ্যা কখনই এক থাকেনি বেড়েছে বা কমেছে। দলীয় সরকারের অধীনে দেখা যায় এ রেখচিত্র কমেছে বা বেড়েছে। কিন্তু তত্ত্বাবধয়ক সরকারের সময় শুধুই বেড়েছে। ১ম সংসদের তুলনায় দ্বিতীয় সংসদে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে ৬৮২১টি দ্বিতীয় সংসদ থেকে তৃতীয় সংসদে বেড়েছে ১৩৭৪ টি কিন্তু ৪র্থ সংসদে এ সংখ্যা কমেছে ৮৮৬ টি। অপরদিকে তত্ত্বাবধয়ক সরকারের অধীনে ১ম নির্বাচন অর্থাৎ ৫ম সংসদ নির্বাচনে আবার ভোটকেন্দ্র বেড়েছে ১৭৫১টি কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে ভোটকেন্দ্র কমেছে ৩০৪০টি। আবার তত্ত্বাবাধায়ক সরকারের অধীনে ৭ম সংসদে বেড়েছে ৪৫৮১টি। সাধারণ জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিবছর যেহেতু ভোটার বাড়ছে সেহেতু ভোটকেন্দ্রও বাড়া স্বাভাবিক। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে এ সংখ্যা ২ বার কমেছে এবং বেড়েছে খুব কম। কিন্তু তত্ত্ববধায়ক সরকারের সময় প্রতিবারই এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যৌক্তিক ভাবে। এ কথা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, তত্ত্বাবধয়ক সরকার মানুষকে ভোটমুখী করতে ভোট কেন্দ্র বাড়িয়েছে। কিন্তু দলীয় সরকার নির্বাচনী ফলাফল নিজের অনুকুলে আনয়নে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়েছে।

৪.৯.৬ আসন প্রতি ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা

টেবিল ঃ ৪.১৬

আসন প্রতি ভোট কেন্দ্র

	[redacted] সরকারের সময়					তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়		
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৫ম সংসদ	৭ম সংসদ	৮ম সংসদ
ভোট কেন্দ্র	১৫০৮৪	২১৯০৫	২৩২৭৯	২২৩৯৩	২১১০৬	২৪১৫৪	২৫৯৫৭	২৯৯৭৮
আসনপ্রতি ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা	৫০	৭৩	৭৮	৭৫	৭১	৮১	৮৭	৯৯
গড়	৬৯					৮৪		

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র-৪.১১ (ক)

আসন প্রতি ভোট কেন্দ্র দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন

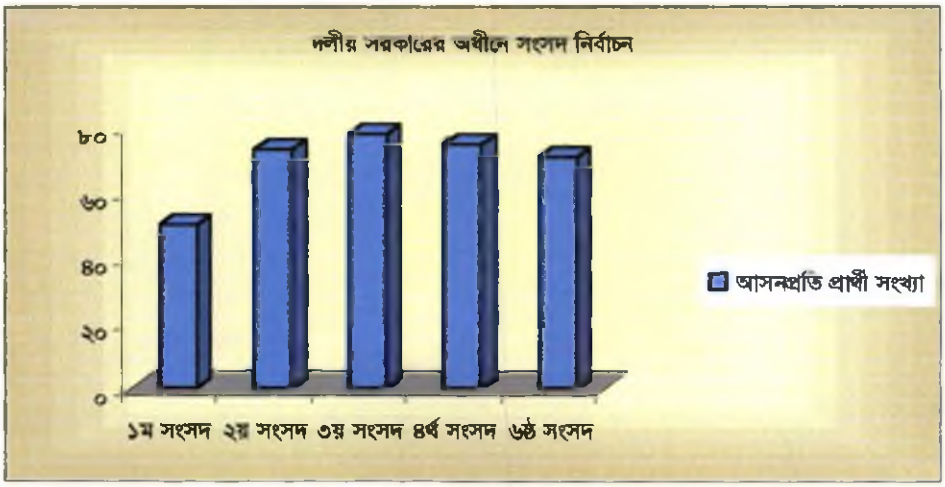

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

রেখচিত্র-৪.১১ (খ)

আসন প্রতি ভোট কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কাল

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

উপর্যুক্ত টেবিল ৪.১৬, রেখচিত্র ৪.১১ এর (ক) ও (খ) এ দেখা যায়, তুলনামূলক ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত নির্বাচনে আসন প্রতি ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল গড়ে ৮৯টি যেখানে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ছিল গড়ে ৬৯টি। এ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মানুষকে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে আকৃষ্ট করার জন্য অধিক কেন্দ্র স্থাপন চোখে পড়ে, যা সার্বিক তুলনায় দলীয় সরকারে অধীনে নির্বাচনের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনকে অধিক স্বচ্ছ বলে প্রনানিত করে।

৪.৯.৭ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দল ও জোট

নির্বাচন যতটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হবে, নির্বাচনে ততই অংশগ্রহণের হার বাড়বে। নির্বাচনের প্রতি দলগুলোর আস্থা বাড়লেই অধিক সংখ্যক দল নির্বাচনে অংশ নিবে।

টেবিল ঃ ৪.১৭

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও জোট সংখ্যা

	দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন					তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে		
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৫ম সংসদ	৭ম সংসদ	৮ম সংসদ
দল ও জোট সংখ্যা	১৪	২৯	২৮	৮	৪৩	৭৫	৮১	৫৫
গড়েভ	২৪টি					৭৩টি		

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

রেখচিত্র ঃ ৪.১২ (ক)

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও জোট সংখ্যা দলীয় সরকারের অধীনে

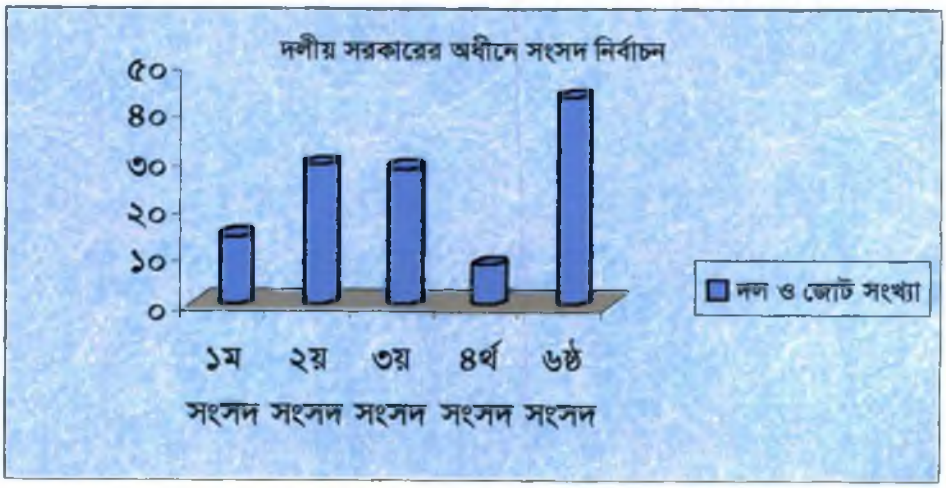

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ঃ ৪.১২ (খ)

নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী দল ও জোট সংখ্যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে

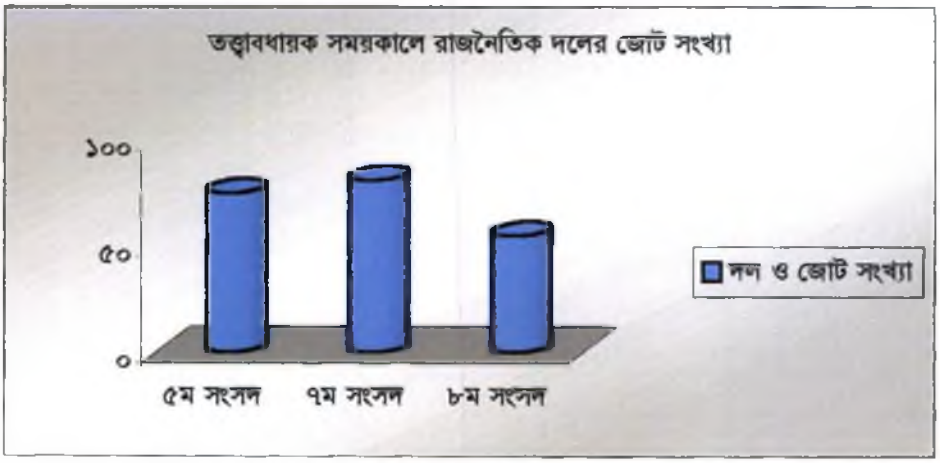

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী জোট ও দলের সংখ্যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত নির্বাচনের তুলনায় অনেক কম ছিল। দলীয় সরকারের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে ৩ গুনেরও বেশী সংখ্যক জোট ও দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উপর্যুক্ত টেবিলে দেখা যায় সবচেয়ে কম সংখ্যক জোট ও দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, অংশগ্রহন করে মাত্র ৮টি দল ও জোট। অপরদিকে, সর্বোচ্চ জোট ও দল অংশ নেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮১টি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহনের মাত্রা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বেশী। এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণের বিচারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত নির্বাচন অধিক সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও ফলপ্রসু।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৪.১৮

নির্বাচনে মোট ভোটার ও প্রদত্ত ভোটের হার

	দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন					তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে		
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১ম সংসদ	২য় সংসদ	৩য় সংসদ	৪র্থ সংসদ	৬ষ্ঠ সংসদ	৫ম সংসদ	৭ম সংসদ	৮ম সংসদ
দল ও জোট সংখ্যা	১৪	২৯	২৮	৮	৪৩	৭৫	৮১	৫৫
মোট ভোটার	৩৫২০৫৬৪২	৩৮৭৮৯২৩৯	৪৭৮৭৬৯৭৯	৪৯৮৬৩৮২৯	৫৬১৪৯১৮২	৬২১৮১৭৪৩	৫৬৮৮৭৫৮৮	৭৪৯৪৬৩৬৮
প্রদত্ত ভোটের হার	৫৪.৯১%	৫১.২৯%	৫৯.৫৪%	৫৭.৯০%	পাওয়া যায় নি	৫৫.৪৫%	৭৪.৮%	৭৫.৫৯%
সার্বিক হার			৫৫.৯১%				৬৮.৬১%	

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

উপর্যুক্ত টেবিলে দেখা যায় প্রতি নির্বাচনে স্বাভাবিক নিয়মে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে এবং প্রতি নির্বাচনেই ভোট প্রদানের হারে তারতম্য দেখা যায়। তবে তুলনামূলক বিচারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এ হার সর্বাধিক। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বনিম্ন ভোট প্রদানের হার (৫১.২৯%) ছিল ২য় সংসদ নির্বাচনে এবং সর্বাধিক ছিল ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৫.৫৯%। দেখা যাচ্ছে দলীয় সরকারের অধীনে মানুষের ভোট প্রদানের হার নির্দিষ্ট ধারায় বৃদ্ধি পায় নাই, সকল নির্বাচনের ক্ষেত্রেই এ হার ৬০% এর নীচে। অপর দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পর্যায়ক্রমে ভোট প্রদানের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকে প্রমানিত হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটাররা অধিক হারে ভোট প্রদান করে কেননা তারা মনে করে, এ সময় তুলনামূলক ভাবে নির্বাচন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব

সাধরণ নির্বাচনের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা সহ সকল ব্যবস্থায় অন্যান্য সময়ের তুলনায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। মৌলিক কিছু ব্যবস্থার পরিবর্তন (যা করা সম্ভব নয়) না হলেও গণ মাধ্যমে ও জনতার জীবন ধারণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে দেশের বেশীর ভাগ জনগণের নিকট সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন অনুভূত হয়। পরিবর্তন সমূহ সুস্পষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপস্থিতি প্রকাশ করে। তাই আলোচ্য গবেষণায় তথ্যাবলী পর্যালোচনা তথা গণমাধ্যমের তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে জনজীবন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার গ্রহনের ফলাফলের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনগণের মতামতের আলোকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব নিরূপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। নিম্নে এ প্রভাব সমূহ আলোচত হলো।

৪.১০.১ সাধারণ মানুষের জীবন ধারা

জনগণের মতামত জরীপে দেখা যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনধারাকেও প্রভাবিত করে, দলীয় সরাকরের অধীনে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার কর্মীদের সাধারণ মানুষ ভয় পায়, তারা আইনের আশ্রয় পর্যন্ত নিতে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে ক্ষমতাশীন দলের ক্যাডারদের চাঁদাবাজী টেন্ডারবাজি মাস্তানির কারনে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, ব্যবসায়ী কন্ট্রাক্টরা ভয়ে থাকেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তাদের মাঝে এ ভয় থাকে না, ফলে তারা অনকটা স্বস্তিতে জীবন ধারণ করতে পারে।

৪.১০.২ সরকারি কর্মকর্তাদের চাপ বিহীন দায়িত্ব পালন

অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সরকারি কর্মকর্তারা অনেকটা চাপবিহীন, নির্ভয়ে, স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দলীয় সরকারের অীধনে তারা তা পারে না। কেননা এতে তাদের বদলী, পদচ্যুতি ইত্যাদির আশংকা থাকে। ফলে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদেরকে সমীহ করে চলা লাগে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০.৩ গণ মাধ্যমের প্রচারনার ধরণ পরিবর্তন

অন্যান্য সরকারের সময়কালের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এলে দেশের গণমাধ্যম গুলোর প্রচারণার প্রকৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের গণমাধ্যমের উপরেও বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। অন্যান্য সময় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে দেশের সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থা সমূহের সংবাদ পরিবেশনের বাস্তব ফোকাসে ও পরিবর্তন সাধিত হয়। দেশের ৮টি বাংলা ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকা (ইত্তেফাক, ইনকিলাব, আজকের কাগজ, যুগান্তর, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, দিনকাল, সংবাদ পত্রিকা) এবং ৩টি (দি ডেইলি ষ্টার, দি ইনডিপেনডেন্ট ও বাঙলাদেশ অবজারভার) দৈনিক ইংরেজী পত্রিকায় বিভিন্ন পৃষ্ঠায় পরিবেশিত এবং গুরত্বের সাথে প্রকাশিত সংবাদ সমূহের গুনগত পর্যালোচনায় ও তা স্পষ্ট দেখা গেছে।

এ ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলোর সংবাদের বিষয়বস্তু, পত্রিকার Headline/Head News প্রথম পৃষ্টায় পরিবেশিত সংবাদের হার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমূহের সময়কালে পত্রিকা সমূহের প্রকাশিত head news এর মধ্যে ৮৫% ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও এর কর্মকান্ড এবং নির্বাচন সংক্রান্ত। অবশিষ্ট অংশের মধ্যে ১০ ভাগ ছিল আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রসঙ্গ এবং ৫ভাগ ছিল অন্যান্য ধরনের।

অর্থাৎ প্রতিটি পত্রিকাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে। পত্রিকাসমূহের সম্পাদকীয় বিষয় অনুযায়ী সংখ্যা হিসাব করে দেখা গেছে, দৈনিক বাংলা পত্রিকায় গড়ে শতকরা ৮০ ভাগই ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে ২৫ ভাগ ছিল সন্ত্রাস, দেশের বিরাজমান অবস্থা সংক্রান্ত এবং বাকী ৫% ছিল আন্তর্জাতিক বিশ্ব সংক্রান্ত।

অপরদিকে, দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা সমূহের সম্পাদকীয়র মধ্যে ৬০ ভাগ ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও আসন্ন নির্বাচন বিষয়ক ২১ ভাগ ছিল সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বিষয়ক এবং ১৯ ভাগ ছিল আন্তর্জাতিক সংবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকাসমূহে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ সমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১ম পৃষ্ঠার শতকরা ৬৫ ভাগ সংবাদই সরকারের ও এর কর্মকান্ড এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান দল সমূহের কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে প্রনীত হয়েছে।

তবে অন্যান্য সময়ে প্রকাশিত পত্রিকা সমূহের সংবাদের সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে প্রদেয় সংবাদের প্রাধান্যের ধরনের সাথে মৌলিক মিল পাওয়া গেছে। নির্বাচিত সরকারের শাসনামলে পত্রিকা সমূহে প্রতিদিনই প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী পরিষদের কর্মকান্ড ছবি সহ ছাপা হয়েছে। অপরদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সংবাদ একইভাবে প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো দলীয় সরাকরের শাসনামলে শতকরা ৮৪টি দিনেই প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকত পত্রিকার পাতায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ছবি ছিল গড়ে ৪০% ভাগ।

৪.১০.৪ বিটিভি ও সরকারি প্রচার মাধ্যম প্রভাব

দলীয় সরকারের সময়ে বাংলাদেশের টিলিভিশনের সংবাদ প্রচারের মধ্যে প্রাধান্য পায় সরকার ও ক্ষমতাশীল দলের কর্মকান্ড। অনেকে তখন টেলিভিশনকে দলীয় প্রচার মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ প্রচারের এ ধারা অনেকটা নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী বলে মনে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৪.১৯

নিরপেক্ষতার প্রশ্নে গণ-মাধ্যম

জনগণের মতামত জরীপে দেখা গেছে

মতামত	দলীয় শাসনামল			তত্ত্বাবধায়ক আমল		
	মনে করেন	মনে করেন না	নিরপেক্ষ	মনে করেন	মনে করেন না	নিরপেক্ষ
বিটিভির নিরপেক্ষতা	২৮	৬০	১২	৬৮	৩০	২
উদ্দেশ্য প্রনোদিত দলীয় প্রচার	৮২	১৩	৫	১২	৮৪	৪
বেশী মাত্রায় বিশেষ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দান ও তায় প্রচার	৯২	৭	১	২	৯০	৮
বেশী মাত্রায় সরকার প্রধানের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সংবাদ প্রচার	৭৭	২৩	-	৩২	৭৮	-
দলীয় স্বার্থে সরকারি প্রচার মাধ্যম ও বিটিভিকে ব্যবহার	৮৯	৭	৪	-	৯০	১০
সত্য সংবাদ প্রচার	৩৫	৩৫	৩০	৭৯	২০	১

উপর্যুক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় দলীয় শাসনামলে বেশির ভাগ জনগণই (৬০%) মনে করে বিটিভি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে না। মাত্র ২৮ ভাগ মনে করে বিটিভি নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠান, সংবাদ প্রচার করে। অপরদিকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৬৮%) জনগণ মনে করেন

Dhaka University Institutional Repository

বিটিভি পূর্বের তুলনায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। ৩০% ভাগ মনে করে বিটিভি তখনো পক্ষপাতদুষ্ট থাকে এবং ২% উত্তরদাতা উত্তরদানে বিরত ছিলেন।

দলীয় সরকারের শাসনামলে শতকরা ৮২ জন উত্তরদাতা মতামত প্রকাশ করে বলেছেন যে, এসময় বিটিভি উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে ক্ষমতাশীন দলের পক্ষে এবং বিরোধী দলকে হেয় করার সংবাদ প্রাচর করে। বিভিন্ন বিরোধী নেতা নেত্রীর বক্তব্যের অপপ্রচার চালানো হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিটিভির এ প্রবনতা অনেক কমে যায়। ৮৪ ভাগ জনগণই মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিটিভি বিশেষ কোন দলের হয়ে উদ্দেশ্য প্রনোদীত সংবাদ পরিবেশন করে না।

দলীয় সরকারের সময়ে শতকরা ৯২ ভাগ ব্যক্তির মতে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে তার বিশেষ প্রচার করা (সরকারি গণ মাধ্যমে) হয়। কিন্তু মাত্র ২% ভাগ উত্তর দাতা মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও বিশেষ কোন ব্যক্তি (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য বা সচিব) কে প্রাধান্য দেয়া হয়। অপরদিকে ৯০% উত্তরদাতা মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এ ধরনের কেন কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় না।

সরকারি প্রচার মাধ্যমে অধিক মাত্রায় সরকার প্রধানের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সংবাদ প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে শতকরা ৭৭ জনই মনে করেন দলীয় সরকারের সময় এ বিষয়টি প্রকট আকার ধারণ করে। অর্থাৎ দলীয় সরকারের আমলে সরকারের নির্দেশে অথবা সরকারের তোশামদ করার জন্য অধিক হারে সরকার প্রধানও সরকারের সদস্যদের সংবাদ প্রচার করা হয়। অপরদিকে শতকরা ৭৮ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সরকারি প্রচার মাধ্যমে সরকার প্রধানের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সংবাদ অধিক হারে প্রচার করা হয় না। অপরদিকে মাত্র ৩২ ভাগ উত্তরদাতা, মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে তোষামদী করার জন্য সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলো অধিক কাভারেজ প্রদান করে।

দলীয় স্বার্থে বিটিভি ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের ব্যবহারের উপর প্রদত্ত মতামতে দেখা যায় শতকরা ৮৯ ভাগ জনগণ মনে করেন দলীয় সরকার তার দলীয় স্বার্থে, অনেকক্ষেত্রে বিরোধী দলকে ঘায়েল করার জন্য সরকারি প্রচার মাধ্যমে ও বিটিভিকে ব্যবহার করেন। কিন্তু কোন উত্তরদাতই মনে করেন

Dhaka University Institutional Repository

না যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সরকারি প্রচার মাধ্যমে ও বিটিভিকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের কোন সুযোগ আছে। ৯০% জানিয়েছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিটিভি ও সরকারি প্রচার মাধ্যম দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হয় না।

সরকারি প্রচারমাধ্যম ও বিটিভিতে সত্য সংবাদ প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে শতকরা ৭৯ ভাগ মতামত দানকারীই মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিটিভি ও সরকারি প্রচার মাধ্যম সত্য সংবাদ প্রচার করে। অপরদিকে মাত্র ৩৫ ভাগ মনে করে দলীয় সরকারের সময় সরকারি প্রচার মাধ্যম সমূহের সত্য সংবাদ প্রাচরের সুযোগ আছে।

উপর্যুক্ত মতামত থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, সরকারি প্রচার মাধ্যম সমূহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। অপরদিকে ৩% উত্তরদাতা উত্তরদান থেকে বিরত ছিলেন।

সকাল বেলাতেই ভোটকেন্দ্রে যাবার প্রস্তুতি গ্রহন এ প্রশ্নের জবাবে মতামতদানকারী শতকরা ৮০ ভাগ জানিয়েছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তারা সকালেই ভোট দানে প্রস্তুতি নেন, অপর দিকে ১০ ভাগ তাদের মতামতে বলেছেন, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে তারা সকালেই ভোট প্রদানে প্রস্তুতি নেন। অর্থাৎ অধিকাংশ মাতমতদানকারী নির্বাচনকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। মতামতদানকারীদের মধ্যে শতকরা ৫৮ ভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছিলেন, মাত্র ৪০% দলীয় সরকারের অধীনে কোন সংসদীয় নির্বাচনে ভোট প্রদান করে ছিলেন এবং ২% কোনক্ষেত্রেই ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যান নি।

"ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে দেখা গেল যে ভোটটি দেয়া হয়ে গেছে" এধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী সংখ্যা দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। উত্তরদাতাদের প্রশ্নমালার মাধ্যমে মতামত জরীপে উত্তরদাতাদের ভোটার সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিলে-

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৪.২০

ভোট প্রদানে উৎসাহ

	তত্ত্বাবধায়ক সরকার	দলীয় সরকার	নিরপেক্ষ
নির্বাচনে ভোট প্রদান করার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ	৮৫%	১২%	৩%
সকাল থেকে ভোট কেন্দ্রে যাবার প্রস্তুতি	৮০%	১০%	১০%
ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিত না পারা, পূর্বেই ভোট দেওয়া হয়ে গেছে	২২%	৭৮%	-
ভোট প্রদানের হার বেশী থাকে	৮৮%	৯%	৩%
নিরপেক্ষ ভাবে ভোট দান করা যায়	৭৮%	৮%	১৪%
মহিলাদের উৎসাহ	৯১%	৯%	
নির্বাচনে ভোট দান	৭৮%	২০%	২%

সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণে নিম্নের ফলাফল পাওয়া যায়। মতামতদানকারী উত্তর দাতারা জানিয়েছেন যে, তাদের শতকরা ৮৫ ভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচনে ভোট প্রদানে উৎসাহ বোধ করেন। অপরদিকে, ১২% দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোট প্রদানে অধিক উৎসাহ বোধ করেন। শতকরা ৭৮ ভাগ দলীয় সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অপরদিকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন মাত্র ২২ ভাগ উত্তরদাতা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে জালভোট প্রদানের হার দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বেশী।

কোন সরকারের অধীন (দলীয় না নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক) ভোট প্রদানের হার বেশী থাকে- এ বিষয়ে মতামত প্রদান করতে গিয়ে শতকরা ৮৮ ভাগই বলেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার বেশী থাকে, অপরদিকে ৯% উত্তরদাতার এ হার দলীয় সরকারের অধীনে বেশী বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষভাবে ভোট প্রদান করা বিষয়ে শতকরা ৭৮ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিরপেক্ষভাবে ভোট প্রদান করা যায়। অপরদিকে, মাত্র ৮% মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষভাবে ভোট প্রদান করা যায়।

মহিলাদের উৎসাহের ক্ষেত্রে শতকরা ৯১ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরাকরের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মহিলাদের উৎসাহ বেশী থাকে, অপরদিকে, মাত্র ৯% মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে অুনষ্ঠিত নির্বাচনে মহিলাদের ভোট প্রদানে উৎসাহ বেশী থাকে।

উপর্যুক্ত মতামত সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অপেক্ষা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকেই সাধারণ মানুষ অধিক গ্রহনযোগ্য বলে মনে করেন। এ সময় ভোট প্রদানে তারা স্বস্তি বোধ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গণ-মাধ্যম ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়

গণ মাধ্যম ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

৫.১ ভূমিকা

গণ মাধ্যম তথা সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও প্রভৃতির সংবাদ ভাষ্য পর্যালোচনা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত ভাষ্য তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ের জন্য বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক, বেসরকারি টিভি ও রেডিও চ্যানেল এর ভাষ্য, সরকারি প্রচার মাধ্যমের ভাষ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরাকরের সফল ও দুর্বল দিক, গঠন কাঠামো ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১

❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ "পিছন ফিরে দেখা"।**

সংবাদ বিশ্লেষণ

৯১ এর ১ম নির্দলীয় সরকার এর অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতার মোহে পরবর্তী নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সাংবিধানিক রূপদানে অনীহা প্রকাশ করে। কিন্তু সম্মিলিত বিরোধীদল দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক রূপদান করে তার অধীনে নির্বাচনের দাবি করে। এ প্রতিবেদনে দেখা যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার এ দাবিতে বিএনপি সরকার ঘোরতর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানায়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে তার প্রতিটি বক্তৃতাতেই তখন বলতে শোনা যেত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বিকল্প হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার এ দাবি সংবিধান সম্মত নয়। কিংবা পাগলা এবং শিশু ছাড়া কেউই নিরপেক্ষ হতে পারে না। কোন কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষকও জানান, এভাবে শুধুমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অনাস্থা ও অসহিষ্ণুতাই প্রকট হয়ে উঠবে। তৎকালীন সরকারের এ আচরনে বিরোধীদলগুলো আন্দোলন শুরু করে। এ সময় তৎকালীন সরকারের ১ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ১টি জাতীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকার প্রদান করনে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো -

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ৪ নভেম্বর ১৯৯৪

❑ সংবাদ ভাষ্য ঃ সাক্ষাৎকার ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার

ব্যাপক জল্পনা কল্পনা, মন্ত্রিসভা থেকে অব্যাহতি, প্রথমে সাক্ষাৎকার প্রত্যাহার পরবর্তীতে নিজের সম্মতিতেই সাক্ষাৎকার ছাপানো হয়। সাবেক তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নামজুল হুদা ২ নভেম্বর ৯৪ দৈনিক ইত্তেফাকে এক সাক্ষাৎকার দিয়ে তা প্রত্যাহার করে নেন। পরদিন এ খবর পত্র পত্রিকায় ছাপা হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা হয়। ৫ নভেম্বর তাঁকে এজন্য মন্ত্রিসভা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। জানা যায়, সাবেক তথ্যমন্ত্রী তার নিজস্ব পরিকল্পনায় পুরো সাক্ষাৎকারটি কম্পিউটারে কম্পোজ করে ইত্তেফাকে সরবরাহ করেন। তাঁর সম্মতিক্রমেই পরে তা ইনকিলাবে ছাপা হয়। সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপঃ এটা অনস্বীকার্য যে, দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দেশকে সংকটমুক্ত রাখতে প্রধান দায়িত্ব সরকারের উপরই বর্তায়। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের দায়িত্বও এক্ষেত্রে কম নয়, বিশেষ করে যখন সংকট সৃষ্টি হয় বিরোধী দলের অনমনীয় মনোভাবের কারণে।

যা হোক, বাস্তবতা হচ্ছে, বিরোধী দল সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের কথা বলছে এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকাকরের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে দেশে একটি রাজনৈতিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যা এখন একটি রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছে। বলা যেতে পারে বিরোধী দলের একগুয়েমির কারণে। এ সংকট থেকে জাতিকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। সহিংস ধ্বংসাত্মক রাজনীতির কাছে জাতিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জিম্মি রাখার অধিকার কারো নেই। দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত মতামত প্রদানের অধিকার রয়েছে এবং এ মতামতের সাথে আমার দলের কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমি মনে করি, এ মতামতের ভিত্তিতে সরকারি দল ও বিরোধী দল অবশ্যই একটা সমাধানে আসতে পারে কোন বিদেশী সাহায্য ছাড়াই, তবে দলগুলোর দূরত্ব কমাতে কিংবা তাদেরকে আরো কাছাকাছি আনতে স্যার নিনিয়ান তার পূর্বের ভূমিকা এক্ষেত্রে রাখতে পারেন। আমার চিন্তা-ভাবনা নিম্নরূপ ঃ

১. বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার তার পূর্ণ মেয়াদ পালন করবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ জনগণের আস্থা এখনো বেগম খালেদা জিয়ার উপর আছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসদ ভেঙ্গে যাবে এবং দেশের শাসনভার সুপ্রীম কোর্টের এপিলেট ডিভিশনের হাতে ন্যস্ত হবে। প্রধান বিচারপতি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব এবং অন্য চারজন বিচারপতি কেবিনেট সদস্যের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহনের এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি নির্বাচন কমিশন নিয়োগদান করবেন এবং নব নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখবেন।

৪. পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক ৯০ দিনের। সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার তারিখ থেকে ৪০- ৫০ দিনের মধ্যে যে কোন একটি দিনে কিংবা পর্যায়ক্রমে কয়েকটি দিনে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

৫. নবনির্বাচিত পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই প্রধান বিচারপতির অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং এপিলেট ডিভিশন তার স্বীয় দায়িত্বে পরিপূর্ণভাবে ফিরে যাবেন।

৬. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব ডিভিশনের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বিষয় সমূহ বাস্তবায়িত করতে অবশ্যই সংবিধান সংশোধন করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদির সিদ্ধান্তের জন্য অবিলম্বে সংসদে আলোচনা শুরু করতে হবে। সংবিধানের জন্য গণভোট লাগবে। সকল দল যদি একমত হয় তাহলে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনকেই এ বিষয়ের উপর গণভোট হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

তিনি আরো বলেন রাজনীতিতে কোন শেষ কথা নেই। বিএনপি সব সময়েই জাতির জন্য যা কল্যাণকর, তারই স্বপক্ষে কাজ করেছে। এবারও যদি বিএনপি মনে করেন দেশকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচাতে এটাই সর্বোত্তম পথ- তাহলে অবশ্যই আমাদের দল গভীরভাবে এ বিষয়টি চিন্তা করবে।

দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে বিরোধী দলের আন্দোলনে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট কালে প্রকাশিত প্রতিবেদন।

❑ **সংবাদ ভাষ্যঃ** "চার্চিলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার, কংগ্রেস মুসলীম লীগের জাতীয় সরকার এবং কিছু সুপারিশ" নিবন্ধে দেখা যায়-

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন লিওনার্ড স্পেন্সার চার্চিলই সম্ভবত দুনিয়ার একমাত্র সার্থক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপকার। সময়টা ১৯৪৪ সালের হেমন্তকাল। ব্রিটেনের সংসদীয় দলগুলো, যারা যুদ্ধকালীন অস্থির পরিস্থিতির কারনে ৫ বছরের জন্য নির্বাচন বিরতির পক্ষে ছিলেন, তারা ভাবতে শুরু করলেন যে, জার্মান যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সাধারণ নির্বাচন হওয়া উচিত। চার্চিল অক্টোবরের শেষ দিকে কমন্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে বললেন, "We must look to the termination of the war against Nazism as a pointer which will fix the date of the election."

উল্লেখ্য যে, চার্চিল যখন এই ঘোষণা দিচ্ছিলেন তখন একজন মনোনীত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ৪বছর মেয়াদ অতিক্রম করেছেন। ইউলিয়াম ডগলাস হোম লিখেছে, 'In May. 1940. he replaced Chamberlain as Prime Minister and formed an all-party coalition committed to Victory at all costs'. (The Prime Ministers). ১৯৪০-এর এই সরকারটি ছিল কার্যত একটি জাতীয় সরকার। যাতে বিরোধী লেবার ও লিবারেল পার্টির সদস্যরা অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এ সরকার গঠিত হয় হিটলারের আগ্রাসনের মুখে, চেম্বার লেইনের কনজারভেটিব সরকাটি তখন কার্যত ঐ আগ্রাসনের ধাক্কায় হয়ে পড়েছিল টলটলায়মান। ব্রিটেনের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় সরকার গঠিত হয় ১৯৩১ সালে। ১৯৩১ ও ১৯৪০-এর দুই প্রেক্ষাপট থেকেই এই পর্বটি ভিন্ন এবং হয়তো বলা চলে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের কারণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লক্ষনীয় যে, ঐ দুটো ক্ষেত্রেই জাতীয় সরকার অথবা কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল রাজনীতিকদের অনিয়ন্ত্রণযোগ্য জাতীয় সঙ্কট মোকাবিলা করার অনিবার্য প্রয়োজনে। কিন্তু ১৯৪৫ সালের মে মাসে চার্চিল যা করলেন তা ছিল খুব সম্ভবত শুধুই প্রভাবমুক্ত নির্বাচন করার জন্য। বাংলাদেশে বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি উঠেছে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। আর এ রকম এক সাধরণ নির্বাচনকে সামনে রেখে উইনষ্টন চার্চিল পদত্যাগ করেন এবং বিরোধী দল সমন্বয়ে আক্ষরিক অর্থেই একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকর গঠন করেন।

এবারে দৃষ্টি ফেরানো যাক আমাদের উপমহাদেশের রাজনীতির দিকে। সেখানে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের ভূরি ভূরি উদাহরণ ছাড়াও একটি জাতীয় সরকার গঠনের ইতিহাস রয়েছে। ১৯৪২-৪৭,

Dhaka University Institutional Repository

একটি অসাম্প্রদায়িক অবিভক্ত ভারত ভূমির জন্য ব্রিটিশদের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়াই ছিল এই সময়ের রাজনীতির মূল উপপাদ্য।

১৯৪৬-এর সিমলা কনফারেন্সে নেহেরু-জিন্নাহ একজন 'আম্পায়ার' (নির্দলীয় ব্যক্তি) নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সফল হতে পারেননি।

সাম্প্রতিককালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প মডেল হিসেবে জাতীয় সরকারের কথা বলা হচ্ছে এবং তা বিভিন্ন মহলে আলোচিতও হচ্ছে ব্যাপক ভাবে। এ মডেলের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছে। এসব নিঃসন্দেহেই সুলক্ষণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান নতুন করে জাতীয় সরকারের প্রস্তাব উত্থাপন করায় তা আরো অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যে কোন প্রাস্তাবনারই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই খুজে পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ইতিবাচক যুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে

১। সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দল নিয়ে একট জাতীয় সরকার গঠন করা হলে তা জনমনে গভীর আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাবে এবং প্রকৃতপক্ষে একটি জাতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরই রূপ পাবে।

২। অনাস্থা ও অসহিষ্ণুতার বদলে রাজনীতিকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

৩। সংবিধানের ৫৬ ও ৫৭ অনুচ্ছেদের আলোকেই প্রস্তাবিত জাতীয় সরকার গঠন করা যাবে, সংবিধান সংশোধনীর কোনোই প্রয়োজন পড়বে না।

৪। গণঅভ্যুত্থানের মুখে সৃষ্ট বৈধ সংসদ পুনরায় কার্যকর হলে স্বৈরাচারী, সাম্প্রদায়িক ও অশুভ শক্তি নিরুৎসাহিত হবে।

অপরদিকে নেতিবাচক যুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে

১। দলীয় জাতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে রাজনীতিকরা দলীয় দৃষ্টি ভঙ্গি অতিক্রম করে জাতীয় চেতনাকে ধারণ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে পারেন

২। প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে সংসদের বিরোধী দলের নেত্রীর অবস্থান কি হবে।

৩। স্বৈরাচারী শক্তি ও স্বাধীনতা বিরোধী মহল রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পক্ষে এগিয়ে যাবে।

৪। প্রধানমন্ত্রীকে বহাল রেখে সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা মনে করি, একটি অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি, ক্রমশ মারাত্মক হয়ে ওঠা সংসদীয় রাজনীতির অচলাবস্থার নিরসন হওয়া জরুরী। আর সে ক্ষেত্রে একটি মধ্যপন্থা হিসেবে, কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সরকারের ধারণাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। উপরের নেতিবাচক যুক্তিগুলোর মধ্যে ১ ও ৩ নম্বরকে বস্তুগত ধারণা বলা যায় না। পুরোপুরি আপেক্ষিক। উল্লেখ্য যে, কোন আইন প্রণয়ন বা বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কাজ প্রস্তাবিত জাতীয় সরকার করবে না।

The Daily Star, ঢাকা ২১শে নভেম্বর ১৯৯৪

সাক্ষাতকার ঃ স্যার স্টিফেন নিনিয়ান

তৎকালীন বিরোধীদলগুলোর ক্রমাগত সংসদ বর্জন ও দেশে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরনে কমনওয়েলথ মহাসচিব স্যার নিনিয়ান সরকার ও বিরোধীদলগুলোর সাথে আলোচনা করে ১টি ফর্মূলা পেশ করেন। যার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় সরকারের আদলে পরোক্ষভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধ্যান ধারণা বিদ্যমান ছিল। প্রস্তাবনা ছিল এই-

Following is the full text of the proposal made by Commonwealth emissary Sir Ninian Stephen to the Government and the Opposition:

A. The Leaders shall agree that:

1. Forty-five days before the expiry of the fifth Parliament by effluxion of time, the incumbent Prime Minister shall: (a) Procure the resignations of all ministers; (b) Select in their place nine Members of Parliament for appointment by the President to Cabinet ministers without portfolio, four to be nominated by her and five by the leader of the Opposition.
2. The Prime Minister shall thereafter until the expiry of the fifth Parliament only exercise the executive power of the Republic in an interim capacity.

Dhaka University Institutional Repository

3. The Prime minister and the ministers will not in any way interfere with the election process or with the function of the election Commission.
4. The Prime Minister and the ministers shall continue in office until the outcome of the general election is known officially and shall there upon resign.

উপর্যুক্ত প্রস্তাবটি পর্যালোচনা দেখা যায়, স্যার নিনিয়ানের প্রস্তাবটি ছিল নির্বাচনের ৪৫ দিন পূর্বে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রীসভার সকল সদস্যদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করবেন। এবং তাদের সুনির্দিষ্ট দপ্তর ব্যতীরেকে পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে হতে প্রেসিডেন্ট ৯ জন কে ক্যাবিনেটে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিবেন। যার ৫ জন হবে বিরোধী দল থেকে মনোনীত এবং বাকী ৪ জন হবে সরকার দল থেকে মনোনীত এবং প্রধানমন্ত্রী ও এই ৯ জন মন্ত্রী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে কাজ করবে এবং পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া বা নির্বাচন কমিশনের কর্মকান্ডে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা। পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবার পূর্ব পর্যন্ত তারা দায়িত্ব পালন করে যাবেন। প্রকৃত পক্ষে, এ প্রস্তাবে ছিল সরকারি দল ও বিরোধীদলের সম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন, যারা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করবে।

দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪

❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ** বিরোধীদলের পদ ত্যাগ পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা

সংবাদ বিশ্লেষণ

পদত্যাগের পর কিভাবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে, সেই সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সে সরকারের বৈধতা কিভাবে নিশ্চিত করা হবে সে সম্পর্কে বিরোধী দল ২৮ ডিসেম্বর, ৯৪ পৃথক পৃথক জনসভা থেকে একটি অভিন্ন ফর্মুলা দিয়েছে। ৭টি দাবি সংবলিত ফর্মূলাটি নিম্নরূপ ঃ

- প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।
- সংসদ বাতিল করতে হবে এবং অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- রাষ্ট্রপতি একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার লক্ষে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি অথবা আপিল বিভাগের একজন গ্রহণযোগ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা একজন নির্দলীয় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তার কার্য পরিচালনা করবেন।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রর্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠ নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- সংসদ নির্বাচনের অব্যবহিত পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।
- আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সংসদ একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধনীর মতো একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে উপর্যুক্ত ব্যবস্থাকে আইনসম্মত করবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও অন্তত তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হবে।

এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে আরো অবাধ ও সুষ্ঠ করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা, কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহন এবং একটি রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চত করা হবে বলে বিরোধী দলীয় ফর্মুলায় বলা হয়েছে।

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ২৮ জুন, ১৯৯৪

❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন দলীয় রূপরেখা।

সংবাদ বিশ্লেষণ

২৭ জুন ১৯৯৪ জাতীয় সংসদ ভবনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত এর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ রূপ রেখা ঘোষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রূপ রেখা। আমদের দেশে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক চর্চা যেহেতু এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে সেহেতু গণতন্ত্রকে সুসংহত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করার তাগিদ এখন একটি জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে বিরোধী দলসমূহ সংসদে তিনটি বিলও পেশ করেন এবং ঐ বিলসমূহ আলোচনার জন্য দাবী জানান। কিন্তু সরকার তাতে কোন সাড়া দেননি। এরপর বিরোধী দলসমূহ ২৬ জুনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন কল্পে সংবিধান সংশোধনী একটি বিল আনার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু সরকার সেই বিল না এনে সংসদকে আরও অকার্যকর করে দেন এবং অগণতান্ত্রিক ও একগুয়েমী মনেভাব নিয়ে আজ জাতিকে গভীর সংকটে নিমজ্জিত করেছেন। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে গণতন্ত্রকে সুসংহত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার স্বার্থে আমাদের প্রস্তাবিত রূপরেখা নিম্নরূপ হবে ঃ-

একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার সাথে সাথে-

১. প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

২. রাষ্ট্রপতি এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করার জন্য জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল সমূহের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয়, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে তার কার্য পরিচালনা করবেন।

৩. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবেন।

৪. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে। এছাড়া এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

৭. নির্বাচন কমিশনকে পুর্নগঠন করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণ বিধি প্রণয়ন ও নিশ্চিত করতে হবে।

৯. উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

এ রূপরেখা বাস্তবায়ন করার জন্য জাতীয় সংসদে সকল বিরোধী দল আজ ঐক্যবদ্ধ। সরকার যেহেতু সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। সকল বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে থাকতে বাধ্য করেছেন সেহেতু আজকে এ রূপরেখা বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বৃহত্তর গণআন্দোলন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদে সাধারণ নির্বাচনে আমাদের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না এবং এ রূপরেখা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত জনগণের এ আন্দোলন চলবে। আজ আমরা দেশের সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং সকল শ্রেণীর জনগণকে এ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে শরিক হওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা ১২ জুলাই,২০০১

❑ সংবাদ ভাষ্য ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক ঐতিহাসিক দেশজ সমাধান

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ দেশের জনগন আশা করে অতীতের পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন দুটির মতো এবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুন্দর শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন হবে। জনগন আরও আশা করে যে, এ তিন মাসের জন্য তুলনামূলক শান্তিতে থাকা যাবে। রাজনৈতিক দল বা মহলের আর্শীবাদ পুষ্ট সশস্ত্র ক্যাডারদের দৌরাত্ম কিছুটা কমবে। কোথাও অন্যায় কিছু ঘটলে ন্যায় বিচার লাভের সুযোগ থাকবে। মানুষ সাধারণত অবাস্তব বা ভিত্তিহীন আশা করে

Dhaka University Institutional Repository

না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে কাছে জনগনের আশা দুটিও কোনক্রমেই অযৌক্তিক নয় কারন সংজ্ঞা অনুযায়ী এগুলোই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল কাজ। এ কাজগুলো যেন সে করতে পারে সেজন্য তাকে যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অতীতেও বিফলে যায়নি। এবারও তার অন্যথা হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনির্বাচিত নির্দলীয় এবং অরাজনৈতকি হওয়াটাই এ সরকারের শক্তির লক্ষণ। ১৯৯১ এর পূর্বে আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের মতোই ক্ষমতাসীন সরকারকে নির্বাচনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে অভিহিত করা হতো। কিন্তু দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এবং সাধারণ জনগণ শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে এসেছে যে কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। এখান থেকেই নির্দলীয় অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারনার উদ্ভব। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের শুধু আশা আকাঙ্খার প্রতীকই নয়, সুষ্ঠু নির্বাচনের একমাত্র দেশজ সমাধান।

৫.২ গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে দলীয় সরকার

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ২১ মার্চ, ১৯৯৪ ঃ মাগুরা - ২ উপনির্বাচন

- **সংবাদ ভাষ্য ঃ "বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নতুন কলংকজনক অধ্যায়ের নব সূচনা"** জাতিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ২১ মার্চ, ১৯৯৪

সংবাদ ভাষ্য ঃ জাতি আজ দিশেহারা, সম্পাদকীয় মাগুরা-২ উপনির্বাচনে সরকারি দলের নজির বিহীন কারচুপি জাতিকে আবারো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে, দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

সংবাদ পর্যালোচনা ঃ ২০ মার্চ ১৯৯৪। মাগুরা-২ আসনের সংসদ সদস্য আওয়ামীলীগ নেতা আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে এই শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিদেশী বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতেই ভোট জালিয়াতি ও কারচুপির করা হলো। এই উপনির্বাচনে শুধু নির্বাচনের দিন কারচুপি করেই ক্ষান্ত হননি সরকারি দল নির্বাচনের পূর্বে

Dhaka University Institutional Repository

বাধা, দিয়েছে আওয়ামীলীগ প্রার্থীর নির্বাচনী প্রাচরণায় এবং নির্বাচনের পরে অর্থাৎ জয়লাভের পর নির্যাতন ও হামলা চালিয়েছে সংখ্যালঘু ও আওয়ামলীগ নেতা কর্মীদের বাড়ী, অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। যার ফলশ্রুতিতে এ নির্বাচন শুধু কারচুপিরই অংশ ছিলনা, এ নির্বাচন জাতিকে আবারো ঠেলে দিয়েছে সংঘাতের দিকে।

উল্লেখ্য মাগুরা উপনির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী বিজয়ী হবে এতে কারও কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঐ দিনই বেসরকারি ভাবে ঘোষণা করা হলো বিএনপি প্রার্থী কাজী সলিমুল হক কামাল বিজয়ী হয়েছে। ফলে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার একটি নৈতিক ভিত্তি তৈরী করে দিল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের রাজনীতি হয়ে পড়ে সংঘাতপূর্ণ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা-২ জুন ২০০৪ ঢাকা-১০ উপনির্বাচন

- **সংবাদ ভাষ্য ঃ** "তখন কোথায় ছিল ৯০ দিনের বাধ্যবাধকতা"। ঢাকা ১০ উপনির্বাচন নিয়ে নির্বাচনের পূর্বে হাইকোর্টে মামলা।

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ ব্যারিষ্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে কারচুপির রূপরেখা তৈরী হয়ে গেছে। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত হয়ে গেছে। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত হয়ে এ উপনির্বাচন ৬ জুন অনুষ্ঠিত হলে তা সুষ্ঠু হবে না। এ নির্বাচন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে আপীলের শুনানিতে উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের অবকাশকালীন পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে তিনি পেশ করেন। বিকল্পধারা প্রার্থী মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নানের পক্ষে শুনানিতে ব্যারিষ্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ আরও বলেন, ক্ষমতাবান এক প্রার্থীর ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে কলুষিত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচন ৬ জুন অনুষ্ঠিত হলে তা সুষ্ঠু ও অবাধ হবে না। ফলে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘিত হবে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, ৯৬ সালে ভোলা উপনির্বাচন হাইকোর্টের আদেশে পাঁচ বছরের জন্য স্থগিত ছিল। তখন কি সুপ্রীম কোর্ট হস্ত ক্ষেপ করেছিল? তখন কোথায় গিয়েছিল ৯০ দিনের বাধ্যবাধকতা? আজ একজন ক্ষমতাবান লোকের জন্য কি এই ব্যবস্থা? ওকালতনামা ছাড়া আপীল করলে কি মেজর মান্নানের আপীল গ্রহণ করা হতো বিশেষ বেঞ্চ, ফুল বেঞ্চ বসত? তিনি বলেন, সারা জাতি ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা আরেকটা মাগুরা মার্কা নির্বাচন দেখতে চাই না। এসব কারণে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য রাজনৈতিক সরকারের বদলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান

Dhaka University Institutional Repository

করে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল। ব্যারিষ্টার রোকনউদ্দিন শুনানিতে বলেন, ঢাকা-১০ আসনের নির্বাচনের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেছে, তফসিল ঘোষণা, প্রতীক বরাদ্দসহ এ নির্বাচনের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব। নির্বাচনী তফসীলের কার্যক্রম অবৈধ। কারণ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের একদিন পর প্রতীক বরাদ্দের আইনী বিধান থাকলেও ২০ মে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের দিনেই অফিস সময়ের পর প্রতীক বরাদ্দ হয়েছে। বিকল্প ধারা নামক রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসাবে মেজর মান্নান কুলা প্রতীক চাইলেও জোট প্রার্থীর ডামি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সঙ্গে প্রহসনের লটারীর মাধ্যমে জোট প্রার্থীর এক সাব কন্ট্রাক্টরকে কুলা প্রতীক দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় ৬ জুন নির্বাচন হলে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। বরং ৬ জুন নির্বাচন হলে জনমনে প্রশ্ন জাগবে একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির জন্য এ নির্বাচন হয়েছে। ব্যারিষ্টার রোকন বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এবং নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষার্থে প্রতীক বরাদ্দ সঠিক ভাবে হওয়া প্রয়োজন।ব্যারিষ্টার রোকন আরও বলেন, প্রত্যেক দলের সকল প্রার্থী এই প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার বিধান থাকলেও তা লংঘন করে মুন্সীগঞ্জ-১ আসনের বিকল্প ধারার প্রার্থীকে কুলা দিলেও মেজর মান্নানকে দেয়া হয়েছে বেঞ্চ। ব্যারিষ্টার রোকন বলেন, একজন ক্ষমতাবান প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় নির্বাচনী তফসিলের কার্যক্রমে এসব অনিয়ম করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অতিউৎসাহী ক্ষমতাবান এক ব্যক্তি এতে জড়িত। নির্বাচনী তফসিলের কার্যক্রম এসব অনিয়মের কারণে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া অবৈধ। তাই ৬ জুন এ নির্বাচন হলে কি হবে? এর কি কোন বৈধতা হবে? প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের পদে থেকে এ প্রার্থী নির্বাচন করেছেন বলে এ নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি না জনমনে এ প্রশ্ন উঠেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ২৫ জুলাই, ২০০৪

- ❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ** কারচুপির সকল রেকর্ড ভঙ্গ। দিনেদুপুরে ছিনতাই হয়েছে সংসদের ঢাকা-১০ আসন। শান্তির আবরণে সরকারি প্রার্থীর পক্ষে কেন্দ্র দখল করে জালভোট। বিকল্প ধারা প্রার্থীর নির্বাচন বয়কট। নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাবেন। অবশেষে মাশুরা ও হার মানল।

বিশ্লেষণ ঃ দিনেদুপুরে ছিনতাই হয়েছে জাতীয় সংসদের ঢাকা-১০ (রমনা-তেজগাঁও) আসন। শান্তি পূর্ণ পরিবেশের আবরণে বৃহস্পতিবারের এই নির্বাচনে সরকারি দলের প্রার্থীর পক্ষে কেন্দ্র দখল, জালভোটসহ কারচুপির স্মরণকালের সকল রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। ভোট কারচুপির তান্ডবে মাত্র তিন ঘন্টার মাথায় নির্বাচন বয়কট করতে বাধ্য হন, বিকল্প ধারার প্রার্থী।

Dhaka University Institutional Repository

হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও কোন কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয়নি সেনাবাহিনী। অরক্ষিত প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে ছিল বহিরাগতদের জাল ভোট দেয়ার উৎসব, সকাল আটটায় ভোট গ্রহণের শুরুতেই অধিকাংশ কেন্দ্র দখল করে নেয় জোট সমর্থক ক্যাডার বাহিনী। কেন্দ্রগুলোতে তত্ত্বাবধান করেছে প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য, কমিশনার ও বিএনপির নেতৃবৃন্দ। কেন্দ্রের আশপাশে যানচলাচল নিষিদ্ধ থাকলেও প্রতিটি কেন্দ্রের সামনে সরকারি দলের সমর্থকরা ধানের শীষ পোষ্টার লাগানো, জীপ, মাইক্রোবাস, মোটর সাইকেল নিয়ে মহড়া দিয়েছে। ভোট কেন্দ্রের আশে পাশে কুলা প্রতীকের এজেন্ট বা সমর্থকদের ঘেষতে দেয়া হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে সকালে ভোটগ্রহণ শুরুর তিন ঘন্টার মধ্যেই বিরোধী দল বিকল্প ধারার প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান এবং লিখিত অভিযোগ করে নির্বাচন বাতিলের দাবি জানান। নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোও এই নির্বাচনের ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করেছে। ভরপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার সফিউর রহমান সকল কেন্দ্রে সেনা মোতায়েন না হওয়ায় আদালত অবমাননা করা হয়েছে, ভোট সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়নি এসব মন্তব্য করলেও নির্বাচন বাতিলের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে জানান। বিকল্প ধারার নেতৃবৃন্দ সকল কেন্দ্রে সেনা মোতায়েন সংক্রান্ত আদালতের আদেশ কার্যকর না হওয়ায় নির্বাচন বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে শনিবার আবার আদালতে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন।

ছবি ঃ ৫.১

জাল ভোট- প্রকাশ্যে সীল মারার দৃশ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এনেক্স ভবন কেন্দ্রের দ্বিতীয় তলায় ব্যালট পেপারে প্রকাশ্যে সীল মারেন তিনজন- ২রা জুলাই ২০০৪, প্রথম আলো।

Dhaka University Institutional Repository

সরেজমিন প্রতিবেদন একটি মডেল কেন্দ্র

সকাল সাড়ে আটটায় মগবাজার ইস্পাহানী স্কুল কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে গেটে প্রচুর লোক। ভিতরে তিনটি ভোট কেন্দ্র। ৭২ নম্বর কেন্দ্রের তিনটি বুথে প্রচন্ড ভিড়। লাইনে দাঁড়ানো সবাই তরুন। বয়স ১৫/১৬ বছরের মধ্যে। এদের একজনের নাম জামিল। বাবার নাম হারুন অর রশীদ। ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে বলে ৭৭ দিলু রোড। আর হাতের স্লিপে ঠিকানা লেখা ১৫৬ দিলু রোড। এমন অনেক ঠিকানা ও ভোটার নাম্বারে ভুলের ছড়াছড়ি। দেখা গেছে কারও কারও নিজের ও বাপের নামও কষ্ট করে মনে করতে হয়েছে। তিন তলার মহিলা বুথে এজেন্টদের জায়গা পূর্ণ। ১৩/১৪ জন করে তরুনী বসে আছেন একেকটি বুথে। কার এজেন্ট জিজ্ঞেস করতেই এরা বেশ বিব্রত। কেউ বলেন ক্রিকেট ব্যাট, কেউ তীর, কেউ সাইকেল, কেউ ঘড়ি মার্কা ইত্যাদি। তবে প্রার্থীর নাম বলতে পারেননি কেউ। তিনটি মহিলা বুথের চিত্র ছিল প্রায় এক। কলেজে পড়ুয়া বা একটি মেয়ে নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করে বলেন, আমাদের দশটি মেয়েকে এখানে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতীকের নাম মুখস্ত করতে বললেও প্রার্থীর নাম বসে দেয়া হয়নি। কারা তাদের এনেছে প্রশ্নে মেয়েটি বেশ ভয়ের সঙ্গে বলে, স্থানীয় মহিলা কমিশনার। বিষয়টির দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, প্রার্থীর নাম বলতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। বিষয়টি আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটি আমার দেখার বিষয় নয়।পরে বারোটি পুরুষ কেন্দ্রে গিয়েও একই চিত্র পাওয়া গেছে। কেন্দ্র থেকে বের হওয়ার সময় দেখা গেছে নাজনীন চৌধুরী নামে এক মহিলা ভোটার চিৎকার করেছেন। তার ভোটার নম্বর ৭৩। স্কুলের কাছেই তার বাসা। সকাল ৯টার সময় এসে দেখে তার ভোট দেয়া হয়ে গেছে। তিনি কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করেন। ফল কিছুই হয়নি।

সকাল সাড়ে দশটায় ইস্পাহানী স্কুলের সামনে রাস্তার উল্টা দিকে এসে দাঁড়ায় দুটি মিনি বাস। বাস থেকে নামানো হয় দারিদ্র্যের ছাপ মাখানো ৬০/৭০ মহিলাকে। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামনে ত্রিপাল টানানো আশ্রয় কেন্দ্রে। তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় একটি করে স্লিপ। কেন্দ্রে ঢুকিয়ে লাইনে দাঁড় করানো হয়। এদের মধ্যে ছিল সাহেলা, শিপ্রা, আনোয়ারা, রাহিমা, খোদেজা সহ আরও অনেকে। তাদের আনা হয়েছে কামরাঙ্গীরচর থেকে। মাথাপিছু একশ টাকা চুক্তি। কেন্দ্রে নেয়ার আগে তাদের নাম, স্বামী বা পিতার নাম, ভোটার নম্বর মুখস্থ করানো হয়েছে। বেলা পৌনে একটায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামনে গিয়ে দেখা গেছে নাম ও পিতার নাম মুখস্থ করার জন্য রীতিমতো স্কুলে বসে গেছে। সাংবাদিক দেখেই সবাই চুপচাপ। বেলা দেড়টায় কেন্দ্রের ভিতরে

Dhaka University Institutional Repository

দেখা গেছে, সকল প্রার্থীর এজেন্ট মিলে বিরিয়ানী খাচ্ছেন। বিকাল চারটায় একটি কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে গল্প করছেন স্থানীয় বিএনপির কয়েকজন মহিলা নেত্রী। কেমন ভোট কাষ্ট হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, খুবই কম। ৩৫ শতাংশের বেশী হবে না।

ছবি ঃ ৫.২

ভোটারদের জড়ো করে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রে

ঢাকা শাঁখারীবাজারের বিশাল সেন্টারের সামনে জড়ো করা জাল ভোটারদের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে-
২রা জুলাই ২০০৪, দৈনিক প্রথম আলো

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ২রা জুলাই, ২০০৪

❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ 'কেন্দ্র দেখতে গিয়ে মেজর মান্নান নাজেহাল'**

বিশ্লেষণ ঃ কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে বিকল্প ধারার প্রার্থী মেজর (অবঃ) মান্নান নিজেই নাজেহাল হয়েছেন জোট সমর্থকদের হাতে। তাঁর জামা কাপড় ধরে টানাটানি করা হয়েছে। গালাগাল করা হয়েছে অশ্লীল ভাষায়। জীবন বাঁচাতে সাংবাদিকদের গাড়িতে উঠে তিনি এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।সকাল দশটায় মেজর (অবঃ) মান্নান পূর্ব নাবালপাড়া হোসেন আলী স্কুলের ভোট কেন্দ্রে গেলে সন্ত্রাসীরা তাঁকে ধাওয়া করে। চারদলীয় জোট প্রার্থী মোসাদ্দেক আলী ফালুর পক্ষের যুবদল, জামায়াত ও

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা মেজর মান্নানের গায়ের পাঞ্জাবী ধরে টানাটানি শুরু করে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকে। এ সময় পুলিশ ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। দিগ্বিদিক হয় মেজর মান্নান প্রান বাঁচাতে দৌড়ে সাংবাদিকদের গাড়িতে ওঠেন। এর পরও সন্ত্রাসীরা মেজর মান্নানের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় স্লোগান দিতে থাকে।

ছবি ঃ ৫.৩

প্রতিপক্ষের হুমকির মুখে একজন প্রার্থী

সরকরী দলের সমর্থকরা প্রতিদ্বন্দ্বী বিকল্প ধারার প্রার্থীর উপর চড়াও হলে পুলিশ তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়- দৈনিক প্রথম আলো, ২রা জুলাই ২০০৪

❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ** "কোন কেন্দ্রেই সেনাবাহিনী ছিল না, সেনা মোতায়েনে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য হয়েছে"। ভারপ্রাপ্ত সিইসি।

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) সফিউর রহমান বলেছেন, ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচন সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়নি। প্রতি কেন্দ্রে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। কোন কেন্দ্রেই আর্মি ছিল না।তবে কেন্দ্র দখল বা বাক্স ভর্তির কোন প্রমাণ আমি পাইনি। কিছু অনিয়ম হলেও কেবল আর্মি ছিল না। এর ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন স্থগিত

Dhaka University Institutional Repository

করা ঠিক হবে না। তাছাড়া স্থগিত করলে জুলাই এর মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তিনি বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনে উপস্থিতি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

এর আগে দুপুরে বিকল্প ধারার প্রার্থী মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান ও তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট মাহী বি চৌধুরী চারটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে নির্বাচন বাতিলের জন্য কমিশনে আবেদন জানান। এ আবেদন নিয়ে কমিশনে উপস্থিত হওয়ার পর মেজর (অবঃ) মান্নানের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনার মুন্সেফ আলীর তর্ক হয়। তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন। ফলে ভারপ্রাপ্ত সিইসি নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের সভা ডাকলেও অন্য দুই কমিশনার মুন্সেফ আলী ও মোহাম্মদ আলী তাতে উপস্থিত হতে রাজি হননি। তবে মুন্সেফ আলী ভারপ্রাপ্ত সিইসির সঙ্গে নির্বাচনের বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন। এ বৈঠকের পরপরই সাংবিদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ভারপ্রাপ্ত সিইসি।ভারপ্রাপ্ত সিইসি সফিউর রহমান বলেন, এটি সঠিক ও নিশ্চিত যে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়নি। ওই নির্দেশ অমান্যের সঙ্গে যারা জড়িত, আশা করি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে আমি কয়েকবার স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাকে পাইনি। কে এই ব্যবস্থা নেবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছে। তারাই ব্যবস্থা নেবে। কমিশন থেকে আদালতকে কিছুই জানানো হবে কিনা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কমিশনে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে এসব বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তিনি আরও বলেন,সকাল সাড়ে সাতটা থেকে পৌনে আটটার মধ্যে কেন্দ্র থেকে এজেন্ট বের করে দেয়া, কেন্দ্রে যেতে না দেয়া, সেনাবাহিনী কেন্দ্রে না যাওয়া। এমন বিভিন্ন অভিযোগ আমি পেয়েছি। বিকল্প ধারার পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগও করা হয়েছে। তারা নির্বাচন বাতিলেরও দাবি জানায়। কিন্তু রিটার্নিং অফিসার বলেছেন, কোথাও কোন সমস্যা নেই। সিইসি বলেন, আমি পাঁচটি স্থানে নয়টি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। বিজি প্রেস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটার ছিল না, কিন্তু ভোট গ্রহণের হার ছিল অনেক বেশী। সিদ্বেশ্বরীতে আর্মি দেখিনি। সেখানে কুলার দুজন এজেন্ট পেয়েছি। বাকিদের পাইনি। সেগুনবাগিচায় একটি কেন্দ্রে আর্মি ছিল না, তবে বিডিআর ছিল। কুলার কোন এজেন্ট সেখানে আমি পাইনি। সফিউর রহমান বলেন, তবে কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনের সময় আমার কাছে কেউ কোন অভিযোগ করেনি। বাই সাইকেল প্রতীকের প্রার্থীর কাছ থেকেও কোন অভিযোগ আসেনি। আমি যে সব কেন্দ্রে গিয়েছি, সেখানে ভীতিমুক্ত পরিবেশেই নির্বাচন হয়েছে। তবে ১০৩ কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি কেন্দ্র দেখে তো সার্বিক কোন

Dhaka University Institutional Repository

ধরণা পাওয়া সম্ভব নয়। রমনা-তেজগাঁও এর বাইরে থেকে ভোটার এনে জাল ভোট দেয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন আসলে চেহারা দেখে তো বোঝা সম্ভব নয় যে, কে মুন্সীগঞ্জ থেকে এসেছে, আর কে কেরানীগঞ্জ থেকে এসেছে।

দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২ জুলাই-২০০৪

❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ 'ব্যাপক জাল ভোট হয়েছে, এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নয়।'**

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল গতকাল বৃহস্পতির অনুষ্ঠিত ঢাকা-১০ আসনের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদনে ব্যাপক জাল ভোট দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। এসব প্রতিবেদনে বলা হয়, অধিকাংশ কেন্দ্র থেকে কুলা প্রতীকের এজেন্টদের জোর করে বের করে দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে আর ও বলা হয়, জাল ভোটের মহোৎসবের এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নয়। এ নির্বাচনে যে প্রার্থীই জয়ী হোক, নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

একপেশে নির্বাচন ঃ ইলকশন মনিটরিং এলায়েন্সের (ফেমা) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপনির্বাচন সম্পূর্ণ একপেশে ছিল, সর্বত্র চারদলীয় জোটের প্রার্থীর প্রভাব এবং আধিপত্য দেখা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, অনেক কেন্দ্রেই বিকল্প ধারার পোলিং এজেন্ট দেখা যায়নি। যাত্রাবাড়ী লালবাগ সহ নির্বাচনী এলাকার বাইরে থেকে ভোটারদের এনে চারদলীয় জোট প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় কোনো ভোটকেন্দ্রেই সেনা সদস্যদের দেখা যায়নি।

নির্বাচন অবাধ হয়নি ঃ জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ (জনিপপ) সভাপতি ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেছেন, আমাদের পর্যবেক্ষক দল যা দেখেছে, তাতে নির্বাচনে অনেক সমস্যা ছিল। এ নির্বাচনে এত বেশি জাল ভোট দেওয়া হয়েছে যে একে কোনোভাবেই অবাধ ও নিরপেক্ষ বলা সম্ভব হচ্ছে না।জানিপপের প্রতিবেদনে বলা হয়, জাল ভোট দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে আনা লোকজনকে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা দেয়া হয়েছে।

কোনো কেন্দ্রে সেনা নেই ঃ মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, অধিকাংশ কেন্দ্রে বিকল্প ধারার কোনো এজেন্ট নেই। অধিকাংশ কেন্দ্রে ধানের শীষের এজেন্ট ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এজেন্টরা তাদের প্রার্থীর নাম বলতে পারেনি। অধিকার কোন কেন্দ্রেই সেনা সদস্যদের দেখতে পায়নি। তবে তারা সেনা সদস্যদের রাস্তায় টহল দিতে দেখেছে।অধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, আপাত দৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ মনে হলেও অনিয়ম, জাল ভোট, কেন্দ্রে সেনা অনুপস্থিতি ও পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়ায় উপনির্বাচন ত্রুটিমুক্ত হয়নি।

বাসে করে লোক আন হয় ঃ 'ডেমোক্রেসিওয়াচ' তাদের প্রতিবেদনে বলেছে ভোটারদের কম উপস্থিতি ও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা নির্বাচনী পরিবেশকে ম্লান করে দেয়। বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুব কম। মগবাজারে ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুলের সামনে সকালে তিনটি বাসে করে লোক আনতে দেখা গেছে। প্রায় সকল কেন্দ্রেই কুলার এজেন্ট থাকলেও দুপুরের পর তাদের আর দেখা যায়নি। সেনাবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রের সামনে টহল দিতে দেখা যায়। তারা বলেন, বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও ভোটার কম হলেও ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ হয়েছে।

ভোট হয়ে গেছে ঃ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক বশির আহমেদের নেতৃত্বে পর্যবেক্ষক দল বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখে, সে সব জায়গায় ভোটাররা ভোট দিতে এসে দেখেছেন তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে। শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেয়ার কোন পরিবেশ ছিল না।

জাল ভোট ছাড়া কেন্দ্র নেই ঃ 'ব্রতি' পর্যবেক্ষক দল জাল ভোট ছাড়া একটি কেন্দ্রও খুজে পায়নি। তারা ধানের শীষ ছাড়া অন্য কোন প্রার্থীর পোষ্টারও খুজে পায়নি। প্রতিটি কেন্দ্র ছিল ধানের শীষের কর্মীদের দখলে। উদয়ন স্কুলে প্রকাশ্যে ধানের শীষের প্রার্থীদের ভোট দিতে দেখা যায়। এভাবে ভোট দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে একজন বলেন, ধানের শীষে ভোট না দিয়ে উপায় নেই, হলে থাকতে হবে তো। তাদের পর্যক্ষেকদের মতে, উপনির্বাচন জাল ভোটের মহোৎসব হয়েছে।

৩৫ ভাগ ভোট পড়েছে ঃ বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশন তাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলেছে তাদের হিসাবে ভোট কেন্দ্রে ৩৫% ভাগ ভোটার উপস্থিত ছিল। ভোটকেন্দ্র গুলোতে যুবকদের অবাধে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। এতে বলা হয়, নির্বাচনের আগে সন্ত্রাসীদের মহড়া, হুমকি প্রভৃতি কারণে ভোটারদের ভোট দেয়ায় অনীহা দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ৭ জুলাই-২০০৪

❑ সংবাদ ভাষ্য ঃ "ঢাকা-১০ আসনে জিতেছেন ফালু হেরেছে বিএনপি"

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ ঢাকা-১০ আসনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটপ্রার্থী মোসাদ্দেক আলী ফালুকে বিপুল ভোটে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই জয় শাসক দল বিএনপির পক্ষে যায়নি। বরং বড় ধরনের নৈতিক পতন ঘটেছে তাদের। এ উপনির্বাচনে সবচেয়ে বড় ক্যাজুয়ালটি হয়েছে শাসক দলের বিশ্বাস যোগ্যতা। এতে ব্যাপক ভোট কারচুপির ফলে নির্বাচনের সুষ্ঠুতার সাফাই গাওয়া বিএনপি নেতাদের কথা সাধারণ মানুষ কেউ বিশ্বাস করছেন না। আর তাদের দলীয় প্রার্থী পত্রিকার প্রথম পাতায় নিন্দনীয় কার্টুনের বিষয়বস্তু হয়েছেন। গৃহবধূ ভোটার থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যবেক্ষক, রাজনীতিক, কূটনীতিক পর্যন্ত সবাই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, বিএনপি এটা কি করলো? বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মহলে এ দলের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সমালোচনা এত বেড়েছে যে, কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে এ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন উত্থাপন করাই এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে দলের বোনাফাইড শুভাকাঙ্খীরা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছেন। দ্রুত তম সময়ের ধনকুবের হিসেবে প্রতিষ্ঠা ১ জুলাই উপনির্বাচনের দিন থেকে গত কয়েক দিনে সারা ঢাকা শহরে অনুসন্ধান চালিয়ে এমন কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা সংস্থা পায়নি যিনি এই নির্বাচনকে সুষ্ঠু বলে সার্টিফাই করছেন। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা এবং অন্যত্র সবাই বলেছেন, এ উপনির্বাচনে বিএনপি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে উপহাস করেছে। নির্বাচনের নামে এই প্রহসন দেখে বিএনপির কট্টর সমর্থকরাও অনেকে নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। তারা বলছেন, এক ব্যক্তির জন্য বিএনপি নিজ ইমেজের অপূরনীয় ক্ষতি করেছে। দলটি অতীতের মাগুরা উপনির্বাচনের কলংকিত ধারায় ফিরে গেছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপির পক্ষে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল দলটি নিজ থেকেই তার অপব্যবহার করেছে। সেই সাধারণ নির্বাচনে দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকরা এ দলের পক্ষে যে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবার তার বিপরীতে ঘটনা ঘটেছে। দেশে বিকাশমান গণতন্ত্রের জন্য এর মাধ্যমে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। আর এতে বড় ধরনের রাজনৈতিক লাভের মুখ দেখেছে বিএনপির মূল প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ। তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলনের স্তিমিত ধারা বেগবান হতের পারে এর মাধ্যমে। কোন কোন বিশ্লেষক এমনও বলছেন, বিএনপি জোটের পাঁচ বছরের মেয়াদকাল এখন থেকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা হবে। প্রথম ভাগ হবে ১ জুলাই, ২০০৪ পূর্ববর্তী কাল এবং এর পরবর্তীকাল। প্রথম ভাগে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশংসার ভাগ বেশী এবং পরের

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ নিন্দার ভাগ বেশী থাকবে। তাই এতে প্রতীয়মান হয় যে ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে জিতেছেন কালু হেরেছেন বিএনপি।

দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা ৫ আগষ্ট ২০০৪

❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ** ঢাকা-১০ উপনির্বাচনের ৩২ প্রিসাইডিং অফিসারের নতুন প্রতিবেদন! "কেন্দ্রের পাশে সেনা দেখেছি"।

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ চাকরির ভয় দেখিয়ে ঢাকা-১০ উপনির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী ৩২ জন প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে কেন্দ্রে সোনাবাহিনী গিয়েছিল ও কেন্দ্রের পাশে সেনা মোতায়েন দেখেছি-এ ধরনের বক্তব্য লিখিয়ে নেয়া হচ্ছে। ঐ উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মিয়া মুশতাক হোসেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রিসাইডিং অফিসাবদেব কাছ থেকে জোর করে এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করিয়ে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব প্রিসাইডিং অফিসার এর আগে নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে সেনা মোতায়েন হয়নি বা কেন্দ্রে কোন সেনা সদস্য দেখেননি বলে প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। জমা দেওয়া ঐ সব প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসারদের ফিরিয়ে দিয়ে নতুন করে প্রতিবেদন লিখিয়ে নেয়া হচ্ছে।

হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ঢাকা-১০ উপনির্বাচনে প্রতি কেন্দ্রে সেনা মোতায়েন হয়েছিল কি না তা জানাতে প্রত্যেক প্রিসাইডিং অসিারের আলাদা প্রতিবেদন সংগ্রহ করে আদালতে পেশ করার জন্য এর আগে রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।হাইকোর্টের নির্দেশে গত ২২ জুলাই এ উপনির্বাচনে সেনা মোতায়েন সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার সফিউর রহমান প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ঢাকা-১০ উপনির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে সেনা মোতায়েন করা হয়নি। আদালতের জন্য মাঠ পর্যায়ের তথ্য চেয়ে কমিশন রিটার্নিং অফিসারের কাছে চিঠি দিলে মিয়া মুশতাকও যে প্রতিবেদন দেন তাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার অসত্য ও অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়ে বলেন, ঐ প্রতিবেদনে কোন বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট তথ্য দেয়া হয়নি। পরে আদালত সকল প্রিসাইডিং অফিসারের আলাদা আলাদা প্রতিবেদন চেয়ে পাঠান।খোজ নিয়ে জানা যায়, ঢাকা-১০ উপনির্বাচনের ১০৩ জন প্রিসাইডিং অফিসারের মধ্যে একজন দেশের বাইরে থাকায় ১০২ জনের প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, ঢাকা-১০ উপনির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারদের বেশির ভাগই ছিলেন সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা। সোনালী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের সরকার দলীয় সমর্থিত সিবিএ নেতা নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগের কাজে ভূমিকা রাখেন। ঐসব প্রিসাইডিং অফিসারের কেউ কেউ ভোটের দিন তাদের কেন্দ্রে সোনাবাহিনী দেখেছেন বলে প্রতিবেদন জমা দেন, যেনারা কেন্দ্রে কোন সেনাসদস্য, দেখেননি। এ পরিস্থিতিতে রিটার্নিং অফিসার তার পছন্দমতো ৭০ জন প্রিসাইডিং অফিসার এর প্রতিবেদন আদালতে জমাদেন। এসব প্রতিবেদনে সেনাবাহিনী কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয়নি বলে কোনো স্পষ্ট তথ্য নেই। কেন্দ্রের পাশে টহল দিতে দেখেছি আমাদের কাছে এসে জানাতে চেয়েছেন সমস্যা আছে কি না এ ধনের কথা আদালতে ইতিমধ্যে জমা দেয়া বেশির ভাগ প্রতিবেদনে আছে। বাকি ৩২ জনের প্রতিবেদন জমা দিতে গত ২৪ জুলাই আদালত দুই সপ্তাহ সময় দেন। এ সময়ের মধ্যে নিজেরে পছন্দমত প্রতিবেদন তৈরি করিয়ে নিয়ে রিটার্নিং অফিসার শেষ ৩২জন প্রিসাইডিং অফিসারকে তার কার্যালয়ে ডেকে আনেন। গোপনীয়তার জন্য প্রিসাইডিং অফিসারদের মৌখিক নির্দেশে ডেকে আনা হলেও সংশ্লিষ্ট একাধিক অফিস এটা অফিস নির্দেশ হিসেবে জারি করে। এই নির্দেশে সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসারদের রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় অথবা বিভাগীয় কমিশনারদের কার্যালয় জোর করে প্রিসাইডিং অফিসারদের কাছে থেকে সেনা মোতায়েন সম্পর্কে লিখে নেয়ার কথা জানার জন্য কয়েক দফা চেষ্টা করেও রিটার্নিং অফিসার ও ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মিয়া মুশতরক হোসেনকে পাওয়া যায়নি। গতকাল তার অফিস থেকে জানান হয়, তিনি ঢাকার বাইরে গেছেন। কবে আসবেন তারা তা জানেন না। ঢাকা বিভাগীয় নির্বাচন কমিশনার আবুল কাশেম এ ব্যাপারে প্রথম আলোকে বলেন, জোর করে কারো কাছ থেকে প্রতিবেদন লিখিয়ে নেয়া হয়েছে বলে তার জানা নেই। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার এ ব্যাপারে প্রিসাইডিং অফিসারদের কাছ থেকে প্রতিবেদন নিচ্ছেন বলে তিনি শুনছেন। উল্লেখ্য গত ১ জুলাই অনুষ্ঠিত ঢাকা-১০ উপ নির্বাচনে হাইকোর্ট প্রতি কেন্দ্রে সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর হয়নি। আওয়ামীলীগের সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হবে না বলে প্রধান বিরোধী দল এ নির্বাচন বর্জন করেছিল। বহু সন্ত্রাসী, পুলিশের খাতায় তালিকাভুক্ত আসামী, অপরাধ জগতে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাশীন দলের ক্যাডাররা অস্ত্রের ভয়ভীতি দেখিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কমিশনার নির্বাচিত হন।

ভোলা উপ নির্বাচন- ৭ম জাতীয় সংসদ পুরো সময়কালেই ১ জন সাংসদ কম ছিল , তোফায়েল আহম্মেদ ২টি আসন থেকে জয়ী হলে ১টি আসন ছেড়ে দেন। এবং সে আসনে নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট সময়ে উপ নির্বাচন আয়োজন করার কথা। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী এ নেতার

Dhaka University Institutional Repository

অনিচ্ছার কারনে ৫ বছরের মধ্যেও অনুষ্ঠিত হতে পারেনি কাংখিত এ উপ নির্বাচন। তাই একটি আসনের মানুষ ছিল জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বহীন।

৫.৩ দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় নির্বাচন ষ্টাইল

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ১৯ এপ্রিল ২০০৪

- **সংবাদ ভাষ্য ঃ "বানারীপাড়ায় সংখ্যালঘুসহ দুই কমিশনার প্রার্থী পরিবার নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন"।**

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ বানারীপাড়ার পৌর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেখানে সংশয় ও শঙ্কা ব্যাপক আকার ধারণ করে । ভোটারদের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নির্বাচনের দিনে তারা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন কিনা। ইতোমধ্যে একজন সংখ্যালঘু কমিশনার প্রার্থীসহ দু'জন কমিশনার প্রার্থী পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে কয়েকটি ওয়ার্ডে জোট প্রার্থীদের বিজয়ী করতে বেশ কয়েকজন কমিশনার প্রার্থীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করে মনোনয়ন প্রত্যাহার করানোর ঘটনাও ঘটেছে। অপরদিকে, সরকার ও বিরোধীদলীয় দুই প্রার্থীই অভিযোগ করেছিল, সেখানে অচেনা লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছিলো। সর্বহারা সন্ত্রাসীদের দেখা মিলছে, তারা অবশ্য এজন্য পরস্পরকে দায়ী করেছেন। নির্বাচন কালীন সময়ে বানারীপাড়ায় অনুসন্ধান চালিয়ে এসব তথ্য মিলেছে। বরিশাল থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে বানারীপাড়া উপজেলা। চমৎকার সড়ক ব্যবস্থার কারণে বরিশালের সঙ্গে এ উপজেলার যোগাযোগও সহজতর। শেরে বাংলা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাসহ বহু গুণীজনের পূর্ণ্য ভূমি বানারীপাড়ার বেশিরভাগ এলাকা এখনও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত।

নির্বাচনকালীন সময়ে সরোজমিনে দেখা যায় প্রার্থী গৌতম সমদ্দারের ভাই রাম সমদ্দারকে সরকার দলীয় ক্যাডাররা ধরে ডাকা বাংলাতে নিয়ে যায়। সেখানে তার ভাইকে হাজির করতে বাধ্য করার জন্য একটি সাদা ষ্ট্যাম্পে সই নেয়া হয়। হুমকি দেওয়া হয় গৌতমকে হাজির করা না হলে জমিজমা সব লিখে নিয়ে এলাকাছাড়া করা হবে। রাম সমদ্দার সন্ধ্যায় গৌতমের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে জোর করে স্বাক্ষর নেয়। একাজে নেতৃত্ব দেয় বিএনপির একজন প্রভাবশালী। এ ঘটনায় ওই পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারপর গৌতম ও রাম সমদ্দার তাদের স্ত্রী-পুত্র-

Dhaka University Institutional Repository

কন্যাসহ এলাকা ছাড়েন। তার বোন অঞ্জলি রানী ভট্টাচার্য সংবাদপত্রে জানান, তারা কোথায় তিনি তা জানেন না। তবে তারা এলাকা ছেড়েছেন বলে জানান। তপন দত্ত বণিক প্রথমে স্বেচ্ছায় প্রত্যাহারের কথা জানালেও পরে তিনি জানান, তাকে এবং সালামকে নিয়ে ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি , সালিয়া বাকপুরের চেয়াম্যান ও উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি বৈঠকে বসে। সেখানে গৌতমেরও উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও সে উপস্থিত ছিল না। ঐ বৈঠকে তারা মনোনয়ন প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে জামায়াত নেতাকে বিজয়ী করতে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী এস এম আলী আকবরকে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আকবর তা বুঝতে পেরে চাপ আর হুমকির মুখে এখন এলাকাছাড়া। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী অধ্যাপক ইমানকে তারা বাসা, কলেজ কোথাও খুজে পায়নি। তার স্ত্রী ইমরানা নাসরিন কাজল জানান তার স্বামীর উপরেও চাপ রয়েছে। সুতরাং বলা যায় দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় নির্বাচন হলো সরকারি দলের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ।

১৬ এপ্রিল, ২০০৪ দৈনিক জনকণ্ঠে একটি সংবাদের শিরোনাম

- **সংবাদ ভাষ্য ঃ "বানারীপাড়া পৌর নির্বাচন-বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য হলেন দুই সংখ্যালঘু"।**

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ বানারীপাড়ার পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপির এক কমিশনার প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী কারার জন্য ভয়ভীতি দেখিয়ে, অস্ত্রের মুখে জোর করে দুই সংখ্যালঘু কমিশনার প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়েছে। বিএনপির কয়েক নেতা বুধবার রাতে ঐ দুই প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এ কাজ করে। তখন বণিক নামে এক প্রার্থী দুপুরে ইউএনওর কাছে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের আবেদন দাখিল করে। অপরজন গৌতম সমদ্দারকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত বিএনপি ক্যাডাররা খোঁজাখুজি করছিল তার হাত দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন দাখিলের জন্য। উল্লেখ্য তপন বণিককে ধরে এনে তাদের নির্দেশ মতো মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন জমা দিতে বাধ্য করে। যখন সে প্রত্যাহারপত্র জমা দেয় তখন ভীত সন্ত্রস্ত , ফ্যাকাসে তপন বণিক স্বেচ্ছায় মনোনয়ন প্রত্যাহার করছে বলে দাবি কর। বিকাল তিনটা পর্যন্ত গৌতম সমদ্দারকে বিএনপি ক্যাডাররা খুজে পায়নি। তার খোজ চলছে তাকে দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন জমা দেবার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

আর এভাবে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে, ক্ষমতাশীন দলের প্রার্থীরা প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনেক সৎ ও যোগ্য লোককে নির্বাচনে প্রার্থী হতে দেন না বা প্রার্থীতা প্রত্যাহারে বাধ্য করেন।

৫.৪ এদেশের রাজনীতিতে সমস্যা ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা মোহ ঃ ক্ষমতাকে স্থায়ী করনের চেষ্টা

সন্দেহ নেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ১টি উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু এদেশে ক্ষমতাসীন সকল দলই চায় ক্ষমতাস্থায়ী করতে। তাই দেখা যায় এখন তারা ভবিষ্যৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রভাবিত করে এবং নিজেদের অনুকূলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আঘাত করছে, চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ২১ এপ্রিল ২০০৪

- **সংবাদ ভাষ্য ঃ ১ম পৃষ্ঠায় ১টা সংবাদের ভাষ্য ছিল- "দলীয় ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধান করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন"।**

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ দলীয় ব্যক্তিকে আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার লক্ষ্যে আবারও সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত বিচারপতিদের বয়স বৃদ্ধিসহ সংবিধান সংশোধনের প্যাকেজ প্রস্তাব রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞরা ও দেশের বিশিষ্ট আইনজীবিগণ। তারা বলেন, এই সংশোধনীর মাধ্যমে একদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গ্রহণযোগ্যতা এবং অন্যদিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা দু'বছর বাড়িয়ে দিয়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। বিচারপতিদের বয়সসীমা বৃদ্ধির পর বর্তমান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেন আগামী ২০০৭ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকবেন। সে ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানই হবেন আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান। দু'জন বিচারপতিকে

Dhaka University Institutional Repository

সুপারসিড করে কে এম হাসানকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছিল। কে এম হাসান, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় বিএনপির ষ্ট্যাডিং কমিটির সদস্য ছিলেন, রাষ্ট্রদূত পুলের সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বেও তিনি ছিলেন। তাছাড়া শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার অন্যতম আসামী ফারুক রশিদের আপন আত্মীয় এবং বর্তমান সরাকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানেরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। প্রধান বিচারপতি হিসাবে কে এম হাসানের নিয়োগকে অনেকটা দলীয় নিয়োগ বলে আখ্যায়িত করেন। সরকার অনেক হিসাব নিকাশ করেই কে এম হাসানকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করেছিল। সেই হিসাবেই তাকে আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনী করা হয় তাই আবারও দেখা দিয়েছে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। এ বিষয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

সাবেক আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেছেন বিচারপতির বয়স বৃদ্ধি করে সংবিধান সংশোধনীরে সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক। আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাতে সরকার দলীয় লোক হয় সেই হিসাব থেকে এই সংশোধনী করা হয়েছে। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতার ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করা গণতান্ত্রিক রীতি। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য এই সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে গণতন্ত্র ও মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল সুপ্রীমকোর্ট ক্ষতিগ্রস্ত বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ।

৫.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের অভিজ্ঞতা

অপরদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের চিত্রটাই অন্যরকম। দেশের ১ম সাংবিধানিক (সার্বিক ভাবে ২য়) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে গৃহীত হয় কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ঋণখেলাপীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেয়া তার মধ্যে অন্যতম।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়

প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রত্যয় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাফল্য এ ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রেখেছে। মার্চ ১৯৯৬ সালের অসহযোগ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে আমলাতন্ত্রের অংশগ্রহণ নিয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে তা দূর করেন এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে তেমন কোন রদবদল না ঘটিয়েই প্রশাসনকে নির্বাচন পরিচালনার আস্থাভাজন করে তোলেন। সচিবদের উদ্দেশ্যে দেয়া তাঁর একটি বক্তব্যের অংশ বিশেষ এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য "দেশে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় যে কোন হাওয়া বদল হোক না কেন, কর্ম বিভাগের শীর্ষে হয় সচিব হিসেবে বা অন্য কোনভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা অবস্থান করছেন তাঁদের গুরুদায়িত্ব হচ্ছে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। সাম্প্রতিককালের কোন ঘটনার দ্বারা তাড়িত বা প্রভাবিত হয়ে কোন অসতর্ক মূহুর্তে আপনারা এমন কিছু করবেন না, যার ফলে দেশের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় কিছু সরকারি কর্মচারীর অতিরিক্ত সংস্রব গড়ে উঠেছে। ১৯৪৫-৪৬, ১৯৫৪, ১৯৭০, ১৯৭৩ বা ১৯৯১-এর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এক নয়। বর্তমান কালের পরিস্থিতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্ন মীমাংসার অপেক্ষা রাখে, সেই মীমাংসা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারাই নিস্পন্ন হওয়া উচিত"।

প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশেষত অস্ত্র উদ্ধার ও নির্বাচনে সহিংসতা বন্ধ এবং প্রশাসনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ জন্য ড. মুহম্মদ ইউনুসকে প্রধান করে দু'টি উপকমিটি গঠন করেন। নির্বাচন পরিচালনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার অভুতপূর্ব সাফল্য পায়। নির্বাচনের আগেই যে পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হয় তা ছিল বিএনপির শাসনামলে উদ্ধারকৃত সমগ্র অস্ত্রের চেয়েও বেশি। নির্বাচনে ভোট দিতে এসেছিলেন ৭৫.৬১ শতাংশ ভোটার। ঋণখেলাপীদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেয়া হবে না, এমন সিদ্ধান্ত প্রথম নেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এমনকি দায়িত্ব পালন করার সময় ২০ মে ১৯৯৫- এ সেনাবাহিনীতে উদ্ভুত অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিকেও সর্তকতার সঙ্গে সামাল দিতে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বিরল দক্ষতার পরিচয় দেন। জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া হাবিবুর রহমানের আবেগ জড়িত তাৎক্ষনিক ভাষন, 'যেন বড় দুঃখী এই বাংলাদেশের মাটি ভাইয়ের রক্তে আর কলঙ্কিত করা না হয়' সামগ্রিক পরিস্থিতির রূপ পাল্টে দেয়।

অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে দেশের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়, ভোট প্রদানের হার বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বল দিকসমূহ

যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার এদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে, তারপরেও নির্বাচন ব্যবস্থায় রয়েছে দুর্বলতা। অপরদিকে, গণতান্ত্রিক মনমানসিকতা এখনো বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠেনি। কেননা রাজনৈতিক দলগুলো এখনো পরাজয়কে মেনে নিতে শিখে নি। এটা শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচিত বিষয়। তাইতো ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে জিমি কার্টার এদেশ সফর করেন, যাতে নির্বাচনে যে-ই পরাজিত হোক না কেন ফলাফলকে মেনে নিয়ে গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণে সফল ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও এ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। তারপরেও বহিঃবিশ্বের রাজনৈতিক মহলে শংকা ছিল যে, পরাজিত দল ফলাফলকে মেনে নিতে পারবে না। তাই বহিঃবিশ্বে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ জিমি কার্টার আসেন এদেশে।

দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা ৪ঠা আগষ্ট, ২০০১ এ প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়–

জিমি কার্টার দুই নেত্রীকে দু'টি পরামর্শ দিয়েছেন-

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রসিডেন্ট জিমি কার্টার বাংলাদেশের দুই নেত্রীকে নির্বাচন ও হরতাল প্রসঙ্গে দু'টি পরামর্শ দিয়েছেন। শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া উভয়ই তাঁর পরামর্শের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। পরামর্শ দু'টি হচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনে যে ফলাফল হবে তা মেনে নেয়া এবং আন্দোলনের নামে হরতাল বা এ ধরনের কোন কর্মসূচি না দেয়া।

গতকাল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া পৃথক পৃথক ভাবে জিমি কার্টারের সঙ্গে দেখা করেন। রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে তিনি উভয়ের কাছে এ দুটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

জিমি কার্টারের পরামর্শ মেনে নিলেন হাসিনা - খালেদা

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে সকলেরই উচিত ফলাফল মেনে নেয়া - শেখ হাসিনা

নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হলে ফলাফল যাই হোক মেনে নেবো - খালেদা জিয়া

কিন্তু বাস্তবে নির্বাচনের পরবর্তীতে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র, নির্বাচনে পরাজিত দল এ নির্বাচনকে বিভিন্ন ক্যু হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং পুনঃনির্বাচনের দাবী করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭ নির্বাচনী ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে কিছু সুপারিশ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও দৈনিক আজকের কাগজ, ৫ আগষ্ট ২০০১

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এদেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণে কিছু সুপারিশ পেশ করেন, যা রাজনৈতিক দলগুলো গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক দলগুলো ৫ দফা প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বলেছেন, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে পাঁচ দফা সমঝোতা চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে। এই সমঝোতার মধ্যে রয়েছে আগামীতে সংসদ বয়কট না করা এবং হরতালের মতো কর্মসূচী না দেয়া। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এই সমঝোতা প্রস্তাব লিখিত আকারে দেয়া হয়েছে। জিমি কার্টার তার চার দিনের সফরের ফলাফলের বর্ণনা দিতে গিয়ে সমঝোতা চুক্তির কথা জানান। উক্ত সম্মেলনে জিমি কার্টারের সঙ্গে আরো উপস্থিত ছিলেন টিইয়োলং সামোরা, প্যাট্রিক মেলো, এ্যাশলি ব্যারসহ এনডিআই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। জিমি কার্টারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এই সমঝোতা চুক্তির প্রস্তাব তৈরি করা হয়। জিমি কার্টার বলেন, যে পাঁচ দফা সমঝোতা চুক্তিতে রাজনৈতিক দলগুলো সম্মত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে

১. সব রাজনৈতিক দলই প্রতি নির্বাচনী বুথে একজন করে দেশী নির্বাচনী পর্যবেক্ষক রাখতে সম্মত হয়েছে- যার কোন দল কিংবা প্রার্থীর প্রতি আনুগত্য না থাকার সার্টিফিকেট নির্বাচন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার রিটার্নিং অফিসার দেবেন এবং কোন প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সম্পর্কে কোন আপত্তি না থাকলে তাকে সংশ্লিষ্ট বুথে বহাল করা হবে। পোলিং বুথের প্রিসাইডিং অফিসার দলীয় আনুগত্যের অভিযোগে অভিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি এবং এমন কি দেশি পর্যবেক্ষকদেরকেও বহিষ্কার করতে পারবেন। এ ধরণের অভিযোগে অভিযুক্ত না হলে পর্যবেক্ষকরা বুথে থাকতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

২. সব রাজনৈতিক দলের নেতারা সন্ত্রাস এবং যে কোন ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি পরিহার করবে এবং এ জন্যে নির্বাচন কমিশন প্রণীত 'কোড অব কনডাক্ট' মেনে চলবে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারেও রাজনৈতিক দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদক্ষেপকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে।

৩. সব রাজনৈতিক দলের নেতারাই সম্মত হয়েছেন যে, তারা আগামী সংসদ বয়কট করবেন না এবং একজন নির্দলীয়, নিরপেক্ষ স্পিকারের প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন দেবেন। যখন একজন সাংসদ জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হবেন, তখন থেকেই তিনি তার দলের কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন না। দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক দলেগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে ৯ দফা সুপারিশ পেশ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্বক সমর্থন ও সহযোগিতা করা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দলীয় চরিত্রের মতো নির্বাচন কমিশনকেও একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে হবে এবং এ ব্যাপারেও রাজনৈতিক দলগুলোকে সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাকে সমর্থন দিতে হবে।

৪. সংসদের মহিলা সংরক্ষিত আসন ৬০-এ উন্নীত এবং পরবর্তীতে সরাসরি নির্বাচনের বিধি।

৫. রাজনৈতিক দলগুলো আগামীতে আর হরতাল দেবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ছবি ঃ ৫.৪

বাংলাদেশের দু'নেত্রী জিমি কার্টারের পরামর্শ মেনে নেয়ার পর করমর্দনরত

একটি নতুন সম্ভাবনা- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বাংলাদেশের দুই নেত্রীকে পরামর্শ দিলেন
মেনে নিলেন হাসিনা খালেদা- ৪ আগষ্ট ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা ঃ তত্ত্বাবধায়ক ও দলীয় সরকারের সময়কাল

দেশের প্রধান ১০টি দৈনিক পত্রিকা পর্যালোচনা করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও দলীয় সরকারের শাসনামলের প্রথম তিন মাস এর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির একটি স্পষ্ট ধারনা লাভ করা যায় নিম্নের টেবিল থেকে।

টেবিল ঃ ৫.১

১ম ৩ মাস-আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঃ তত্ত্বাবধায়ক ও দলীয় সরকারের সময়কাল

সরকার ব্যবস্থা	সরকার প্রধান	সময়কাল	নিহত	আহত	ধর্ষণ
তত্ত্বাবধায়ক সরকার	শাহাবুদ্দীন আহমেদ	১০৫ দিন	৬ জন	২০৫ জন	১১ জন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার	হাবিবুর রহমান	৮৬ দিন	৪৬ জন	৮৪৫ জন	৪৭ জন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার	লতিফুর রহমান	৮৮ দিন	৯৬০ জন	১৫৬১ জন	১৩৫ জন
দলীয় সরকার	বিএনপি	১৯৯১ থেকে ১ম ৩ মাস	৩০ জন	১৮৭ জন	৩৯ জন
দলীয় সরকার	আওয়ামীলীগ	১৯৯৬ থেকে ১ম ৩ মাস	১৭ জন	৯৮ জন	৩৯ জন
দলীয় সরকার	বিএনপি	২০০১ থেকে ১ম ৩ মাস	৭৫৬ জন	২৩৭৭ জন	৮২৩ জন

উৎস ঃ দৈনিক পত্রিকা থেকে সংকলিত

উপরোক্ত ৫.১ টেবিল এর পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট স্থিতিশীল ছিল। অপরপক্ষে, দলীয় সরকারের শাসনামলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল প্রচন্ড অস্থিতিশীল। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের জনগণ আরও আশা করে যে, এখন তিন মাসের জন্য তুলনামূলক শান্তিতে থাকা যাবে। রাজনৈতিক দল বা মহলের আশীবাদপুষ্ট সশস্ত্র ক্যাডারদের দৌরাত্ম কিছুটা কমবে। কোথাও অন্যায় কিছু ঘটলে ন্যায় বিচার লাভের সুযোগ থাকবে।

দলীয় সরকারের আমলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির একটি কালো অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৯৫ এর ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনে। কেবল মাত্র নির্বাচনের দিনেই এসময় সরকারি তান্ডবে মৃত্যু হয় ১৫ জনের। এর আগে পরে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিহত হয় আরও ৯৭ জন। কমপক্ষে ১৯২ দফা গোলাগুলি হয়, বোমাবাজির ঘটনা ঘটে ৩৩৪ টি, ১৪৭ এলাকায় আগুন লাগানো হয়।

দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা ২৭ জুলাই ২০০৪

❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ** 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক- হতাশা নয়'

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। প্রত্যাশা যেখানে থাকে অকারণে সেখানে অনেক হতাশাও আসে একই পরিমাণে। এদেশে সমস্যার অন্ত নেই। সকল দেশেই সমস্যা আছে। সে সমস্যা সরকারই সমাধান করে দেশের জনগণের সহায়তায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপপূর্ণ। রাষ্ট্র দেশের জনগণকে নিয়েই, সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব সমস্যার সমাধান নব্বই দিনে করবে এ চিন্তা বা ধারণা একেবারেই অমূলক। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার ইতিহাস বিস্মৃত হলে চলবে না।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সামরিক শাসন চলাকালীন সময়ে নির্বাচন হয়ে দাঁড়ায় অবিশ্বাসযোগ্য। সামরিক সরকার প্রধানরা সংবিধান লংঘন করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করে এবং সেই শাসন ক্ষমতা স্থায়ী করার লক্ষ্যে সংবিধানকে ব্যবহার করে। যখনই সংবিধান অন্তরায় হয়েছে তখনই অসংবিধানিক ও অবৈধভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে সামরিক সরকার প্রধানরা। বাংলাদেশের সংবিধান লংঘন করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করে এবং সেই শাসন ক্ষমতা স্থায়ী করার লক্ষ্যে সংবিধানকে ব্যবহার করে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হয়েছিলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে। ত্রয়োদশ সংশোধনী যে সরকারের ব্যবস্থা করেছে তার নামকরণ করা হয়েছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এর মেয়াদ সীমিত। প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকে নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তার কার্যভার গ্রহণ করবার তারিখ পর্যন্ত । প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণকালে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার বা দেয়ার পর থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া বা দেয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২০ দিন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত সরকার নয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে ও সহায়তায় উক্তরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।' এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে। জনগণের প্রত্যাশা এর অধিক হওয়া কোন মতেই বাঞ্চনীয় নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে এ প্রত্যাশা করা অনুচিত হবে যে, ঐ সরকার নির্বাচিত সরকারের ভুলত্রুটি সংশোধন করবেন বা নির্বাচিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যার সঙ্গে নির্বাচন সম্পৃক্ত নয় সেগুলো সমালোচনা করে নীতি পরিবর্তন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। জনগণকে স্মরণ রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তার সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।' জনগণকে আরও স্মরন রাখতে হবে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্যগণ উপদেষ্টা বলে অভিহিত হবেন এবং তারা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।' তারা মন্ত্রী নন। প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রী নন সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের প্রধান নির্বাহী এবং তাঁর দায়বদ্ধতা সংসদের নিকট, কিন্তু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

এই পার্থক্যটুকু যদি সামনে রাখা যায় তাহলে জনগণের প্রত্যাশা সীমিত হবে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৈনন্দিন কার্যাবলী ছাড়া অন্য যে কাজটির জন্যে তাদের নিয়োগ তা হচ্ছে 'শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচনের জন্যে যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হবে নির্বাচন কমিশনকে সেরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাধায়ক সরকারের রূপ হবে নির্দলীয়। ঐতিহাসিকভাবে নির্বাচন নিরপেক্ষ সুষ্ঠু করার জন্যেই ২ক পরিচ্ছদ যুক্ত হয়েছে সংবিধানে। সরকারের যারা উপদেষ্টা হবেন তাদের কোন বিশেষ দলের প্রতি আনুগত্য থাকবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব কাজ করবেন তা ২ক পরিচ্ছদে বর্ণিত কর্তব্যের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করা। কিন্তু সরকারের উপদেষ্টাদের যদি দলীয় মানসিকতা থাকে তাহলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে বলে দাবি করতে পারবেন না তত্ত্বাবধায়ক সরকার। '৯১ ও '৯৬ এ দু'টি নির্বাচন হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। জনগণের মনে কোন সংশয় ছিলো না ঐ দু'টি সরকারের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে। জনগণের প্রত্যাশা যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনই এমন কাজ করবে না- যা জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করে। আন্তরিকভাবে জনগণের প্রত্যাশা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোন বিতর্কে জড়াবে না যাতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

৫.৯ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ

দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা ১০ আগষ্ট -২০০১

বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচনী ব্যবস্থার আরেকটি দুর্বলতা হচ্ছে নির্বাচনী আইনের কঠোর ব্যবহার না হওয়া। এ জন্যে ১০ আগষ্ট ২০০১ আজকের কাগজ এ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে নিম্নরূপ লেখা হয়।

নির্বাচনী আইন বাস্তবায়নে কঠোর হতে হবে

নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী আইন সংস্কার করে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করলেন। সেনাবাহিনীসহ সকল বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা, নির্বাচন কমিশনের বিচারিক ও বিধি প্রণয়নের এখতিয়ার, দেশী-বিদেশী নাগরিকদের পর্যবেক্ষনের সুযোগ, সরাসারি হাইকোর্টে নির্বাচনী মামলা দায়ের, জামানতের টাকা বাড়ানো এবং ব্যয়সীমা বেঁধে দেয়া, রসিদ নিয়ে রাজনৈতিক দলের অনুদান গ্রহন, হিসাব রক্ষণসহ বেশ কিছু বিষয় এই সংস্কারে স্থান পাওয়ায় তা নির্বাচন অনুষ্ঠানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এ ক্ষেত্রে আরো অনেক কিছুই করার আছে। বিশেষ করে কালো টাকা ও পেশী শক্তিকে কার্যকরভাবে দমন করার প্রচেষ্টা থাকতে হবে। এজন্য কালো টাকা ও পেশী শক্তির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে জনগণকে সংগঠিত ও সচেতন করা হলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে আইন সংস্কারের জন্য এ দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে।

নির্বাচনী ব্যয়সীমা ৩ লাখ থেকে বাড়িয়ে পাঁচ লাখ টাকা করা হয়েছে। এই ব্যয়সীমাও আসলে কাগজে-কলমেই থেকে যাবে। কারণ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগেই কেউ যদি কোটি টাকা খরচ করে থাকে, তবে পরে ৪ লাখ বা ৫ লাখ টাকা খরচ করলেও নির্বাচনী আইন মানা হলো কিনা সে প্রশ্ন থেকে যাবে। আসলে দরকার যারা নির্বাচনে অংশ নেবেন তাদের মধ্যেই সততা। নীতিনিষ্ঠভাবে নির্বাচনের আসল উদ্দেশ্য ধারণ করতে হবে প্রার্থীকে। আইনতো থাকবেই, কিন্তু জনগণের প্রতি, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি প্রার্থীর যে দায়িত্ব আছে সেটা যদি তারা সততার সঙ্গে পালন না করেন তাহলে আমরা নীতিবান সাংসদ পাব না।

নির্বাচনী আইন সংস্কারের জন্য আরো অনেক কিছুই করার আছে, ভবিষ্যতে সেটা হবে বলেও আমরা মনে করি। বর্তমানে যেটুকু সংস্কার হয়েছে সেটাকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে আইন বাস্তবায়নে কঠোর না হলে সবই অর্থহীন হয়ে যাবে।

৫.১০ নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনী মামলা

❑ **সংবাদ ভাষ্য ঃ** যার নিষ্পত্তি ঘটতে ঘটতে নির্বাচিত সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় -

সংবাদ বিশ্লেষণ ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে এবং কোন আসনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রার্থী নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে মামলা করলে সে মামলার নিষ্পত্তি প্রায়শই ঘটেনা। এক্ষেত্রে পরাজিত প্রার্থী অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার পায়না, যা এদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি দূর্বল দিক হিসেবে বিবেচিত। এভাবে নির্বাচনী ট্রাইবুনালে মামলাগুলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় নিমজ্জিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায়-

ভোটের মামলার নিষ্পত্তি হয় না

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ভোলা-১ আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদের নির্বাচনের বিরুদ্ধে পরাজিত প্রার্থী মোশাররফ হোসেন শাজাহান নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেন। দুটি আসনে বিজয়ী তোফায়েল আহমেদ ভোলা-১ আসনটি ছেড়ে দিলে নির্বাচন কমিশন এখানে উপনির্বাচন ঘোষণা করেন। অথচ এ সময় মোশাররফ হোসেন শাজাহান এর নির্বাচনী মামলা চলছিল। কিন্তু এর কিছুদিন পর বিভাগীয় নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল মামলাটি খারিজ করে দেন। নির্বাচন কমিশন এখানে উপনির্বাচন করার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই জনাব শাজাহান এ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করেন। একই সঙ্গে তিনি আবারও উপনির্বাচনের বিরুদ্ধে স্থগিততাদেশ লাভ করেন। এ অবস্থায় মামলাটি হাইকোর্টে ঝুলে থাকে শেষ পর্যন্ত।

নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের রায়ে সপ্তম সংসদের যে বিজয়ী সাংসদদের পুরো কিংবা আংশিক নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিলো তারা হলেন টাঙ্গাইল-২ আসনে আওয়ামী লীগের খন্দকার আসাদুজ্জামান, নারায়ণগঞ্জ-২ আসনে আওয়ামী লীগের এমদাদুল হক ভূঁইয়া, ঢাকা-১০ আসনে একই দলের ডা.এইচ বি এম ইকবাল, নেত্রকোনা-৩ আসনে বিএনপির নূরুল আমিন তালুকদার, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে একই দলের মোঃ মোজাম্মেল হক এবং পিরোজপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী। এরা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপিল বিভাগে আবেদন করে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ লাভ করেন। এসব মামলার মধ্যে খন্দকার আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ঢাকা বিভাগীয় নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল একতরফা রায় ঘোষণা করেন। কারণ তিনি ট্রাইব্যুনালের মামলায় হাজির হননি।

ট্রাইব্যুনালে থাকা মামলাগুলো নিষ্পত্তি না হলেও সপ্তম সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামলাগুলোও আপনা আপনিই শেষ হয়ে যায়।

ভবিষ্যতে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির কোন ব্যবস্থা হবে কি?

বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার আরেকটি দুর্বল দিক হলো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গণতান্ত্রিক চরিত্রহীনতা। **১৭ আগষ্ট ২০০১ জনকণ্ঠে দেখা যায়।**

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন আর দলবদলের খেলা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাংলাদেশে। মনোনয়ন না পেয়ে কিংবা ভোটে জেতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে জামাকাপড় পাল্টানোর মতো অনায়াসে দল বদলাতে পারেন আমাদের রাজনীতিকরা। এ রকম দল পাল্টানোর ভেল্কিবাজি দেখাচ্ছেন প্রত্যেক সপ্তাহেই দু'তিন রাজনীতিবিদ। নির্বাচনের দাবিতে চারদলীয় জোটের কথিত 'সরকার পতনের আন্দোলন' স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে শেষ হয়ে যাওয়ার পর শুরু হয়েছে দলবদলের খেলা, বিভিন্ন স্থানে হত্যা-খুন আর সন্ত্রাস। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভাষ্য অনুযায়ী ক্ষমতা ছাড়ার পর বিএনপির সন্ত্রাসীদের হাতে তাঁদের কমপক্ষে ৮৬ জন নিহত হয়েছেন। এ লেখা তৈরির সময় আমাদের সামনে রয়েছে একটি দৈনিকের লিড নিউজ- 'সোনাগাজিতে বিএনপি কর্মীদের গুলিতে আওয়ামী লীগের ১০ জন আহত'। অবশ্য এসব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক ধারায়।

নির্বাচন- রাজনীতিতে দলবদল একটা ফ্যাশন

নূর মোহাম্মদ মন্ডল আমাদের মতো যদু-মধু কেউ নন। গেল সংসদ নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় পার্টি থেকে রংপুর-৬ আসনে। পরে রাজনীতির দাবাখেলায় পার্টিটা দু'খন্ড হলে এরশাদের কোল ছেড়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন মিজান-মঞ্জু ব্রাকেটবন্দী জাতীয় পার্টিতে। গত মে মাসে এই মন্ডল সাহেব চিঠি লিখে তিনি চেয়েছিলেন কিছু বিশেষ সুবিধা। দু'টি সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল, চিঠিতে তিনি সরাসরি লিখেছেন যে, 'আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনি যদি আমাকে দিয়ে নির্বাচন করানোর ইচ্ছা পোষণ করেন তা হলে নির্বাচনের সুবিধা দেয়ার অনুরোধ করছি।' মন্ডল সাহেব ভণিতা করেন নি, কেননা তাঁর হিসাব খুবই পরিস্কার। ব্রাকেট লাগানো দলের অবস্থা যে তেমন আশাপ্রদ নয় তা বুঝতে তার দেরি হয়নি। অতএব সম্ভাবনা আছে এমন দলে চলে যাওয়াই ভাল। দলবদলের এই প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পক্ষের ওপর ভরসা করার কোন মানে হয় না।

নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার আরেকটি সমস্যা এদেশের গণতন্ত্রের জন্য

রাজনৈতিক ও দলীয় ব্যানারে নির্বাচন করলেও আগামী নির্বাচনে প্রার্থীর ভোটে জেতার বিষয়টি অনেকাংশেই নির্ভর করছে কালো টাকার ছড়াছড়ি ও অস্ত্রবাজির ওপর। কিন্তু সাধারণ ভোটাররা ভবিষ্যতের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে প্রত্যাশা করছে এসব প্রতিরোধের। প্রকৃতার্থে তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের দৃঢ়ভাব ওপরেই নির্ভর করছে অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিস্থিতি তৈরি হবে কিনা।

৫.১১ উপসংহার

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সংবাদ, প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এ কথা স্পষ্ট যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ হলো শুধু নির্বাচন পরিচালনা করা। এ ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক বৃদ্ধি না পায় এবং পরাজয়কে রাজনৈতিক দলগুলো ভালোভাবে মেনে না নেয় তা হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরর্থক। তাই সকলের প্রত্যাশা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হবে তাহলো পারস্পরিক সহযোগিতা। তাহলেই কেবল সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সফলতা জনগণ অনুধাবন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাফল ও সিদ্ধান্ত

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাফল ও সিদ্ধান্ত

আলোচ্য গবেষণাটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ভিত্তিক পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন পেশা শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের নির্দেশিকা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের সাপেক্ষে নিম্নোক্ত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যাবলী হলো-

১. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে-' বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি একটি নতুন ধারণা, এতে কোন সন্দেহ নেই। যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পর যে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, সে গণতান্ত্রিক সরকার যদি বিরোধী দলের অগণতান্ত্রিক বিরোধীতার কারণে উন্নয়ন অগ্রগতি ও জনকল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে না পারে এবং জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে না পারে, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করে কোন লাভ নেই।

২. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও গণদারিদ্র মোকাবেলায় অর্থ্যাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এদেশে অনেক মডেলের সৃষ্টি হয়েছে তেমনি রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নবতর সংযোজন ও মডেল হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। পৃথিবীর অনেক দেশ আজ এ ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে, গভীর পর্যবেক্ষন করছে এবং স্বীয় দেশে প্রয়োগের চিন্তা ভাবনা করছে। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের কিছু ঘটনা এবং নির্বাচনে পরাজয় বরণ কারী রাজনৈতিক দলের মন্তব্য এ ব্যবস্থাকে প্রশ্ন সাপেক্ষ করে তুলেছে। তাই অধিকাংশ জনগণের মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সফল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে গণমুখী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. দীর্ঘ সংগ্রামের পর সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা পেলেও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আজ অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি। রাজনৈতিক সহিংসতা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার, প্রধান রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে চরম অসহিষ্ণু মনোভাব এবং সর্বোপরি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কিছু কিছু পদক্ষেপ ও ভূমিকা বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে।

৪. আলোচ্য গবেষণায় সর্বমোট ২৩৪ জন বিভিন্ন স্তরের জনগণ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৩% ছিল মহিলা এবং বাকী ৫৭% ভাগ ছিল পুরুষ।গবেষণার জন্যে সমাজের সকল স্তরের লোকজন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জনসাধারণের মতামত জরীপে সর্বমোট ১৮০ জন উত্তরদাতার কাছ হতে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৯% ছিল মহিলা। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী (পেশাজীবি বিশেষ শ্রেণীর) ৫৪ জনের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর মধ্যে পুরুষদের হার ছিল দৃষ্টমান বেশী (৫১%)।

৫. উত্তরদাতাদের বয়স সীমা ছিল ২০বছর হতে৭০ বা তদূর্ধ্ব বয়স পর্যন্ত। যার মধ্যে সর্বোচ্চ (৩২%) সংখ্যক উত্তর দাতার বয়স সীমা ছিল ৫০-৫৯ বছরের মধ্যে।

৬. আলোচ্য গবেষণায় উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যার উত্তরদাতা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। অপরদিকে, পেশাজীবি বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অগ্রাধিকার ছিল অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক।

৭. বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যক্তিবর্গ হতে উত্তর ও মতামত সংগৃহীত হয়, যার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৯১%) ছিল উচ্চ শিক্ষা স্তরের এবং সর্বনিম্ন ছিল এস. এস. সি. এর নীচের স্তরের।

৮. **গবেষণায়** মতামতদানকারী সাধারণ জনসাধারণ মনে করেন বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

৯. মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে শতকরা ৭৭% উত্তরদাতা সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। অপরদিকে, মাত্র ৩৩% উত্তরদাতা সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১০. মতামতদানকারীদের মতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাঁধাসমূহ হচ্ছে কালো টাকা ও অস্ত্র, সন্ত্রাস, প্রশাসনেরর পক্ষপাতদুষ্টতা, রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ, স্থান বিশেষে বিশেষ দলের প্রভাব, গণ-অসচেতনতা, জাল ভোট প্রদান, গণ-দারিদ্র ও প্রার্থী কর্তৃক ভোট ক্রয়, নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব ইত্যাদি। অপরদিকে, দলীয় সরকারের অধীনে শতকরা ৬৪ জন ভোটারকেই ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১১. বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই মতামত দিয়েছেন যে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে বুথে দেখেন যে বিশাল সাজানো লাইন কিংবা তার ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে। এছাড়া ভোটদানের সময় যে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হচ্ছে জাল ভোট প্রদানের প্রবনতা বেশী থাকে, কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। অনেক উত্তরদাতা বলেছেন যে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থীর এজেন্টরা কেন্দ্রের ভিতর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে বুথের ভিতর প্রভাবশালী প্রার্থীর এজেন্টের সম্মুখে ব্যালটে সিল মারতে বাধ্য করা হয়েছে।

১২. গবেষণায় দেখা যায় তুলনামূলক ভাবে কেন্দ্র দখল সহ এরূপ ঘটনা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অধীক ঘটে। জাতীয় নির্বাচনে শতকরা ৬% ক্ষেত্রে কেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ৫% ঘটে দলীয় সরকারের অধীনে আয়োজিত নির্বাচনে।

১৩. বেশীরভাগ উত্তরদাতাই (৩৬%) মনে করেন যে, নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর সহনশীলতা। এরপরে দেখা যায় শতকরা ২৬ জন উত্তরদাতা নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সরকারি পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন ১২%। অপরদিকে, প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থা আধুনিকায়ন সহ নির্বাচনী নীতিমালা ও আইন সংস্কারের পক্ষে মতামত দিয়েছেন ১২% উত্তর দাতা, যাহোক ৬% অংশগ্রহণকারী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. শতকরা ৮৬ ভাগ উত্তরদাতাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সাথে অন্যান্য সময়ের নির্বাচনের সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুধাবন করেছেন। অধিকাংশের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

১৫. গবেষণায় একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ভোটার উপস্থিতি বেশী থাকে। শতকরা ৮৪ জনের মতামত অনুযায়ী সাধারণ ভোটারদের ভোটদানের উপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যথাসম্ভব নিরক্ষেভাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয় বলে নিজেদের মতামত ভোটের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে প্রকাশের সুযোগ থাকে।

১৬. গবেষণায় দেখা যায় শতকরা ৯৪ জন উত্তরদাতার মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কালে গণ-মাধ্যমের মাধ্যমে ভোটার উদ্বুদ্ধ করণে বিভিন্ন প্রচারণা নিরপেক্ষভাবে প্রচার করা হয়। যার ফলে জনগণ এ সময় ভোটদানে দলীয় সরকারের সময়ের তুলনায় বেশী উৎসাহি হয়।

১৭. গবেষণায় যে বিষয়টি আরো প্রতীয়মান হয় শতকরা ৭৪ ভাগ উত্তরদাতাই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে ভোট দানে অনীহা প্রকাশ করেছেন।

১৮. গবেষণায় নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন আয়োজনে অধিক সফল এ ক্ষেত্রে শতকরা ৯১ জন উত্তরদাতাই মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচন আয়োজনে অধিক সফল এবং ৬৯ % মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়না।

১৯. তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কোন্ কোন্ নির্বাচন হওয়া উচিত? - এ প্রশ্নে বেশীরভাগ (৬৬%) উত্তরদাতাই মনে করেন যে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনসহ সকল স্তরের নির্বাচনই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিত। কেননা এতে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে এবং ব্যয় কমবে, স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারি দলের প্রভাব থাকবেনা। অপরদিকে, মাত্র ৪ ভাগ উত্তরদাতা এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন।

২০. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প সম্পর্কে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা ৯৩ ভাগই মনে করেন যে এদেশের প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন বিকল্প নেই। অপরদিকে, ৭% বিকল্প হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন এবং দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার কথা উল্লেখ করেছেন।

২১. অনেক উত্তরদাতা মনে করেন যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মতো আমাদের দেশেও দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব। তবে যদি নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

২২. দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কিত মতামতে মতামত দানকারীদের শতকরা ৭১ ভাগ এর মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় ভাল থাকে। কেননা এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চাপবিহীন নিরপেক্ষভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

২৩. বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা উদ্ভবের কারণ হিসেবে অধিকাংশ জনগণ মনে করেন যে দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস বিদ্যমান, কারো প্রতি কারো কোন আস্থা নেই এবং আমলাদের দুর্নীতি ও দলীয় সংশ্লিষ্টতা, নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা ইত্যাদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা উদ্ভবের মূল কারন।

২৪. অধিকাংশ (শতকরা ৯৭ ভাগ উত্তরদাতা) মানুষই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন এবং এ ব্যবস্থাকে একটি গ্রহণ যোগ্য ব্যবস্থা হিসেবে মনে করেন।

২৫. ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৮ ভাগ অন্যান্য নির্বাচনের ভোট প্রদানের তুলনায় বিশেষ পার্থক্য অনুভব করেন। অপরদিকে, ১২ ভাগের নিকট কোন রূপ পার্থক্য অনুভূত হয়নি।

২৬. শতকরা ৭৩ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। ২০% উত্তরদাতা বিরত ছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র ৭ ভাগ মনে করেন নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কেন সম্ভব নয়?- এ প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাগণ বিভিন্ন কারণ সনাক্ত করেছেন। ৬০% এর মতে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের সময় প্রশাসন সরকারের নির্দেশে চলে। অপরদিকে, ৩০ ভাগ মনে করেন এ সময় সরকারের দলীয় ক্যাডারদের দৌরাত্য বেশী থাকে এবং তারা এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অদৃশ্য কোন ইংগিতে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

২৮. অধিকাংশ জনগণ (৫২%) দেশে বিরাজমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতি তাদের আস্থাহীনতা প্রকাশ করেছে। অপরদিকে, মাত্র ২০% জনগণের মধ্যে দেশে বিরাজমান গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রয়েছে বলে প্রকাশিত হয়েছে।

২৯. ২৮% উত্তরদাতা দেশের বিরাজমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আংশিক আস্থার কথা বলেছেন। যাদের আস্থা নেই তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, যেখানে মানুষের দু'বেলা অন্নের নিশ্চয়তা নেই অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর এবং দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে তাদের নিকট গণতন্ত্র অর্থহীন।

৩০. দেশের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করনের উপায় হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এর পরে পর্যায়ক্রমে তারা গঠনমূলক রাজনীতি (২৬%) ও শিক্ষার প্রসার (২০%) এর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন।

৩১. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে বিভিন্ন বিষয়ে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত মতামতের হার প্রতিফলিত হয়েছে। শতকরা ৮২ জন উত্তরদাতা মনে করেন দায়িত্ব পালনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীক নিরপেক্ষ থাকে, মাত্র ৭% ভাগের মতে এ সময় নির্বাচন কমিশনে নিরপেক্ষতা থাকেনা। ২৮% ভাগের মতে আমলারা আংশিক নিরপেক্ষ এবং ৬১% ভাগের কাছে আমলারা নিরপেক্ষ থাকেন বলে মনে হয়।

৩২. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনো নীচের দিকের স্তরেই রয়েছে। পরাজয়কে হাসি মুখে মেনে নেয়া, জনগণের ম্যান্ডেটকে সম্মান জানানো এবং বিজয়ী প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানানোর রেওয়াজ চালু না হলেও শতকরা ৯২ ভাগের মতে নির্বাচনী ফলাফল গ্রহণের হার

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ৯১ এর নির্বাচনের পর পরাজিত দলের প্রধান সাক্ষ্য কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ উপস্থাপন করেন, ৯৬ এর নির্বাচনে পরাজিত দলের দলনেত্রী নির্বাচনী ফলাফলকে পুকুরচুরির এবং ২০০১ এর নির্বাচনে পরাজিতের স্থূল কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন সত্ত্বেও পরাজিত দলগুলো ফলাফল মেনে নিয়ে সংসদে যোগ দিয়েছে।

৩৩. সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদ নিয়েও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীরা একাধিক মতামত প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকার দানকারী ৪ জন আইনজীবির মধ্যে ৩ জন আইনজীবি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী মনে করেনা। শুধুমাত্র একজন আইনজীবী তত্ত্বাবাধায়ক সরকার ধারণাকে সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী মনে করেন। পূর্বে উল্লেখিত ৩ জন আইনজীবীর মতে- যেহেতু তা কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে, জাতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকালীন সময়ের জন্য এ সরকার কাজ করবে, দেশ শাসনে বা রাষ্ট্রের পলিসি নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে এ সরকারের কোন ভূমিকা না থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নয়।

৩৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত ভিত্তির ক্ষেত্রে মতামতদানকারীরা বলেন- সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত ভিত্তি রূপ লাভ করে। অধিকাংশ আইনজীবী উল্লেখ করেন- সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৮, ৪৮ এবং ৫৬ অনুচ্ছেদের কোন সংশোধন হয়নি। অতএব এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোতে প্রভাব ফেলেনি। যার ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্র একদিকে যেমন সংহত হয়েছে অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনগত ভিত্তিও রূপলাভ করেছে, যার জন্যে গণভোটের প্রয়োজন হয়নি।

৩৫. বেশিরভাগ সংবিধান বিশেষজ্ঞ/আইনজীবিই মনে করেন সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি সংযোজন সংবিধানের প্রকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করলেও এতে সংবিধান লংঘিত হয়নি।

৩৬. মতামতদানকারী সংবিধান বিশেষজ্ঞদের ৬০ ভাগ মনে করেন নির্বাচনী অনিয়ম দূরীকরনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ সমূহ ছিল আইনসম্মত। অপরদিকে, ৩০ ভাগ মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তাদের কর্মকান্ড অনেকটাই যুক্তিসম্মত।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. বেশির ভাগ আইন বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, এ ব্যবস্থাকে আরো ফলপ্রসু করার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন। তাদের মতে নির্বাচনকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী রাষ্ট্রপতির অধীনে না রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে থাকা উচিত।

৩৮. সংবিধানের ১২০নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত এ নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হবে সেরূপ সংখ্যক কর্মচরী প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী প্রদানের ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টার হাতে অর্পন করা সমীচীন।

৩৯. আইন বিশেষজ্ঞদের নিকট নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে মতামতদানকারী শতকরা ৮০ জনই বলেছেন সংবিধানের ৫৮ঘ অনুচ্ছেদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব কি হওয়া উচিত তা উল্লেখ রয়েছে। তা হলো ৫৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হবে নির্বাচন কমিশনকে সেরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করবেন।

৪০. আইন বিশেষজ্ঞরা সংবিধানের ৫৮ (ঙ) ধারার সমালোচনাকরে বলেছেন, এ ধারার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আইন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সকল বিষয়ে না হলেও নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহন বাধ্যতামূলক করা উচিত।

৪১. আইন বিশেষজ্ঞবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালনে কিছু আইনী সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। এ সময় তারা দেশ পরিচালনার ব্যাপারে জরুরী প্রয়োজনে কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। কিংবা নির্বাচনে প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়োগে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনী সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগের পর যদি তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত

Dhaka University Institutional Repository

হয় তবে তাদেরকে অপসারণের সুনির্দিষ্ট বিধি নাই বা থাকলে ও তা স্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারে নতুন আইন প্রনয়ন করা উচিত।

৪২. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জনগণের ম্যান্ডেট আছে কি না এ বিষয়ে আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মাঝে বির্তক পরিলক্ষিত হয়েছে। অধিকাংশের মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনির্বাচিত সরকার হলেও তাদের জনগণের ম্যান্ডেট রয়েছে। কেননা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছিল অর্থাৎ জনগণ ও রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিই এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে জনগণের পরোক্ষ ম্যান্ডেট রয়েছে।

৪৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প রয়েছে কিনা-এ প্রশ্নের ক্ষেত্রে ৬৬% ভাগ আইনজ্ঞের মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর কোন বিকল্প নাই। অপরদিকে ৪৪% ভাগ এর মতে বিকল্প রয়েছে। তারা বিকল্প হিসেবে স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিকীরণ, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ইত্যাদিকে উল্লেখ করেছেন।

৪৪. উত্তরদানকারী ৮০% মনে করেন নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। ২০ ভাগ মনে করেন দেশের জনগণের সার্বিক অবস্থা পরিবর্তন (জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা দরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ) ব্যতীত কোন ব্যবস্থার অধীনে সঠিক সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয়।

৪৫. অধিকাংশ উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আবারো শক্তিশালী করনে কিছু আইনী সংস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের হাতে অর্পনের কথা বলেছেন।

৪৬. রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মতামতদানকারী মনে করেন নির্বাচনে পরাজয়ের পর পরাজিত দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যেরূপ বর্তমান সংসদ নির্বাচনের পর পরাজিত দল বলেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করেছিল। কিন্তু সামষ্টিক অর্থে অর্পিত দায়িত্ব পালনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ বলে ৯০% ভাগ উত্তরদাতাই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. নির্বাচন আয়োজনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বেঁধে দেয়া সময় সীমাকে শতকরা ৯৫ ভাগ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই পর্যাপ্ত মনে করেন। কিন্তু উত্তরদানকারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে ৭০% ভাগ এ সময়সীমাকে অপর্যাপ্ত মনে করেন।

৪৮. শতকরা ৮৬ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। অপরদিকে, মাত্র ১৪ ভাগ মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও পুলিশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৪৯. শতকরা ৯২ জন উত্তরদাতা মনেকরেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু দলীয় সরকারের সময়কালে মাত্র ৮% উত্তরদাতা করেন যে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে দায়িত্বপালন করতে পারেন। উত্তরদাতা তাদের মতামতে বলেছেন, যদিও সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, কিন্তু দলীয় সরকার নির্বাহী ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৫০. অপরদিকে, শতকরা ৮২ ভাগ উত্তরদাতা তাদের মতামতে বলেছেন যে, প্রিসাইডিং অফিসার কিংবা পোলিং অফিসার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় স্বাধীন নিরপেক্ষভাবে তাদের উপর অর্পিতদায়িত্ব পালন করতে পারে, কিন্তু দলীয় সরকারের সময় মাত্র ১৮% মনে করেন যে, তারা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন সক্ষম হন।

৫১. অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬০%) মনে করেন, বর্তমানে স্থানীয় নির্বাচন ব্যবস্থা সঠিক রয়েছে। অপরদিকে, ৪০% মনে করেন বর্তমান ব্যবস্থা সঠিক নয়, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

৫২. সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতার (৭৫%) মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। অপরদিকে, ২৫% উত্তরদাতা মনে করেন নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত নির্বাচন কমিশনকে আরো সাহায্য সহযোগিতা করা। এছাড়া তারা মনে করেন সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. বিগত সংসদ নির্বাচন সমূহের দিকে দৃষ্টি নিপাত করলে দেখা যায়, এ দেশের ইতিহাসে কেবলমাত্র দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া সংসদীয় নির্বাচন সমূহেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন আসনে নির্বাচিত হবার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এ ধরনের সুযোগ পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে নির্বাচনে কেউই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতেও পারেনি অর্থাৎ এ সময় প্রতিটি আসনেই একাধিক প্রার্থী নির্বাচনে অবতীন হয়েছে এবং নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে।

৫৪. গবেষণায় দেখা যায় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা বেশী থাকে এবং দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। তত্ত্বাবধায়ক এর সময় প্রার্থীদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় এবং ভয়ভীতি কম থাকার কারনে এ সময়ে অধিক লোক নির্বাচনে অংশ নেয়।

৫৫. গবেষণায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনেক বড় দল নির্বাচন থেকে সরে এসেছে, নির্বাচন বর্জন করেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তত্ত্বাবাধয়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোন দলই নির্বাচন বর্জন করেনি।

৫৬. গবেষণায় দেখা যায়, তত্ত্বাবাধয়ক সরকারের অধীনে ১ম নির্বাচন অর্থাৎ ৫ম সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র বেড়েছে ১৭৫১টি। আবার দলীয় সরকারের অধীনে (৬ষ্ঠ সংসদ নির্বাচনে) ভোটকেন্দ্র কমেছে ৩০৪০টি কিন্তু আবার তত্ত্বাবাধায়ক সরকারের অধীনে ৭ম সংসদ নির্বাচনের সময় কেন্দ্র বেড়েছে ৪৫৮১টি। সাধারণ জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিবছর যেহেতু ভোটার বাড়ছে সেহেতু ভোটকেন্দ্রও বাড়া স্বাভাবিক। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে এ সংখ্যা ২ বার কমেছে এবং বেড়েছে খুব কম।

৫৭. গবেষণায় আরো দেখা যায়, তুলনামূলক ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত নির্বাচনে আসন প্রতি ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল গড়ে ৮৯টি, যেখানে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের সময় ছিল গড়ে ৬৯টি। এ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মানুষকে নির্বাচনে আকৃষ্ট করার জন্য অধিক কেন্দ্র স্থাপন চোখে পড়ে, যা সার্বিক তুলনায় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের সময় লক্ষ্য করা যায়নি। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনকে অধিক স্বচ্ছ বলে প্রমানিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী জোট ও দলের সংখ্যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজিত নির্বাচনের তুলনায় অনেক কম ছিল। দলীয় সবকারের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচনে ৩ গুণেরও বেশী সংখ্যক জোট ও দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

৫৯. বাংলাদেশ এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৮টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বনিম্ন ভোট প্রদানের হার (৫১.২৯%) ছিল ২য় সংসদ নির্বাচনে এবং সর্বাধিক ছিল ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৫.৫৯% দেখা যাচ্ছে দলীয় সরকারের অধীনে মানুষের ভোট প্রদানের হার নির্দিষ্ট ধারায় বৃদ্ধি পায়নি, সকল নির্বাচনের ক্ষেত্রেই এ হার ৬০% এ নীচে। অপরদিকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পর্যায়ক্রমে ভোট প্রদানের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে প্রমানিত হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোটররা অধিক হারে ভোট প্রদান করে কেননা তারা মনে করে এ সময় তুলনামূলক ভাবে নির্বাচন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

৬০. গবেষণায় দেখা যায় অন্যান্য সরকারের সময় কালের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এলে দেশের গণমাধ্যম গুলোর প্রচারণার প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দেশের গণমাধ্যমের উপরেও বিশেষ প্রভাব রয়েছে। অন্যান্য সময়ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে দেশের সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থা সমূহের সংবাদ পরিবেশনের বাস্তব ফোকাসেও পরিবর্তন সাধিত হয়।

৬১. গবেষণায় দেখা যায় সকাল বেলাতেই ভোটকেন্দ্রে যাবার প্রস্তুতি গ্রহন এ প্রশ্নের জবাবে মতামতদানকারী শতকরা ৮০ ভাগ জানিয়েছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তারা সকালেই ভোট দানে প্রস্তুতি নেন, অপর দিকে ১০ ভাগ তাদের মতামতে বলেছেন, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে তারা সকালেই ভোট প্রদানে প্রস্তুতি নেন। অর্থাৎ অধিকাংশ মাতমতদানকারী নির্বাচনকে মনে প্রানে বিশ্বাস করেন।

৬২. জনগণ আশা করে, যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরনে একদিন স্বপ্ন দেখেছিল সে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেন আর বিতর্কিত না হয়। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবুও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের ভূমিকাই মুখ্য। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় এর সাথে প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও বিশ্বাস।

৬৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯০ দিনে বাংলাদেশের সব সমস্যার সমাধান করবে এ ধারনা অমূলক। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ হলো সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা। তাই গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা গণতান্ত্রিক সরকারকেই সমাধান করতে হবে। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি দেশজ সমাধান।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নির্বাচন। আর নির্বাচনই হলো একমাত্র মাধ্যম যেখানে জনমতের প্রতিফলন ও সন্নিবেশ আমরা দেখতে পাই। নিরপেক্ষ নির্বাচন বলতে পক্ষপাতহীন, শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বুঝায়। অর্থাৎ নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কোনরূপ পক্ষ সমর্থন না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে একটি নির্বাচন পরিচালনা করবে। এখানে প্রশাসন যন্ত্র থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনার সাথে জড়িত সকল মহল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলে। অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে নবতর অধ্যায়ের সৃষ্টি তাহলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যা বাংলাদেশের নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনীতিকে পুরোপুরি সুস্থ্য না করলেও অনেকাংশে জনসচেতনতা সৃষ্টি করেছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্যই সুষ্ঠু নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তাই আলোচ্য গবেষণার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার একে অপরের পরিপূরক ও বহুল আলোচিত প্রত্যয় হলেও বিষয়টি নিয়ে বির্তকের শেষ নেই। গণতন্ত্র হলো এক বিকাশমান ধারা যা দেশ কাল ও চেতনার স্তর নিরপেক্ষও নয়। গণতন্ত্র কোন পরিশুদ্ধ, নির্ভূল পরিপক্ক ও পরিনত রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয় যা চরম লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। গণতন্ত্র হচ্ছে পরীক্ষা ও নব নব অভিজ্ঞতার আলোকে ও সম্মিলিত স্বাধীনতার ক্রমাগত শুদ্ধতর রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া। গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার যৌথ প্রকাশ। এই স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে মানুষের মনের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তি জীবনের স্বার্থ ত্যাগ ও শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করার স্বাধীনতা। প্রকৃত গণতন্ত্রে চাপিয়ে দেয়া আদর্শ, দলগত স্বার্থ বা ব্যক্তি মানুষের আধিপত্য বা কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পনের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু গণতন্ত্রের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবে-এটি গণতন্ত্রের অন্যতম একটি শর্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে দুটো শর্ত তা হলো সরকার জনগণের ও জনগণের জন্য। এই যে জনগণ, যাদের জন্য সরকার ও যাদের

Dhaka University Institutional Repository

সরকার তারা শুধু ভোট দাতা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নয়। এদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও ব্যক্তি মানুষ, এমনকি যারা ভোট দেয়নি তারাও অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ গণতন্ত্র হলো এক জটিল প্রক্রিয়া, যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। আর গণতন্ত্রের মূল প্রতিশব্দ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই যেহেতু আবর্তিত তাই নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালনার জন্য প্রনীত হয়েছে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী, অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। যদিও বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও সাংবিধানিক, এক্ষেত্রে দলীয় সরকারগুলোর বিভিন্ন নির্বাচনে অবৈধ হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে জনতার দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে আশা ও স্বপ্নের ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় এ ব্যবস্থা। যার ফলে এ ব্যবস্থাটি হয়ে উঠে জনতা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বিগত নির্বাচন অর্থাৎ ৮০ দশকে (জেনারেল এরশাদের শাসন আমলে) এবং পরবর্তীতে ৯০ দশকের উপ-নির্বাচন গুলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ সকল নির্বাচনে ভয়াবহ কারচুপি, অনিয়ম এবং দলীয় প্রভাব নির্বাচনের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদে পাস হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নিরপেক্ষ সরকার বিল যা সংবিধানে নব দিগন্তের সূচনা করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' এ বিষয়ের উপর গবেষণায় যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যণীয় হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের নির্বাচনগুলোতে জনগণের নির্বাচন সম্পর্কে আস্থা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এখন ভোট কাস্টের হার ৪৫/৫০ এ দাঁড়িয়েছে, জনগণের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়েছে। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ভোটার উপস্থিতি বেশী থাকে। শতকরা ৮৪ জনের মতামত অনুযায়ী সাধারণ ভোটারদের ভোটদানের উপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয় বলে নিজেদের মতামত ভোটের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে প্রকাশের সুযোগ থাকে।

গবেষণায় যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে তাহলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কিত মতামতে মতামত দানকারীদের সিংহভাগ মনে করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় ভাল থাকে। কেননা এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দলীয় প্রভাব বিহীন নিরপেক্ষভাবে পেশাগত

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। যদিও ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু কাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবুও দেখা যায় দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের তুলনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের নির্বাচন অনেকগুণ নিরপেক্ষ। আর তা দেখে দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ এ পদ্ধতির কথা চিন্তা করছে। এমনকি খোদ গণতন্ত্রের চারনভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এ নিয়ে ভাবছে। একটি দেশে ভোট দানের হার মাত্রা দেখে বুঝা যায় রাজনীতিতে সে দেশের জনসাধারণের উৎসাহ কতটুকু বা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিষয়ে, সরকারের বিষয়ে, জনপ্রতিনিধিদের বিষয়ে জনগণ কতটা সচেতন বা আগ্রহী। কিন্তু বিগত দিনের বাংলাদেশের নির্বাচনগুলো পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় যে, দলীয় সরকারের আমলের নির্বাচনগুলোতে ভোট প্রদানের হার অত্যন্ত কম., এমনকি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যাও ঘটেছে অনেক বেশি, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শুধু গতিশীলই করেনি, দাঁড় করিয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে একটা মডেল হিসাবে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নিরপেক্ষ আভিধানিক শব্দটি দলীয় সরকারকে এ বিষয়টি শিখিয়েছে যে, প্রকৃত জবাবদিহিতামূলক সরকার ছাড়া কখনই ঐক্যমত, গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু নির্বাচনের মতো একটি কঠিন সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে একটি সরকার জবাবদিহিতার বিকাশ ঘটাতে পারে যেটি আসলেই সম্ভব হচ্ছে না। যদিও সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারপরেও একটা বিষয় লক্ষনীয় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেমন কোন সমঝোতা বা ঐক্যমত নেই, তেমনি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছু কিছু আসনে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বিদ্যমান সরকারের পক্ষপাতিত্বের কারণে এ গণতন্ত্র যে আবারও চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়েছে তা আমরা দেখতে পাইনা। যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পর যে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সে গণতান্ত্রিক সরকার যদি বিরোধী দলের অগণতান্ত্রিক বিরোধিতার কারণে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও জনকল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন না করতে পারে এবং জনগণের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটাতে না পারে তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারেব অধীনে নির্বাচন করে কোন লাভ নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকলে দেশে গণতন্ত্রের সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়। যেহেতু গণতন্ত্রের সংস্কৃতি এখনো পুরোপুরি চালু হয়নি- তাই জনগণের আস্থা অনেকাংশে তত্ত্বাবধায়ক নিরপেক্ষ সরকারের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

তাই জনগণের প্রত্যাশা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরনে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল সে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেন আর বিতর্কিত না হয়। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবুও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকাই মুখ্য। গবেষণায় যে বিষয়টি জনমতের প্রতিফলন ঘটায় তাহলো জনগণ এমনও আশা করে যে, অন্তত তিন মাস শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। শুধু তিন মাস নয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পর যে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসবে সে সরকার যেন জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরনে সচেষ্ট হয় তাহলে কেবল বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতা দেখা যাবে এবং তখনই গণতন্ত্র সাফল্যের দাঁড় প্রান্তে পৌঁছাতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন ও গণদাবীর ফসল। তাই এ সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। প্রত্যাশা যেখানে বেশী থাকে, সেখানে অকারণে হতাশাও আসে অনেক। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রেই কোন না কোন সমস্যা রয়েছে। সে সমস্যা সরকারই সমাধা করে জনগণের সহায়তায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সে সব সমস্যার সমাধান ৯০ দিনের মধ্যেই করে দিবে এ চিন্তা বা ধারণা একেবারেই অমূলক। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হলে চলবেনা।

১. ১৯৯৬ সালের ১২ জুন বাংলাদেশে ১ম সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হয়েছিল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে। তাই ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের এমন ভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে যেন, যে ঐতিহাসিক কলংকজনক কারণে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আবির্ভাব হয়েছিল তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়।

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ হবে নির্দলীয়- যাতে করে নির্বাচন সুষ্ঠু ও পক্ষপাতহীন হয়। আর সে কারণেই সংবিধানের ২ক পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়েছে। সরকারের যারা উপদেষ্টা হবেন তাদের কোন বিশেষ দলের প্রতি আনুগত্য থাকবেনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে কাজ করবেন তা ২ক পরিচ্ছেদে বর্ণিত কর্তব্যের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। অর্থাৎ যে কোন ভাবেই হোক গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে ২ক পরিচ্ছেদ অনুযায়ী দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করলে জাতি নিরপেক্ষ নির্বাচনের যথার্থতা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারবে। আর সেভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা উচিত।

৩. জনগণের প্রত্যাশা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনই এমন কাজ করবেনা যা জনমনে বিতর্কের সৃষ্টি করে। একজনকে একটি পদে নিয়োগ দেয়ার কারণে জনমনে প্রশ্ন উঠার পরও যেন তাকে ঐ পদে বহাল রাখা না হয়। তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। তাই বিতর্কিত বিষয়গুলোকে আন্তরিকতার সাথে পরিহার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা যাই হোক না কেন, রাজনীতির দুটি মাত্র প্রধান ধারা রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ডে এদের মধ্যে যদি একটি সন্তোষ প্রকাশ করে এবং অপরটি অসন্তোষ প্রকাশ করে তবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিবে। তাই এ বিষয়টিকে খুব বেশী গুরুত্ব দিতে হবে যেন কেউ কোন প্রশ্ন তোলার সুযোগ না পায়।

৫. সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হবেন একজন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংসদ রাজনৈতিক দল ও জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের মাধ্যমে মনোনয়ন দিয়েছেন। যিনি এ পদে অধিষ্ঠিত হবেন তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পদটি অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদটি জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থার ফসল। তাই এ পদে থাকা অবস্থায় নির্বাচন যেন আর বিতর্কিত না হয় সেদিকে তাঁকে সুদৃষ্টি দিতে হবে।

৬. সংবিধানের ৫৮গ(৩) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রধান উপদেষ্টা হবেন সুপ্রীম কোর্টের সদ্য অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। কিন্তু প্রধান বিচারপতি হিসাবে তাঁর নিয়োগ যদি বিতর্কিত হয় বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় তবে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তাঁকে নিয়োগ না দিয়ে সাংবিধানিক ভাবে অন্য কাউকে নিয়োগ দেয়া উত্তম। তাতে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠবেনা এবং প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রেও সাংবিধানিকতা বজায় থাকবে।

৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এমন ১০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগ দিবেন যারা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন কিংবা রাজনৈতিক কোন শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত নন, যা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৮. প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগের বিষয়টি যেন উপদেষ্টাদের নিয়োগের অন্তত এক মাস পূর্বে নির্ধারিত হয়। তাহলে তিনি অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার বিষয়টি যত্ন সহকারে লক্ষ্য করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে এবং সুশীল সমাজ থেকে ১০ জন উপদেষ্টার নাম আহবান করা যেতে পারে। এভাবে যে সকল প্রার্থীর নাম পাওয়া যাবে তাদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে দল নিরপেক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তিদের উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেয়া যাবে। তাতে ভবিষ্যতে আর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেনা বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯. প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাবৃন্দ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের পর তারা তাদের নিজ নিজ পূর্বের কাজে ফিরে যাবেন। ভবিষ্যতে তাঁরা কোন দলের হয়ে নির্বাচন করতে পারবেন না বা কোন সরকারি পদে যোগদান অথবা ডেপুটেশনে যেতে পারবেন না। অর্থাৎ যদি পরবর্তীতে পুরস্কৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে তবে নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সংশয় দেখা দিতে পারে।

১০. তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে নিরপেক্ষ সরকারকেই বুঝান হয়ে থাকে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে যে সরকার তিন মাসের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। তাই এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে নিরপেক্ষ শব্দটি যেন অনিরপেক্ষতার দোষে দুষ্ট না হয়।

১১. সংবিধানের ৫৮গ(৪) ও (৫) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোন প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের কোন বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে না পাওয়া যায় বা কেউ প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে যোগদানে অসম্মত হন তবে রাষ্ট্রপতি যতদূর সম্ভব প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে বাংলাদেশের কোন নাগরিকের মধ্য থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আরও নিরপেক্ষ করতে বা স্বচ্ছতা আনতে এখানে যদি এ রকম বিধান করা যায় যে, যদি কখনও সুপ্রীম কোর্টের কোন প্রধান বিচারপতির নিয়োগ নিয়ে বির্তক বা প্রশ্ন উঠে তবে তাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা যাবে না। অর্থাৎ নিয়ম বহির্ভূতভাবে বা কাউকে সুপারসিড করে যদি কোন বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয় এবং তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে কেবল তখনই এ বিধান কার্যকর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

BIBLIOGRAPHY

Dhaka University Institutional Repository

BIBLIOGRAPHY

Documents/দলিলাদি

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, সংশোধিত-২০০১।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ-বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)।

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন-১৯৯১।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচনী আচরন বিধি ১৯৯৬।

৬. Kudrat-E-Elahi Vs Bangladesh 44 DLR AD 1992, (para 22).

৭. Madan Murari V. Chowdhury Charan Singh, AIR 1980 CAL 95 (Para 20).

Dhaka University Institutional Repository

Books/Articles

- Ahmed, Moudud *Democracy and the Challange of Development*, Dhaka: U.P.L.1995.
- Ahmed, Nizam "Bangladesh', in Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook" Dieter Nohlen, *Florian Grotz and Christ of Hartmann Eds*. Vol.1 PP 515-552
- Ahmed, S.G.and Khan, M.M "Bangladesh", in V.Subramaniam, ed., *public Administration in the third world*, Connecticut: Green wood press, 1990
- Ahmed, Syed Giasuddin *Bangladesh Public service commission*, Dhaka: University of Dhaka.
- Alam, M.S and Ahmed, N. Good Governance in Bangladesh, Annual Report, Dhaka: *Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM)* 1994.
- Ali Tariq The Awami League Debacle. *The Daily Star* 01 November. 2001
- Baxter C., Malik, Y.K., Kennedy, C.H. and Oberst. R.C *government and politics in South Asia*, 3rd edition, Westview Press. 1993
- Berdie, Douglas R, and Anderson, John F. *Questionnaries: Design and Use, Mctuchen*, N.J: The Scare Crow Press, Inc., 1974
- Bhuiyan, M.A Behind Awami League Disaster in Elections, *The Daily Janakanth,* 21 October, 2001.
- Bhuyan, AR, "The Economy of Bangladesh: Present Performance and Challanges for the Future", Paper Presented on 25 February 1998 at *the center for Advanced Research in Social Sciences,* university of Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

- Chowdhury, A.G Election 2001: A postmortem. *The Daily Janakantha.* 2001
- Chowdhury, Z.H. Election, Results and the Anti-incumbency Factor, *The Daily Star* 14 October, 2001.
- Haque, A.K.F The Awami League Debacle: A post Mortem, *The Independent*, 11 October, 2001.
- Harris, Mari, Attitudes and Behaviour of the new South African Electorate: An Empirical Assessment. *International Social Science Journal*, 47 (4), December, 1999
- Hassall, G. *Introduction: Systems of Representation in Asia-Pacific Constitution: A Comparative Analysis in The People's Representatives: Election Systems in the Asia Pacific Region.* G Hassall and Cheryl Saunders eds. 1997.
- Islam, M. Nazrul "Bangladesh" in J.C Johare et.al, *Government and politics of South Asia*, New Delhi: Sterling publishers, 1991
- ————, "Parliamentary Democracy in Bangladesh: An assessment." *Perspectives in Social Science*, Dhaka University: Center for Advanced Research in Social Science, Vol.5 October 1998
- ————, *Consolidating Asian Democracy*, Dhaka: Nipun Printing Industries, 2003
- Jahan Rounaq, *Bangladesh: Problems and Issues*, Dhaka: University press Ltd.,-1980
- John, Peter W.M., *Statistical Design and Analysis of Experiments*, New York: The Macmillan Co., 1971.

Dhaka University Institutional Repository

- Karim waresul, *Election under a caretaker Government An Empirical Analysis of the october 2001 parliamentary Election in Bangladesh,* Dhaka: The University Press L.T.D 2004
- Kathari, C.R., *Research Methodology*; New Delhi: Wishwa Prokashan, 1985.
- Khan Zillur R. "Leadership, Parties and Politics in Bangladesh" *western political Quarterly*, Vol.29 No.2 March, 1976.
- Khan, Akter Hamid, *Rural Co-operatives and Roads Comilla,* Dacca: East Pakistan, Bangladesh Academy for Rural Development, 1964.
- Kibria, Shah A.M.S The Neutral Caretaker Government : An Assessment, *The Daily Star*, 4 November, 2001.
- Muhith, A.M.A A Rigged Election: An Illegitimate Government, *Center for Research and Information* (CRI), Dhaka. 2002
- Musa, A.B.M Defeat Inevitable but Debacle Unexpected, *The Daily Jugantor*, October, 2001
- Philips Hood, *Constitutional Law*, Britain: Oxford Publishers 1981.
- Rahman, K.L. 2001 Election Result: A forecast Venture, *The Independent*, 7 September, 2001.
- Riddell, *The Canadian Constitution in From and Fact*, Canada: Place Publishes, 1923.
- Ross Robert, *Research: An Introduction*, India: Chapter-1.1988
- Russell Bartrand, *A History of western philosophy*, London: Allen and Unwin L.T.D. 1957.
- Sabine, H.George, *A History of Political Theory*, New York: Henry Holt and Company, 1958

Dhaka University Institutional Repository

- Seervai, *Constitution Law of India* 2nd ed. Vol-3, (paras:33 (c) 40).
- Siddiqui, Kamal, *Towards good Governance in Bangladesh*, Dhaka: University Press Limited, 1996
- Sobhan, R, *Problems of Governance in Bangladesh*, Dhaka, U.P.L., 1993
- *The New York Times*, Bangladesh Victor is Forming a Government 4 January 2001 Issue.
- Zywicki, T.J "The Law of Presidential Transitions and the 2001 Election", Law and Economics Research Paper Series, George Mason University School of Law, Paper No. 01-08-2001

- অনাদি কুমার মহাপাত্র, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা, ২০০২।
- আনু মুহাম্মদ, রাষ্ট্র ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ দুই দশক, ঢাকা প্যাপিরাস প্রকাশনী।
- আমিনুল ইসলাম, সমকালীন পাশ্চত্য দর্শন, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, সেপ্টেম্বর-২০০১।
- ইউনুস আলী দেওয়ান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা, পূর্বদেশ পাবলিকেশনস, অক্টোবর-১৯৯১।
- তারেক শামসুর রহমান, বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, ঢাকা, মাওলানা ব্রাদার্স ১৯৯৯।
- দেবাশিষ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, কলকাতা, সেন্ট্রাল এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ, জুন-১৯৯৪।
- ফিরোজা বেগম, সরকারের সমস্যাবলীঃ ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী।
- ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ২০০২।
- বি,বি বিশ্বাস, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ঢাকা ঃ নীলা পাবলিশার্স, জুলাই ২০০১।
- বেবী মওদুদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৮৮ দিন, ঢাকা ঃ চারুলিপি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ২০০৩।
- বাংলাদেশ বিশ্বকোষ, বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
- মোঃ মাকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও নীতিমালা, রাজশাহী, বাংলাদেশ বুকস প্যাভিলিয়ন, জুন-১৯৯০।
- মোঃ মাইনুল আহসান খান, সাংবিধানিক আইন, রাজনীতি, ধর্ম ও স্বাধীনতা, ঢাকা, বিশ্ব সাহিত্য ভবন ৫০, জুলাই-১৯৯৮।
- মুহম্মদ আবদুল বারী, দর্শনের কথা, ঢাকা ঃ হাসান বুক হাউজ-২০০১।
- মিজানুর রহমান খান, সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক, মার্চ ১৯৯৫, সিটি প্রকাশনী ঢাকা।
- সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মল কান্তিঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা, শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানী জুন-২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

- সুরভী বন্দোপাধ্যায়, গবেষণাঃ প্রকরণ ও পদ্ধতি, কলকাতাঃ দে'জ পাবিলিশিং, জুলাই-১৯৯০।
- সরদার ফজলুল করিম (অনুদিত), প্লেটোর রিপাবলিক, ঢাকা, মাওলানা ব্রাদার্স-৭ম সংস্করণ-২০০০।
- আহমেদ কামাল, "জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন" ঢাকাঃ মানবাধিকার জার্নাল, প্রান্তজন, সংখ্যা-১ নভেম্বর, ২০০১।
- প্রতিবন্ধী নারী ও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো, সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ভিজএ্যাবিলিটি, ঢাকা-২০০২।
- নির্বাচিত কলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও জনগণের প্রত্যাশা, দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা, ২৭ জুলাই ২০০১।
- বিকাশমান গণতন্ত্র এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, সাময়িকী, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১।
- Daily Newpaper/দৈনিক পত্রিকা
- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১২ জুন ১৯৯৬।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২১ জুলাই, ২০০৪।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২১ মার্চ, ১৯৯৪।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯০।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২ জুলাই, ২০০৪।
- দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা-২৪জুন, ১৯৯৬।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, পাক্ষিক, ঢাকা, ২২ এপ্রিল ৬মে ২০০১ সংখ্যা, ২১, পৃষ্ঠা ৯-১৩
- দৈনিক কনকণ্ঠ, পাক্ষিক, ঢাকা, সংখ্যা ২১-২১ এপ্রিল-৬ মে ২০০১, পৃঃ ১২।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, সাময়িকী ১৭ আগষ্ট-২০০১।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর-২০০১।
- প্রবন্ধ
- নৈদিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ২৯ এপ্রিল, ২০০৪।
- দৈনিক কনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৬ই এপ্রিল, ২০০৪।
- দৈনিক কনকণ্ঠ, ঢাকা, ২১ এপ্রিল, ২০০৪।
- দৈনিক কনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০১।
- দৈনিক কনকণ্ঠ, ঢাকা ১৬ মার্চ, ১৯৯১।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা-১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৭ আগস্ট, ২০০১।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ২ জুন, ২০০৪।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ২৫ জুলাই, ২০০৪।

- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, জুলাই২৫, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, জুলাই ২৫, ২০০০।
- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ২৫শে জুলাই, ২০০৩।
- দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১জুলাই, ২০০৪।
- দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১২ জুলাই, ২০০৪।
- দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১২ জুলাই, ২০০১।
- দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২ জুলাই, ২০০৪।
- দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৫ আগস্ট ২০০৪।
- দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪।
- দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর-১৯৯৪।
- দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর-১৯৯৪।
- দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২৩ মার্চ,১৯৯৬ পৃঃ ৪।
- দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৫।
- দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা, ২৭ জুলাই, ২০০৪।
- দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা, ১০ আগষ্ট ২০০১।
- দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬।
- দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৪।
- দৈনিক ইনকিলাব , ঢাকা, ২৮ জুন-১৯৯৪।
- দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৭ জুলাই, ২০০৪।
- The Daily Star, Dhaka, 21st November-1994.

- **Unpublished Thesis** (M.Phil/Ph.D)

- সত্যজিৎ দত্ত, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০০২" অপ্রকাশিত, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- শাহনাজ পারভীন, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১) অপ্রকাশিত সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ"

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

জনসাধারনের মতামত জরীপ প্রশ্নপত্র

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং ঃ	তারিখ ঃ
তথ্য সংগ্রাহকের নাম ঃ	
তথ্য সংগ্রহের স্থান ঃ	স্বাক্ষর ঃ

ক. সাক্ষাৎদাতার পরিচিতি

১) নাম ঃ ২) বয়স ঃ

৩) পেশা ঃ ৪) শিক্ষাগত যোগ্যতা

৫) আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত কিনা? হ্যাঁ/না।

খ. মতামত দিন-

১. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা সমূহ কি কি?

২. আপনাকে নির্বাচনে ভোট প্রদানে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কি ধরনের সমস্যা .....

কোন নির্বাচনে .....

৩. নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে কোন বিষয়টি বেশী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন/শিক্ষার প্রসার/রাজনৈতিক দল গুলোর সহনশীলতা/সরকারী পদক্ষেপ/নীতিমালা ও আইন প্রনয়ন/অন্যান্য.....

৪. সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কতটা ফলপ্রসূ বলে মনে করেন ?

Dhaka University Institutional Repository

৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাধারন ভোটারদের ভোটদানের উপর কোন প্রভাব ফেলে কি? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কি ধরনের প্রভাব.....

৬. নিরপেক্ষ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন প্রভাব রয়েছে কি- হ্যাঁ/না।

৭. আপনার মতে এদেশে কোন কোন নির্বাচন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে হওয়া উচিত- সংসদ/স্থানীয় সরকার/উভয়টাই/কোনটাই না।

৮. আপনার মতে নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যায় ?

৯. সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প কিছু হতে পারে কি? হ্যাঁ/না, হ্যাঁ হলে কি?.....

১০. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভোটাররা কতটা উদ্ধুদ্ধ-এ সময় ভোট দানে মানুষ বেশী উৎসাহিত থাকে/একই রকম/নিরুৎসাহিত হয়।

১১. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অন্যান্য সরকারে তুলনায় দেশের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি কেমন থাকে? একই রকম/উন্নত/খারাপ

১২. এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থা উদ্ভবের কারন কি বলে মনে করেন- রাজনৈতিক দল গুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস/সরকারী দলের পক্ষপাত দুষ্টতা/ভোট সন্ত্রাস/অন্যান্য.....

১৩. উন্নত বিশ্বে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব হলেও এদেশে নয় কেন?.....

১৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কতটা গ্রহনযোগ্য মনে করেন?

১৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে (নির্বাচনে) ভোট দিয়েছেন কি?

১৬. এই দুই সময়ে ভোট প্রদানে কোন পার্থক্য রয়েছে কি? হ্যাঁ/না

হ্যাঁ হলে কোন ধরনের পার্থক্য .....

১৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারনাটি জন্ম হবার কারন কি বলে আপনি মনে করেন?

১৮. দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচন নিরক্ষেভাবে আয়োজন সম্ভব কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কিভাবে.....

না হলে কেন নয়-- প্রশাসন দলীয় সরকারের নির্দেশে চলে/অন্যান্য.....

Dhaka University Institutional Repository

১৯. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা রয়েছে কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কিভাবে.....

না হলে কেন নয়

২০. টিক দিন

- ❖ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বপালনে পুরোপুরি নিরপেক্ষ/আংশিক নিরপেক্ষ/নিরপেক্ষ নয়।
- ❖ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন পুরোপুরি নিরপেক্ষ/আংশিক নিরপেক্ষ/নিরপেক্ষ নয়।
- ❖ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে- উন্নত / মোটামুটি / অধঃপতন ঘটে।
- ❖ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির- পরোপুরি উন্নতি ঘটে / আংশিক উন্নতি ঘটে / একই থাকে / অবনতি ঘটে।
- ❖ নির্বাচন কমিশন- পুরোপুরি স্বাধীনতা পায় / অধীক স্বাধীন ভাবে কাজ করে/ আংশিক স্বাধীন ভাবে কাজ করে / একই রকম কাজ করে / স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।
- ❖ পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী- পুরোপরি নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করে / অধীক নিরপেক্ষ / আংশিক নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করে / একই রকম থাকে / নিরপেক্ষতা হারায়।
- ❖ তত্ত্বাবধায়ক এর অধীনের সাথে অন্যান্য নির্বাচনের পরিবেশগত / সার্বিক অবস্থার কোন পার্থক্য আছে কি? হ্যাঁ/না। হ্যাঁ হলে কি রকম.....
- ❖ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমূহের কর্মকান্ডে আপনি- পুরোপুরি সন্তুষ্ট/সন্তুষ্ট/ মোটামুটি সন্তুষ্ট / নিরপেক্ষ / অসুন্তষ্ট।
- ❖ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বের (১৯৯০ পূর্ব) জাতীয় নির্বাচন সমূহে ভোট চুরি বেশী ছিল / বর্তমানের ন্যায় / কম ছিল।
- ❖ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ফলে- বিভিণ্ন দল কর্তৃক নির্বাচন বর্জনের হার বেড়েছে / একই রকম রয়েছে / কমেছে।
- ❖ তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার দায়িত্ব পালনে কতটা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করেন বলে আপনি মনে করেন- পুরোপুরি/আংশিক/একেবারেই নয়।
- ❖ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের মূল সুবিধা সমূহ কি কি বলে আপনি মনে করেন?.....

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ"

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

সংবিধান/আইন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
বয়স ঃ	বর্তমান পদবী ঃ

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বংলাদেশের সংবিধানের মৌল নীতি (১১ অনুচ্ছেদ) এর সাথে কতটা সামঞ্জস্য পূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানের লংঘন কি না?

৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কতটা আইন সম্মত?

৫. দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব কি? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কিভাবে? .....

না হলে কেন? .....

Dhaka University Institutional Repository

৬. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আরো ফলপ্রসূ করনে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যায়?

৭. আইন গত ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনের উপর কতটা নিয়ন্ত্রন আরোপ করতে পারে?

৮. 'জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস'-এ বাণীর সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি কতটা যুক্তিযুক্ত?

৯. নির্বাচনী অনিয়ন দূরীকরনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা কতটুকু আইনসিদ্ধ?

১০. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব কি হওয়া উচিত?

১১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনগত ভাবে কি কি সিদ্ধান্ত (দেশ পরিচালনাও নির্বাচন সংক্রান্ত) নিতে পারবে না?

১২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর কোন সদস্য মনোনয়ন ও শপথ গ্রহনের পর তার বিরুদ্ধে যদি কোন পক্ষপাতিত্বের বা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয় বা প্রমানিত হয় তাহলে আইনগত ভাবে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহনের সুযোগ রয়েছে কি?

১৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকারে জনগনের ম্যান্ডেট রয়েছে কি?

১৪. এই ব্যবস্থার বিকল্প কি হতে পারে?

১৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানেব জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে তা কি অপরিহার্য ?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ"

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দায়িত্ব পালনকারী প্রধান উপদেষ্টা/উপদেষ্টাদের/সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
তত্ত্বাবধায়ক সরকারে থাকাকালীন সময়ে পদবী ঃ	
বয়স ঃ	বর্তমান পদবী ঃ

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বোত্তম ব্যবস্থা? আপনার অভিমত দিন।

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকারে থাকাকালীন আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনে কি কি বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

৩. নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এদেশে বাধা সমূহ কি কি?

৪. দেশ পরিচালনায় আপনারা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

৫. কিভাবে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যস্থাকে আরো শক্তিশালী করন করা যায়?

৬. তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দায়িত্ব পালনে আপনাদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা কি পর্যাপ্ত ছিল?

৭. নির্বাচন কমিশনের উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রন কতটা ছিল?

৮. স্থানীয় সরকার নির্বাচন বা বিশেষ কোন নির্বাচনও কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৯. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন আয়োজনের জন্য বেধে দেয়া সময়সীমা কি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত? হ্যাঁ/না।

না হলে আপনার পরামর্শ.....

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ"

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

সংসদ/বর্তমান সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সদস্য/রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
রাজনৈতিক পদবী ঃ	
বয়স ঃ	বর্তমান পদবী ঃ

১. আপনি কি মনে করেন প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগন আস্থা হারাতে বসেছিল বলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারনার জন্ম হ্যাঁ/না।

না হলে কেন এ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়?.....

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন এবং দেশ পরিচালনা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য বেঁধে দেয়া সময়সীমা কি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে যথেষ্ট? হ্যাঁ/না, না হলে আপনার পরামর্শ .....

৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে যে কোন নির্বাচনের মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন চোখে পড়ে কি? হ্যাঁ/না, হ্যাঁ হলে বর্ণনা করুন।

৫. কিভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আরো ফলপ্রসূ করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

৬. আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিরপেক্ষ মনে করেন কি? হ্যাঁ/না

না হলে.....

৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন-

পুলিশ বাহিনী- নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে/আংশিক/একেবারেই না।

প্রশাসনিক জনবল- নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে/আংশিক/একেবারেই না।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ"

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
বয়স ঃ	পদবী ঃ

১. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

২. বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন.....

৩. বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

৪. সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যায়?

৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর দুর্বল ও সবল দিক সমূহ কি কি?

৬. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও দলীয় সরকার এর অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যে কোনটিতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে?

৭. স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর অধীনে হওয়া আবশ্যক মনে করেন কি? হ্যাঁ/না। (ব্যাখ্যা করুন)

৮. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মনোনীত ও অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

৯. বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর অধীনে নির্বাচন আয়োজনের কোন রূপ প্রয়োজনীতা রয়েছে কি? থাকলে কেন প্রয়োজন উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তিদিন।

১০. দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের দোষ ত্রুটি গুলি কি কি বলে মনে করেন?

১১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারনাটি স্থায়ী ভাবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার কারন কি?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

"বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ একটি বিশ্লেষণ"

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার

নাম ঃ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
বয়স ঃ	পদবী ঃ

১. বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভবের কারন কি বলে আপনি মনে করেন?

২. উন্নত বিশ্বে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজিত হলে ও এদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন কেন করা হয়?

৩. অনির্বাচিত সরকারের অধীন (তত্ত্বাবধায়ক সরকার) গণতান্ত্রিক নির্বাচন- তাত্ত্বিক দিক থেকে কি ভাবে মূল্যায়ন করেন?

৪. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা মনোনয়ন বা গঠন প্রক্রিয়া কি সঠিক? এর কোন পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন আছে কি? হ্যাঁ/না হ্যাঁ হলে কি ধরনের.....

৬. নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক?

৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতার মানদন্ড কি কি বলে আপনি মনে করেন?

৮. এ সময় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতটা হওয়া উচিত?

৯. সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার "না" নিরপেক্ষ স্বাধীন নির্বাচন কমিশন বেশী প্রয়োজন- মন্তব্য করুন?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের একাদশ সংশোধনী

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৮, ১৯৯৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৮শে মার্চ, ১৯৯৬/১৪ই চৈত্র, ১৪০২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৮শে মার্চ, ১৯৯৬ (১৪ই চৈত্র, ১৪০২) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৯৬ সনের ১ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

২। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**— এই আইন সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরুদ্ধারের মহতী উদ্দেশ্যে ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিরপেক্ষ সরকার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন;

এবং যেহেতু প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের উপ-রাষ্ট্রপতি তথা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পরিচালনাকালে দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের লইয়া জাতীয় সংসদ ও জনগণের সরকার গঠিত হইয়াছে;

এবং যেহেতু উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের নিয়োগ, রাষ্ট্রপতির যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন এবং তৎকর্তৃক প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং কৃত ও গৃহীত সকল কাজকর্ম ও ব্যবস্থা অনুমোদন ও সমর্থনের উদ্দেশ্যে এবং জনগণ ও প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দলগুলির প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রধান বিচারপতি পদে তাঁহার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বিধান করার লক্ষ্যে সংবিধানের সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই আইন সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২০ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ২১ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"২১। উপ-রাষ্ট্রপতির নিয়োগ অনুমোদন ও সমর্থন ইত্যাদি।—(১) ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং তাহার নিকট পদত্যাগ প্রদান এবং ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১) এর প্রবর্তনের তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে বা ২১(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত সময়-কালের মধ্যে (যাহাই পরে হউক) উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত অথবা প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত বলিয়া বিবেচিত সকল আদেশ, সকল কাজকর্ম এবং সকল ব্যবস্থা এতদ্দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

(২) সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১) প্রবর্তনের পর এবং সংবিধান মোতাবেক নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণের পর উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে তাঁহার উক্ত কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণের তারিখের মধ্যবর্তী সময় Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XX of 1982) এর section 2(a) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রকৃত কর্ম (actual service) বলিয়া গণ্য হইবে।"।

আবুল হাশেম
সচিব।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ই আগস্ট, ১৯৯১/২৫শে শ্রাবণ, ১৩৯৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ই আগস্ট, ১৯৯১ (২৫শে শ্রাবণ, ১৩৯৮) তারিখে অদ্যবধি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

১৯৯১ সনের ২৪ নং আইন

A act further to amend the Fourth Schedule to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh

WHEREAS in the face of the country-wide popular upsurge for over-throwing the illegal and undemocratic government and giving democracy an institutional shape the then President was compelled to tender resignation;

AND WHEREAS after the historic success of the students, peasants, workers, employees, the people in general, the Main Political Alliances and parties and all professional organisations, regardless of their political affiliation, belief and leanings, the three Main Political Alliances and parties made an ardent call to the Chief Justice of Bangladesh, Mr. Justice Shahabuddin Ahmed to take the reins of a neutral and impartial government as its head;

AND WHEREAS the then President appointed Chief Justice Mr. Shahabuddin Ahmed as Vice-President in the vacancy caused by the resignation of the then Vice-President and tendered his resignation to him;

AND WHEREAS upon a positive assurance of the three Main Political Alliances and parties of the country to the effect that after having run the government temporarily till the establishment of an elected democratic government through a free, fair, and impartial election to Parliament he would be eligible to return to the office of the Chief Justice of Bangladesh and with the noble purpose of restoring democracy the Chief Justice, on the 21st day of Agrahayan, 1397 B:S. corresponding to the 6th day of December, 1990, assumed the onerous responsibility of running an impartial government as Acting President;

AND WHEREAS during the period in which Chief Justice Mr. Shahabuddin Ahmed exercised the powers and performed the functions of the President in his capacity as Vice-President, a Parliament comprising people's representatives and a people's government have been established through a free, fair and impartial election;

AND WHEREAS it is expedient to make provisions for ratification and confirmation of the appointment of Chief Justice Mr. Shahabuddin Ahmed as Vice-President, the exercise and performance by him of all powers and functions of the President acting as such and all laws and Ordinances made by him and acts and things done and all actions taken by him in that capacity and for his

Dhaka University Institutional Repository

return to the office of the Chief Justice of Bangladesh in accordance with the assurances of the people and the Main Political Alliances and parties.

It is hereby enacted as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Constitution (Eleventh Amendment) Act, 1991.

2. **Amendment of the Fourth Schedule to the Constitution.**—In the Constitution, in the Fourth Schedule, after paragraph 20, the following new paragraph 21 shall be added, namely:—

"21. **Ratification and confirmation of the appointment of Vice-President, etc.**—(1) The appointment of, and the administration of oath to the Chief Justice of Bangladesh as Vice-President on the 21st day of Agrahayan, 1397 B.S. corresponding to the 6th day of December, 1990, and the resignation tendered to him by the then President and all powers exercised, all laws and Ordinances made and all orders made, acts and things done, and actions taken, or purported to have been made, done or taken by the said Vice-President acting as President during the period between the 21st day of Agrahayan, 1397 B.S. corresponding to the 6th day of December, 1990, and the date of commencement of the Constitution (Eleventh Amendment) Act, 1991 (Act No. XXIV of 1991) (both days inclusive) or till the new President elected under article 21(2) of the Constitution has entered upon his office (whichever is later), are hereby ratified and confirmed and declared to have been validly made, administered, tendered, exercised, done and taken according to law.

(2) The said Vice-President shall, after the commencement of the Constitution (Eleventh Amendment) Act, 1991 (Act No. XXIV of 1991), and after the new President elected under this Constitution has entered upon his office, be eligible to resume the duties and responsibilities of the Chief Justice of Bangladesh and the period between the 21st day of Agrahayan, 1397 B.S. corresponding to the 6th day of December, 1990 and the date of which he resumes such duties and responsibilities shall be deemed to be the period of actual service within the meaning of section 2(a) of the Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XX of 1982).

আবুল হাশেম
সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, আগস্ট ১০, ১৯৯১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ই আগস্ট, ১৯৯১/২৫শে শ্রাবণ, ১৩৯৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ই আগস্ট, ১৯৯১ (২৫শে শ্রাবণ, ১৩৯৮) তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৯১ সনের ২৪ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিল সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক সরকার অপসারণ করিয়া একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী দুর্বার গণ-আন্দোলনের মুখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন;

এবং যেহেতু দলমত-নির্বিশেষে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী, পেশাজীবি সংগঠন, প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল ও সর্বস্তরের জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর তিনটি প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্‌মদকে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানান;

এবং যেহেতু তদানীন্তন উপ-রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্য পদে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্‌মদকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন;

এবং যেহেতু গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে সরকার পরিচালনার পর প্রধান বিচারপতি হিসাবে স্বীয় পদে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন এই মর্মে দেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক জোটের ও দলের স্বাক্ষরহীন প্রতিশ্রুতিতে সাড়া দিয়া প্রধান বিচারপতি গণতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের একাদশ সংশোধনী

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৮, ১৯৯৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৮শে মার্চ, ১৯৯৬/১৪ই চৈত্র, ১৪০২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৮শে মার্চ, ১৯৯৬ (১৪ই চৈত্র, ১৪০২) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৯৬ সনের ১ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**— এই আইন সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। **সংবিধানে নূতন ৫৮ক অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ।**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর সংবিধান বলিয়া উল্লেখিত) এর ৫৮ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৫৮ক। **পরিচ্ছেদের প্রয়োগ।**—এই পরিচ্ছেদের কোন কিছু ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী ব্যতীত, যে মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হয় বা ভংগ অবস্থায় থাকে সেই মেয়াদে প্রযুক্ত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ২ক পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে ৭২(৪) অনুচ্ছেদের অধীন কোন ভংগ হইয়া যাওয়া সংসদকে পুনরাহ্বান করা হয় সেক্ষেত্রে এই পরিচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে।"

৩। **সংবিধানে নূতন ২ক পরিচ্ছেদের সন্নিবেশ।**—সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২ক পরিচ্ছেদ—নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

৫৮খ। **নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।**—(১) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নূতন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।

(৪) ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে একইরূপ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

৫৮গ। **নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন, উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ইত্যাদি।**—(১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হইবেন এবং যে তারিখে সংসদ ভাংগিয়া

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়া হয় বা ভংগ হয় সেই তারিখ হইতে যে তারিখে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৪) যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৫) যদি আপীল বিভাগের কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৬) এই পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানাবলীকে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীন তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

(৭) রাষ্ট্রপতি—

(ক) সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অংগীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন;

(গ) সংসদ-সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন, এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন;

(ঘ) বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন।

এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।

(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(১০) প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্তরূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না।

(১১) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন।

(১২) নূতন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

৫৮ঘ। **নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী।**—(১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

৫৮ঙ। **সংবিধানের কতিপয় বিধানের অকার্যকরতা।**—এই সংবিধানের ৪৮(৩), ১৪১ক(১) এবং ১৪১গ(১) অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, ৫৮খ অনুচ্ছেদের (১) দফার মেয়াদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর

Dhaka University Institutional Repository

পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণান্তে কার্য করার বিধানসমূহ অকার্যকর হইবে।"

৪। **সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের "নিয়ন্ত্রিত হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং যে মেয়াদে ৫৮খ অনুচ্ছেদের অধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে সেই মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের (১) দফার "আধা-বিচার বিভাগীয় পদ" শব্দগুলির পরিবর্তে "আধা-বিচার বিভাগীয় পদ অথবা প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টার পদ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৩) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।"

৭। **সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের (৪) দফায়,—

(ক) (খ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(খ) প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টা ;" এবং

(খ) (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ঘ) মন্ত্রী, উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী ;"।

৮। **সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।**—সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফায়,—

(ক) "অনুচ্ছেদ" অভিব্যক্তির সংজ্ঞার পর নিম্নরূপ সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"উপদেষ্টা" অর্থ ৫৮গ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ;

(খ) "প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অভিব্যক্তির সংজ্ঞার পর নিম্নরূপ সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"প্রধান উপদেষ্টা" অর্থ ৫৮গ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

৯। **সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।**—(১) সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের ফরম ১ এর পর নিম্নরূপ ফরম ১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১ক। **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে।**—প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবে :

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা) :

"আমি, ... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

(খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা) :

"আমি, ... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধান উপদেষ্টা রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না।"

(২) সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের ফরম ২ এর পর নিম্নরূপ ফরম ২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২ক। প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টাগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) পাঠ পরিচালিত হইবে :

(ক) পদের শপথ (বা ঘোষণা) :

"আমি, ... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি আইন-অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (কিংবা উপদেষ্টা) পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব; এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

Dhaka University Institutional Repository

(খ) গোপনতার শপথ (বা ঘোষণা):

"আমি,.....সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (কিংবা উপদেষ্টা) রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব, তাহা প্রধান উপদেষ্টা (কিংবা উপদেষ্টা) রূপে যথাযথভাবে আমার কর্তব্য পালনের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করিব না বা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিব না।"

আবুল হাশেম
সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।